বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম

শাহানা ফেরদৌস

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম

শাহানা ফেরদৌস

নীতি-রীতি প্রকাশনী
ISBN : 984-8371-01-x

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম

শাহানা ফেরদৌস

প্রকাশক	ঃ	তানজিলা ফেরদৌস নীতি, তাহরীমা ফেরদৌস রীতি **নীতি-রীতি প্রকাশনী** ১/৯ (৪র্থ তলা), নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। মোবাইল ঃ ০১৭১১-০৩৩২২৪ E-mail: nitiriti_prokashani@yahoo.com
প্রকাশকাল	ঃ	মে/২০১২ (৫ম সংস্করণ)
গ্রন্থস্বত্ব	ঃ	প্রকাশকদ্বয়
প্রচ্ছদ	ঃ	ওয়াকীল আহমেদ
বর্ণবিন্যাস	ঃ	রাইয়ান করপোরেশন ০১৬১২ ৩৮ ৭৫ ৩৮
মুদ্রণ ও বাঁধাই	ঃ	প্রাইম প্রিন্টার্স ১০, নীলক্ষেত, কাটাবন, ঢাকা।
মূল্য	ঃ	১৫০/ (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

Different Religion of the World
By: SHAHANA FERDOUS

Published by:	:	Tanjila Ferdous Niti, Tahrima Ferdous Riti
	:	**Niti Riti Prokashoni , Dhaka.**
Price	:	Tk. 150 (One Hundred fifty) only

ধর্ম

"কোন জাতির একত্র বাস আল্লাহ্ পাকের নিয়ামত।"

❖ মানুষ এক জাতিই ছিল, পরে তারা পৃথক হয়, আর আপনার রবের ঘোষণা না থাকলে তাদের মধ্যে মীমাংসা হয়ে যেত, যা নিয়ে তারা মতভেদ করছে। (সূরা ইউনুস, পারা-১১, আয়াত-১৯)

❖ "আর আমি তাদের বিভক্ত করেছি দুনিয়ায় বিভিন্ন দলে। যাদের কতেক নেককার আর কতেক এমন নয়; আমি তাদের ভাল মন্দ দিয়ে পরীক্ষা করছি, যাতে তারা ফিরে আসে।" (সূরা- আ'রাফ, পারা-৯, আয়াত-১৬৮)

❖ আর আল্লাহ কোন জাতিকে হেদায়েতের পর বিভ্রান্ত করেন না, যতক্ষন না তাদের পরিষ্কার ভাবে বলে দেন সে সব বিষয়, যা থেকে তাদের বেঁচে থাকতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। (সূরা- তাওবাহ্, পারা-১১, আয়াত-১১৫)

❖ নিশ্চয়ই যারা স্বীয় দিনকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হচ্ছে, তাদের ব্যাপারে আপনি দায়িত্বশীল নন। তাদের ব্যাপার আল্লাহর কাছে ন্যাস্ত। তিনি তাদের কৃতকর্মের খবর দিবেন। (সূরা- আন'আম, পারা-৮, আয়াত-১৫৯)

❖ প্রত্যেকের জন্য আমি বিধান ও চলার পথ দিয়েছি। আল্লাহ্ চাইলে তোমাদেরকে এক জাতি করতেন। কিন্তু' তিনি প্রদত্ত বস্তু দিয়ে পরীক্ষা করতে চান। অতএব সৎকর্মে প্রতিযোগীতা কর। আল্লাহর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। বিরোধমূলক বিষয়ে তিনি তখন ফয়সালা দিবেন। (সূরা- মা' উঠায়িদাহ্, পারা-৬, আয়াত-৪৮)

❖ ছাঁদের উপরে উঠতে হলে মই, বাঁশ, সিঁড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন উঠা যায় তেমনি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক একটি উপায়। (রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব)

❖ সব সম্প্রদায়ই পরস্পর থেকে আলাদা, কেননা সেগুলো মানুষের সৃষ্টি, কিন্তু সব নৈতিকতাই এক, কারণ সেগুলো ঈশ্বরের সৃষ্টি।

(ভলতেয়ার, ফরাসী দার্শনিক)

দুটো কথা

আমরা সবাই, এ বিশ্ব এবং তার সকল কিছুই যেমন এক মহান সৃষ্টি কর্তার সৃষ্টি, তেমনি বিশ্বের সকল ধর্মের মূলতঃ একই সুর। কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃ ধর্মে ধর্মে চলে রেষারেষি, হানাহানি।

তাই বিশ্বের সকল ধর্মের শান্তিকামী মানুষের উদ্দেশ্যে আমার এই বই। শুধু তাদের মনে একটিই আদর্শ জাগিয়ে তোলা– "মানুষ মানুষের জন্য।" বইটি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে কিশোর, যুব, বৃদ্ধ সকল শ্রেণীর জন্য হলেও মূলতঃ কিশোরদের উপযোগী করেই লিখেছি। যেহেতু কিশোররাই জাতির ভিত্তি। তাই বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মগুলোকে এক সুতোয় মালা গেঁথে পরিয়ে দিলাম তাদের গলায়।

বইটি লিখতে আমাকে প্রচুর তথ্য জোগাড় করতে হয়েছে। প্রচুর সময় লেগেছে। বিভিন্ন তথ্য দিয়ে যাঁরা আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছেন, তারা হলেন, ইহুদী ও খ্রীষ্ট ধর্মে-খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের ডাইরেক্টর, ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও এবং ব্রাদার রবার্ট সাইমন গোমেজ, বৌদ্ধ ধর্মে– শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ শ্রী মৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরো। শিখ ধর্মে- গুরু দুয়ারা নানকশাহী'র গ্রন্থি 'ভাই পিয়ারা সিং (রাগী)।

বইটি পাঠকদের ভাল লাগলেই আমার এ দীর্ঘদিনের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে অনুপ্রাণিত হবো। সেই সাথে পাঠকদের মতামতও আশা করছি।

ধন্যবাদান্তে-
শাহানা ফেরদৌস

উৎসর্গ

সব ধর্মের এক বাণী- সব ধর্মের এক সুর
সৎ কর্ম সৎ পথ অন্যায় হোক দূর
ভয় শুধু একটাই "স্রষ্টাকে কর ভয়"
এতেই মহা সাফল্য- জীবনের মহা জয়
ইহকাল হোক ভিত পরকালের জন্য
পরকালের স্বর্গসুখ জীবন ধন্য।।

বাংলাদেশের অগণিত মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ,
খৃস্টান কিশোর কিশোরীদের হাতে।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
এক মহান সৃষ্টিকর্তা	০১
হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) (ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ নবী)	১৫
যীশুখ্রীষ্ট (খ্রীষ্ট ধর্মের প্রবর্তক)	৪৯
গৌতম বুদ্ধ (বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক)	৮৫
রামকৃষ্ণ (হিন্দু ধর্মের এক মহাপুরুষ)	১০৭
মোশী (ইহুদী ধর্মের মহাপুরুষ)	১২৫
গুরু নানক (শিখ ধর্মের প্রবর্তক)	১৪৫
জরথুষ্ট (পাশী ধর্মের প্রবর্তক)	১৫৯
বর্ধমান মহাবীর (জৈন ধর্মের প্রবর্তক)	১৬৪
কনফুসিয়াস (চীনের কনফুসী ধর্মের প্রবর্তক)	১৭২
লাওৎসে (চীনের তাও ধর্মের প্রবর্তক)	১৮০
শ্রী চৈতন্য (বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক)	১৮৩
রাজা রাম মোহন রায় (ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তক)	১৮৯

এক মহান সৃষ্টিকর্তা

এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টি, আজও এক অজানা রহস্য। তবে ধর্মীয় বিশ্বাসে আমরা তার সীমারেখার কাছাকাছি যেতে পারি। বিশ্বের অধিকাংশ ধর্মগুলোর বিশ্বাস এই বিশ্বজগতের সমস্ত বস্তু ও প্রাণীর একজন মাত্র সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি নিরাকার। সর্বশক্তিমান। তিনি পবিত্র ও মহান। তার কোন শরীক নেই। তিনি চিরকাল আছেন। এবং থাকবেন।

ইসলাম ধর্মে তার নাম- আল্লাহ্। খ্রীষ্টান ধর্মে গড্, বাংলায় বলে ঈশ্বর। (পরমেশ্বর), ইহুদী ধর্মে- যিহোবা, হিন্দু ধর্মে- ভগ্বান। শিখ ধর্মে- ভগবান। পাশী ধর্মে- অহুর মজদা। বৌদ্ধ ধর্মে- ভগবান। জৈন ধর্মে-ভগবান।

ইসলাম ধর্মে কুরআন শরীফে সুরা এখলাসে বলা হয়েছে "কুল হু আল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফওয়ান আহাদ "। অর্থাৎ ঃ বল (হে মুহাম্মদ) আল্লাহ এক, আল্লাহ স্বয়ং সম্পূর্ণ, তিনি জন্ম দেন না। জন্মগ্রহন ও করেন না। তার সমতূল্য অন্য কেউ নেই।

কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়ীন কাদীর। অর্থাৎ সব কিছুর ওপরে আল্লাহ্র কর্তৃত্ব।

উত্তরায়ণ বেদ। এক মেবা দ্বিতীয়ম ব্রহ্মঃ স্বংবিনা নাস্তি পূজ্যতে অর্থাৎ ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। ভগবত গীতায় বলা হয়েছে - সর্ব ধর্মমান পরিত্যাজ্য মামেকং স্মরণ ব্রজঃ।

অহং ত্বাং সর্বপাপোভ্যো মোক্ষমিয়ামী মাশুচ ঃ

অর্থাৎ সব রকম ধর্মীয় পূজাদি ছেড়ে কেবল আমার স্মরণ গ্রহণ করে আমাকেই অর্চনা করো। আমি তোমাদের সব রকম পাপ থেকে উদ্ধার করবো। নিশ্চিত হও। শোক করোনা।

বেদন্তদর্শন। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"- অর্থাৎ জগতের সব কিছুই ব্রহ্ম। বাইবেলে বলেছে-

যারা মনে প্রাণে পরমেশ্বরের ইচ্ছামত চলতে চায় তারা ধন্য। (মথি৫ঃ৬)

ইসলাম ধর্ম

ইসলাম অর্থ শান্তি, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ। ইসলামের পবিত্র বাক্যই হলো, লা-ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, দয়ালু ও করুণাময়। তিনি আমাদের ভালবাসেন। রিযিক দান করেন। আমাদের জীবন ও মৃত্যু তার ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়। মানুষ একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে এবং তাকে ছাড়া আর কারও কাছে নতি স্বীকার করে না। তারা একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চায়। তাই ইসলাম ধর্মে বলে- 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন। অর্থাৎ আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই।

পবিত্র কুরআন শরীফে বলা হয়েছে 'লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসুলিল্লাহি উস্ওয়াতুন হাসনা'।

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূল (মুহাম্মদ) সর্বোত্তম আদর্শ।

একসময় এই পৃথিবীতে কিছুই ছিল না। মানুষ, জীব, জানোয়ার কিছুই না। শুধু ছিলেন পরম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতালা। আর ফেরেশতাগণ। আল্লাহর কোন শরীক নেই। তিনি এক। ফেরেশতাগণ তার ইবাদত করেন। ফেরেশতারা নূর বা আগুনের তৈরী।

একদিন আল্লাহর ইচ্ছা হলো, তিনি দুনিয়া সৃষ্টি করবেন। বললেন - 'কুন' হয়ে যাও। অমনি আসমান হলো, যমীন হলো। জীব হলো, জানোয়ার হলো, কিন্তু আল্লাহতালার ইচ্ছে পূরণ হলো না। তিনি খুশী হলেন না।

একদিন আল্লাহতালা তার দরবারের সকল ফেরেশতাদের ডাকলেন। বললেন, আমি আদম তৈরী করবো। ফেরেশতারা বললেন, ইয়া আল্লাহ! আমরাই তো আপনার গুণগান করছি। আদম তৈরী করে কী হবে? তারা ঝগড়া করবে। মারামারি, খুনাখুনি করবে।

আল্লাহ তখন বললেন- হে ফেরেশতাগণ, আমি যা জানি, তোমরা তা জান না। এ কথায় ফেরেশতারা লজ্জা পেল। ফেরেশতাদের মধ্যে চারজন ফেরেশতা বড়। এরা হলো (১) জিবরাঈল, (২) মিকাঈল, (৩) ইসরাফিল, (৪) আযরাইল।

আল্লাহ তাদের ডাকলেন। বললেনঃ তোমরা দুনিয়ায় যাও, মাটি নিয়ে

এস। মাটি নিতে জিবরাঈল (আঃ) দুনিয়ায় এলেন।

মাটিতো কান্নাকাটি জুড়ে দিল না- না, জিবরাঈল তুমি ফিরে যাও। আমি মাটি দিতে পারবো না। আমার বড় ভয় করে।

জিবরাঈলের মনে দয়া হলো তিনি ফিরে গেলেন।

তারপর মিকাঈল এলেন। ইসরাফিল এলেন। মাটি তাদের কাছে একইভাবে কাকুতি-মিনতি করলো। কাঁদলো। তাঁরা ফিরে গেলেন।

এরপর এলেন আযরাইল। মাটি আগের মতোই কাঁদাকাটি করলো, কাকুতি মিনতি করলো। বললো, দোহাই আল্লার। আমার গায়ে হাত দিও না। আমার বড় ভয় করছে। এই বলে মাটি থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

আযরাইল বললেন, তুমি আল্লাহর দোহাই দিচ্ছো। আমি তারই হুকুমে এসেছি। কাজেই কাঁদাকাটি করে কোন লাভ হবে না। এই বলে তিনি কিছু মাটি তুলে নিলেন। তারপর মাটি নিয়ে আল্লাহর কাছে গেলেন। আল্লাহ বললেন, আযরাইল, তোমার দিলে রহম নাই। তুমি মাটির কাঁদাকাটি শোন নাই। যাক, আজ হতে তুমি হলে মালিকউল মউত। সবার জান কবযের ভার আমি তোমাকে দিলাম।

এছাড়া আল্লাহতালা আর তিন জন ফেরেশতাকে কি কি দায়িত্ব দিয়েছিলেন জান ?

(১) জিবরাঈল (আঃ) নবী রাসূলের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছাতেন।

(২) মিকাঈল (আঃ) সকল প্রাণীর জীবিকা বন্টন করেন।

(৩) আযরাঈল (আঃ) সকল প্রাণীর জান কবয করেন। অর্থাৎ প্রাণ হরণ করেন।

(৪) ইসরাফিল (আঃ) সিঙ্গা হাতে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছেন। আল্লাহর হুকুমে সিঙ্গায় ফুঁ দিলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

এরপর আল্লাহ হুকুম দিলেন ফেরেশতাদের মাটি দিয়ে একটি আদম তৈরী করতে।

তৈরী হলো আদম। কিন্তু সে হাঁটতে পারে না। কথা বলতে পারে না। চোখ মেলে চাইতেও পারে না। আল্লাহ তখন নিজের নূর হতে রুহ তৈরী করলেন এবং আদেশ করলেন, হে রুহ, তুমি আদমের ভিতর ঢুকে পড়। রুহ আদমের

ভিতর ঢুকে পড়ল। কিন্তু একটু পরেই আবার বের হয়ে এল। বলল, হে আল্লাহ ভেতরে আমি থাকতে পারছি না। অন্ধকার, আর গরম। আল্লাহ্ ফেরেশ্তাদের ডাকলেন। বললেন, অনেকদিন আগে আমার নূর হতে আর একটি রুহ তৈরী করেছি। সেটা আমার পেয়ারে নবী মুহাম্মদের রুহ। ঐ রুহ হতে কিছু নূর নিয়ে এস।

ফেরেশতারা আদেশ পালন করলেন। আল্লাহ সেটা আদমের কপালে ঘষে দিলেন। রুহ এবার আদমের শরীরে ঢুকে পড়ল এবং খুশী হয়ে বললো, হে আল্লাহ, এবার আমি থাকতে পারব।

আদমের সর্বশরীর জ্যোর্তিময় হয়ে উঠলো। মাটির দেহ জীবন পেল। আল্লাহ্র কুদরতে আদম (আঃ) যমীনের উপর হাত ঠেস দিয়ে উঠার ইচ্ছা করেন। তখন ফেরেশ্তারা বলে উঠেন-এ বান্দা ত্বরাপ্রবণ হবে। এখনও তার দেহের অর্ধেকাংশ কর্দমাক্ত অথচ সে উঠতে চাচ্ছে।

তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন- "খুলিকাল ইনসানু আজুলা"

অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ত্বরাপ্রবণ।

হযরত আদম (আঃ) এর দেহ নড়ে উঠার সাথে সাথেই তার একটি হাঁচি হলো। হাঁচি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত আদম (আঃ) পাঠ করলেনঃ- "আলহামদুলিল্লাহ" -প্রশংসা মাত্র আল্লাহ্র জন্য।

অমনি মহান আল্লাহ্র তরফ হতে জবাব আসলো "ইয়ারহামুকাল্লাহ"

তোমার প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক।

সেদিন হতে হযরত আদম (আঃ) ও তার বংশধরদের মধ্যে ঐ প্রথা জারী হলো- কেহ হাঁচি দিলে তাকে বলতে হয়- "আলহামদুলিল্লাহ্" এবং যে শুনে তাকে বলতে হয় - "ইয়ারহামুকাল্লাহ"

আদম (আঃ) দাঁড়িয়ে আল্লাহ্কে সিজদা করলেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আঃ) কে ভাষা ও যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে ফেরেশ্তাগনের সম্মুখে উপস্থিত করলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতা ও জ্বিনদিগকে বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুনাবলী বর্ননা করতে আদেশ করলেন।

জ্বিন ও ফেরেশ্তাগন ঐ সকল বস্তুর নাম ও গুনাবলী বর্ননা করতে

পারল না।

তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে বললেন-"আপনি তো পরম পবিত্র, আমাদের জ্ঞান নেই, যা আপনি আমাদের দান করেছেন উহাই; নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী"। (আল-কুরআন, পারা-১, সুরাঃ বাকারা, আয়াত-৩২)

ফেরেশ্‌তা ও জ্বিনগন নাম বর্ননা করতে অক্ষম হওয়ায় আল্লাহ্ তৎক্ষনাৎ হযরত আদম (আঃ)কে ঐ সকল বস্তুর নাম ও গুনাবলী বর্ননা করতে আদেশ করলেন।

হে আদম। তুমি বলে দাও তাদেরকে ঐ বস্তুগুলির নাম। (আল-কুরআনঃ পারা-১, সুরা বাকারাঃ আয়াত-৩৩)

আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পাওয়া মাত্র হযরত আদম (আঃ) ঐ সমস্ত বস্তুর নাম ও গুনাবলী বর্ননা করলেন।

হযরত আদম (আঃ) ফেরেশ্‌তা ও জ্বিন এই দুই জাতির মধ্যে যে অধিক জ্ঞানী, তা প্রমানিত হয়ে গেল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তা ও জ্বিন উভয়কেই হযরত আদম (আঃ) কে সম্মান প্রদর্শন হেতু সেজদা করতে আদেশ করলেন।

আল্লাহর আদেশে সকল ফেরেশ্‌তা এসে আদমকে সিজদাহ করলেন।

ফেরেশ্‌তাদের এক সরদার ছিলো। নাম আযাযীল বা মোকরম। খুব নেককার আর পরহেজগার ছিলো। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জায়গার এমন কোন স্থান বাকী নেই যেখানে মোকরম সিজদা করে নাই। তার এই একনিষ্ঠ এবাদত বন্দেগীতে খুশী হয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ফেরেশ্‌তাদের সরদার করে বেহেশ্‌তের খাজাঞ্চী করেছিলেন। কিন্তু তিনি আদমকে সিজ্‌দা করলেন না। আল্লাহ্ তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন মোকরম। তুমি আদমকে সিজদা করলে না কেন?

মোকরম ছিল জ্বিন জাতির।

সে বললো-"আনা খায়রুম মিনহু; খালাকতানী মিন নারিঁও ওয়া খালাকতাহু মিন তীন"

অর্থাৎ আমি আদম থেকে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা এবং আদমকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আর এদিকে ফেরেশ্‌তারা সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠিয়ে যখন বুঝতে পারলেন সিজ্‌দা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী মোকরম,

তখন ফেরেশ্‌তারা দ্বিতীয় দফা সিজদায় পতিত হন। তাই প্রথম সিজদা হলো আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন আর দ্বিতীয় সিজদা হলো আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে সমর্থ হওয়ার শুকরিয়া।

এবার আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মোকরম কে উদ্দেশ্য করে বললেন, রে মূর্খ! আত্মঅহংকারে তুই আমার হুকুম অমান্য করলি। জানিস আদমকে মাটি থেকে পয়দা করবার ব্যবস্থা আমিই করেছি। আমিই তাকে ফেরেশতাদের চেয়ে বড় করেছি। আর আমিই তাকে সেজদা করতে বলেছি। এত স্পর্ধা তোর কিসে হলো। তুই এতদিন আমার এবাদত করেছিস সেইজন্য কি? কিন্তু তুই-ই না 'লওহে মাহফুযে' লিখে রেখেছিস যে লক্ষ লক্ষ বৎসর আমার এবাদতে মশগুল হয়ে থাকলেও আমার একটি মাত্র আদেশ অমান্য করলে সমস্ত এবাদত পন্ড হয়ে যাবে? তোর সব এবাদত বরবাদ হয়ে গেল। তুই দূর হয়ে যা আমার দরবার থেকে। আজ হতে তোর নাম হলো ইবলিশ শয়তান।

আল্লাহ্ এই কথা বলার সাথে সাথে মোকরমের চেহারা বিশ্রিরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেল। নিজের এ দুর্দশা দেখে খুব ভয় পেল ইবলিশ শয়তান। কিন্তু বাইরে সে ভাব প্রকাশ করল না। খোদার দরবারে আরজ করলো- হে আল্লাহ্ আপনার দরবার থেকে চিরকালের জন্য যাবার আগে আমি কয়েকটি আরজ পেশ করতে চাই। আশা করি তা মঞ্জুর করবেন।

আল্লাহ বললেন - বল্ কি বলতে চাস। ইবলিস বললো - আমার প্রথম আরজ এই যে, আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত স্বাধীনতা দিন।

আল্লাহ সে আরজ মঞ্জুর করলেন। ইবলিস তার দ্বিতীয় আবেদন পেশ করলো। বললো - আমাকে লোকচক্ষুর অদৃশ্য করে দিন। কেউ জানতে না পারে এমনি করে সকলের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করবার ক্ষমতা দিন। আল্লাহ তাও মঞ্জুর করলেন। এবার ইবলিশ বললো, লক্ষ লক্ষ বছর আপনার এবাদতে মশগুল থেকে সিজ্জীন দোজখ হতে বেহেশতে আসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিন্তু আপনার তৈরী সামান্য মাটির বান্দার ওপর বেয়াদবি করবার জন্য আমাকে এই শাস্তি দিলেন। আমাকে শয়তান বানালেন। আমিও আপনার প্রিয় মানব জাতির ওপর এর প্রতিশোধ নেবো। আজ হতে মানবের অনিস্ট করাই হবে আমার একমাত্র কাজ।

আল্লাহ্ বললেন- হ্যাঁ তুই আক্রমন চালাস। কিন্তু যারা আমার খাঁটি

বান্দা তাদের তুই কিছুই করতে পারবিনা। দুনিয়াতে যারা তোর অনুগত হয়ে কিংবা তোর ধোকায় ভুলবে, তারা তোরই সঙ্গে নরকে গমন করবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে ফেরেশতাগন আদম (আঃ) কে বেহেশ্‌তে এনে রাখলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আঃ) কে সর্ব প্রকার নেয়ামত দান করেন। দিন গিয়ে মাস। মাস কেটে বছর গড়িয়ে গেল। বেহেশতের এতো আরাম আয়েশ। কিন্তু আদমের মনে কিসের যেন শূণ্যতা। একা একা ভাল লাগে না।

সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ সবই বুঝলেন। তাই তৈরী করতে চাইলেন এমন কাউকে, যে হতে পারবে আদমের একান্ত আপনজন। সুখ-দুঃখের সমভাগী। আনন্দ-বেদনার সাথী।

তিনি আবার সৃষ্টিতে মন দিলেন। অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারীনী করে গড়লেন হাওয়াকে। ইনিই মানব জাতির আদিমাতা। তারপর আদমের সাথে হাওয়ার বিয়ে হলো।

হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া বেহেশ্‌তে পরম সুখে বসবাস করতে লাগলেন এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগী করতে লাগলেন। আল্লাহ তাদের বললেন - হে আদম। তুমি ও তোমার স্ত্রী বেহেশ্‌তে অবস্থান কর। আর তোমরা স্বচ্ছন্দে যা ইচেছ আহার কর। কিন্তু ঐ বৃক্ষটির নিকটবর্তী হয়ো না। যদি যাও তা'হলে তোমরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করবে। আল্লাহ্ তাদের আরো জানিয়ে দিলেন যে, ইবলিশ শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য ও পরম শত্রু। তার মধুর বাক্য ও ধোকায় ভুল করো না । তার প্রতারনা থেকে সাবধান থাকবে।

হযরত আদম (আঃ) বললেন হে মাবুদ আমরা পুরোপুরি ভাবে আপনার আদেশ পালন করব। আপনার অসীম অনুগ্রহে আমরা এত অফুরন্ত নেয়ামত লাভ করেছি। এখানে আমাদের এত সুখ-শান্তি আরাম-আয়েশ। ঐ একটি মাত্র বৃক্ষের ফল ভক্ষন করে কেন আমরা আপনার আদেশ অমান্য করব? আমরা তা করবো ন।

আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, হ্যাঁ, ঐ বৃক্ষটির ফল না খেলে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু যদি তোমরা ওটা ভক্ষন কর তবে তোমরা উভয়ে এমন ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হবে যে কোন কিছুর দ্বারাই তা পূরণ করা যাবে না।

আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া পরম সুখে-শান্তিতে

বেহেশ্‌তে বসবাস করতে লাগলেন। এটা দেখে ইবলিশ শয়তান হিংসায় জ্বলে যেতে লাগলো, আর ভাবতে লাগলো কি ভাবে আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়াকে বেহেশ্‌ত থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়, ওদেরকে ধোঁকা দিয়ে গুনাহ্‌গার করা যায় এবং বেহেশ্‌তী জীবনের সুখ-শান্তি থেকে বঞ্চিত করা যায়।

এই ভেবে ইবলিশ বেহেশ্‌তে হযরত আদম (আঃ) এর নিকট যাওয়ার সংকল্প করল।

ইবলিশ আল্লাহ্‌ তা'আলার তিনটি এসমে আযম জানত। সে এটা পাঠ করে সাত স্তর আসমান অতিক্রম করে বেহেশ্‌তে উপনীত হল।

ঐ সময় আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া ভ্রমন করছিলেন। তারা গন্ধম বৃক্ষের নিকট এক রকম কান্নার আওয়াজ শুনে অবাক হয়ে গেল। বেহেশ্‌তে তো কান্না, দুঃখ, শোক এসবের স্থান নেই? তবে কেন এ রকম কান্নার আওয়াজ আসছে? কৌতূহল বশতঃ আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া গন্ধম বৃক্ষের নিকট এলেন। দেখলেন ক্রন্দনরত ব্যক্তি একজন বর্ষীয়ান ফেরেশ্‌তা।

তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন-আপনি এভাবে কাঁদছেন কেন।

তখন ফেরেশ্‌তারূপী ইবলিশ বললো-আমি এজন্য কাঁদছি যে, আপনাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হবে। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাদেরকে সে বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছেন, যে বৃক্ষের ফল ভক্ষনকারীকে কখনো জান্নাত থেকে বের করা হবেনা।

ইবলিশ আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলল-হে আদম, এ ব্যাপারে আমি মিথ্যা কিছু বলছিনা। তোমার অকল্যান আমার কাম্য নয়। তোমাকে আমি সদুপদেশ প্রদান করছি।

অতঃপর আদম (আঃ) বিবি হাওয়া গন্দমের বীচি দুটি নিয়ে খেয়ে ফেললেন। গন্দমের বীচি আদম (আঃ) এর কণ্ঠনালীর নীচে না নামতেই সমগ্র বেহেশ্‌তে একটা হাহাকার পড়ে গেল। আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে উঠলো। হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়ার দেহ হতে বেহেশ্‌তের পোষাক খসে পড়লো। তারা দেখতে পেলেন তাদের শরীরে কোন বস্ত্র নেই। তাঁরা উলঙ্গ হয়ে পড়েছেন।তখন তারা বেহেশ্‌তের পাতা নিজেদের দেহে জড়িয়ে নিয়ে ইজ্জত রক্ষা করার চেষ্টা করলেন। আর শয়তান এই অবস্থা দেখে অট্টহাসি দিতে লাগলো।

হযরত জিব্রাইল (আঃ) এসে বললেন-হে আদম। আপনার রব আপনাকে ডাকছেন।

আদম (আঃ) বললেন"লাব্বায়েক।"অর্থাৎ হে রব আমি হাযির। আপনার নিকট লজ্জিত।

আল্লাহ্ তা'আলা কৈফিয়ৎ আহবান করলেন- আমি কি তোমাদের ঐ বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করিনি, এবং তোমাদের কে কি বলিনি যে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

তখন আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) কান্নারত অবস্থায় বলতে লাগলেন- "রাব্বানা যোয়ালমনা আনফুসানা ওয়া ইললাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকূনান্না মিনাল খাসিরীন"

অর্থাৎ হে রব! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা ও রহমত না করেন তা'হলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হয়ে যাব। (আল কুরআন, সুরা আল আরাফ-আয়াত-২৩)

হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ) তাদের ভুল-ত্রুটি মার্জনার জন্য এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিবেদন করেছিলেন। তাই সমগ্র মুসলমান সমাজ আজও এই কথা বলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন।

হযরত আদম-হাওয়ার দোয়া আল্লাহ্র দরবারে কবুল হলো বটে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মাটির পৃথিবীতেই তাদের ভাগ্যলিপি নির্ধারন করলেন। বললেন-যাও তোমরা আর বেহেশতে বাস করতে পারবেনা। পৃথিবীতে গিয়ে বসবাস কর। তোমরা ও তোমাদের সন্তান সন্ততি সেখানেই বাস করবে। তোমাদের বংশধরগনের মধ্যে পরস্পর কেউ কারো শত্রু থাকবে। সেখানে তোমাদের জন্য আহার ও বাসস্থান রয়েছে। এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে দুনিয়ায় অবস্থান এবং কার্যনির্বাহ করতে হবে এবং পূণ্য অর্জন করে বেহেশ্তের জন্য চেষ্টা করতে হবে। দুনিয়াতে তোমাদের মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু হাশরের দিনে তোমাদেরকে আবার পূণঃজীবিত করা হবে ও স্ব স্ব কর্মফল অনুযায়ী বেহেশ্ত অথবা দোযখ লাভ করবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জিব্রাঈল (আঃ) কে আদেশ করলেন, আদম হাওয়া ও ইবলিশকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করতে।

সঙ্গে সঙ্গে তারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করলেন।

কোথায় পড়লেন আদম, আর কোথায় পড়লেন হাওয়া। কেউ কারো খোঁজ পেলেন না। আর এসব দেখে আড়ালে দাঁড়িয়ে শয়তান মিটিমিটি হাসতে লাগলো। তারপর আদম আর হাওয়া বহুকাল যাবৎ ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকেন। শেষে আরাফাতের ময়দানে তাঁদের মিলন ঘটে। তারা নিজেদের পাপকাজের জন্য বড়ই অনুতপ্ত হন এবং তওবা করেন।

একদিন আদম (আঃ) সিজদায় কেঁদে কেঁদে মাটি ভিজালেন। বললেন - ইয়া আল্লাহ, তুমি হযরত মুহাম্মদের অসিলায় আমাদিগকে মাফ কর। এই নাম আমি আরশ-আযীমে তোমার নামের পাশে দেখেছিলাম। তুমি তার অসিলায় আমাদেরকে মাফ করো।

এ কথা শুনে আল্লাহ খুশী হলেন। বললেন, হে আদম, মুহাম্মদ আমার পিয়ারা নবী। তুমি পিয়ারা নবী মুহাম্মদের অসিলায় মাফ চেয়েছ। আমি তোমাদের মাফ করলাম।

তখন আদম (আঃ) বললেন, ইয়া আল্লাহ। মুহাম্মদ কে ?

আল্লাহ বললেনঃ মুহাম্মদ আমার অতি পিয়ারের, অতি আদরের নবী। তোমার বংশে আখেরী যামানায় তিনি পয়দা হবেন।

তাদের গুনাহ মাফ হয়ে গেল। খুশী মনে আদম উঠে দাঁড়ালেন। বিবি হাওয়া এলেন। দু'জনেই খুশী মনে দু'রাকাত শুকরানা নামায আদায় করলেন। এটাই পরে ফজরের নামায হিসাবে মুসলমান ধর্মে পালিত হয়। এরপর আল্লাহ হুকুম দিলেন, তোমাদের নিকট আমার উপদেশ পৌঁছিবে। যে কেহ আমার উপদেশ গ্রহণ করবে, তাদের কোন ভয় থাকবে না। কিংবা দুঃখের কারণ হবে না। কিন্তু যারা আমার হুকুম মিথ্যা মনে করবে অথবা অমান্য করবে, তারা দোজখবাসী হবে এবং সব সময় সেখানেই তারা থাকবে। আল্লাহ্তালার হুকুমে ফেরেশতা হযরত জিবরাইল (আঃ) এসে আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়াকে মাটি চাষ করে ফসল ফলানো, ক্ষেত খামার করা, ঘরবাড়ী তৈরী করা, কাপড় বোনা ইত্যাদি কাজ শিখিয়ে দিলেন। তারা পরিশ্রম করে দিন কাটাতে লাগলেন।

তারপর তাদের ছেলেমেয়ে হলো। হযরত আদম (আঃ) হলেন পৃথিবীর প্রথম জনক এবং বিবি হাওয়া হলেন প্রথম জননী। প্রথমে হাবিল ও কাবিল নামে হযরত আদম (আঃ)-এর দুটি পুত্র হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায়

কাবিল হাবিলকে মেরে ফেলে। তারপর হযরত আদম (আঃ) বহু ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনির অধিকারী হন। হযরত আদম (আঃ)-এর চেহারার মতই তার এক পুত্র হয়। নাম শীষ (আঃ)।

দেখতে দেখতে দুনিয়াতে মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেল। তাদের হেদায়েতের জন্য হযরত আদম (আঃ) নবী মনোনীত হলেন। মানুষের উপর তার হুকুম জারি করা হলো যে, যারা তার কথা মেনে চলবে, তারা সুখী হবে, আর যারা মানবে না, তারা অশেষ দুঃখের ভাগী হবে।

আল্লাহ্ বলেছেন, যদি আদম সন্তানেরা দুনিয়ার বুকে আমার সকল আদেশ, ঈমান, ধৈর্যের সঙ্গে মেনে চলে তবে তাদের মৃত্যুর পর পুনরায় আবার তাদেরকে আমি অনন্ত শান্তির আশ্রয় বেহেশতে প্রবেশের অধিকার দেব।

কিন্তু দেখা গেল, মানুষ আল্লাহকে ভুলে গিয়ে আবার বিশৃংখলা ও অসামাজিকভাবে চলতে শুরু করলো। পরস্পর মারামারি, হানাহানিতে লিপ্ত হলো।

আল্লাহর অতি প্রিয় সৃষ্টি মানব জাতি। তাই আল্লাহ্ মানব জাতিকে শান্তি ও সুশৃংখল ভাবে রাখার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জায়গায় তার আদেশ নিষেধ দিয়ে বিশেষ কয়েকজন মনোনীত ব্যক্তিকে প্রেরণ করতে থাকলেন তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য। ইসলামের পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় নবী ও রাসুল।

প্রথম নবী হলেন হযরত আদম (আঃ), তারপর হযরত শীষ (আঃ), হযরত ইদ্রীস (আঃ), হযরত ইয়াকুব (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)। এদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা সবাই আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূল।

এদের মধ্যে যাদের উপর আসমানী কিতাব অর্থাৎ ধর্মীয় পুস্তক নাযিল হয়েছে তাদেরকে বলে রাসূল।

আর যাদেরকে ধর্মপ্রচারের জন্য মনোনীত করেছেন ও অধিক মর্যাদা দিয়েছেন তারা হলেন নবী।

চারটি যুগে চার জন প্রসিদ্ধ নবী রসূলের উপর চারটি কিতাব নাযিল হয়। এগুলো হলো–

হযরত মূসা (আঃ) এর উপর – তওরাত

হযরত দাউদ (আঃ) এর উপর – জবুর

হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর – ইঞ্জিল

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর – কোরআন

এ ছাড়া আরো ১০০ খানা ছহিফা বা ছোট কিতাব বিভিন্ন নবীর (দঃ) উপর নাযিল হয়। মুসলমানগণ এই চারটা আসমানী কিতাব স্বীকার করলেও কোরআনকেই শেষ ও শ্রেষ্ঠ কিতাব হিসাবে মানেন এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ) কেই শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হিসেবে গ্রহণ করেন। তাই মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হলো কোরআন।

ইসলামী শিক্ষানুসারে ইসলাম হল আদি ধর্ম, অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মূসা (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) দ্বারা প্রচার করা হয়েছিল। মুহাম্মদ (সঃ)-এর দ্বারা আল্লাহ পূর্ণরূপে ও চিরস্থায়ীভাবে তাই প্রকাশ করেছেন।

সকল নবীদের মধ্যে আল্লাহ্ হযরত মূসা (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে কিতাব দিয়ে রসূল হিসেবে এই জগতে প্রেরণ করেছিলেন এবং প্রত্যেক জনের আমলে ঐ সময়ের রসূলের অনুগামী হতে আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিলেন। তাই আল্লাহ যখন সর্বস্থানে ও সর্বযুগের মানুষের সকল সমস্যার একটি মাত্র সমাধান দিতে চাইলেন তখন তার সমস্ত আদেশ-নির্দেশ দিয়ে তার শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে তাদের কাছে প্রেরণ করলেন।

আল্লাহ যখন একজন নবী বা রসূলকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন তখন তাকে অনুসরণ করতে মানুষকে বাধ্য করেন। কিন্তু দেখা যায়, সব সময় কিছু লোক আল্লাহর নবী রাসূলদের বিরোধীতা করে থাকে।

তাই দেখা যায়, মানব জাতি যখন নবী রাসূলের নির্দেশিত ধর্ম পূর্ণভাবে পালন করে না, তখন আল্লাহ পুনরায় তাদের কাছে আর একজন নবী রাসূলকে পাঠান ও নতুন বিধি-বিধান জানিয়ে দেন। কিন্তু পূর্ববর্তী নবীর যারা অনুগামী, তারা অনেকেই সেই নতুন নবীর কথা না মেনে তাদের সেই পূর্ববর্তী নবী বা রাসূলের কথা পালন করে। তাই সকল মানুষ একমাত্র আল্লাহকে স্বীকার করলেও এইভাবে ধর্মের ভিন্নতা সৃষ্টি হয়ে পড়ে।

এখানে তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য কুরআন ও বাইবেল থেকে অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম এবং ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

ইসলাম ধর্মে বলে	ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মে বলে
আদম (আঃ) আল্লাহর মনোনীত নবী	আদম পরমেশ্বরের মনোনীত সেবক।
হাওয়া আদম (আঃ) এর পুত্ররা হাবিল, কাবিল ও শীষ (আঃ)	হবা আদম এর পুত্ররা হেবল, কয়িন ও শেখ।
হযরত নূহ (আঃ)	নোহ
হযরত নূহ (আঃ) এ পুত্র এয়াকুছ, সাম ও হাম	নোহ এর পুত্র কোম, হাম ও বেফৎ
হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইসলাম ধর্মে নবী ইব্রাহিম (আঃ) এর পুত্র হযরত ইসমাইলের মধ্যে দিয়ে ইনি আরবীয়দের পিতা হযরত ইসহাকের পুত্র হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও ইস (আঃ)	আব্রাহাম ইহুদী ধর্মে কুলপতি আব্রাহামের পুত্র ইসহাকের মধ্যে দিয়ে ইনি ইহুদীদের পিতা ইসহাকের পুত্র যাকোব, ও এষৈ।
ইয়াকুব (আঃ) এর বারো জন পুত্রের একজনের নাম হযরত ইউসুফ (আঃ)	যাকোবের বারোজন পুত্রের একজনের নাম যোসেফ।
হযরত মূসা (আঃ) ইসলাম ধর্মে একজন রসূল।	মোশী-ইহুদী ধর্মের মহাপুরুষ।
বাদশাহ ফেরাউন	বাদশাহ ফরৌন
হযরত দাউদ (আঃ)-ইসলাম ধর্মে একজন নবী রসূল ও শাসক।	রাজা ডেভিড-একজন বিখ্যাত ইহুদী রাজা
দাউদ (আঃ) এর পুত্র হযরত সোলায়মান-বাদশা ও নবী	ডেভিডের পুত্র সলোমন একজন বিখ্যাত ইহুদী রাজা
হযরত যাকারিয়া হযরত যাকারিয়ার পুত্র হযরত ইলিয়াস	সখরিয়া। সখরিয়ার পুত্র যোহন এলি
হযরত ঈসা (আঃ) মরিয়ম-ঈসা (আঃ) এর মাতা, জিব্রাইল (আঃ) একজন ফেরেশ্‌তা	যীশু-খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবর্তক। মরিয়া-যীশুর মাতা। গব্রিয়েল - একজন মহাদূত

এইভাবে আদম (আঃ) ও মা হাওয়া থেকে সারা বিশ্বে মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ধর্মের আর একই জনের বিভিন্ন নাম।

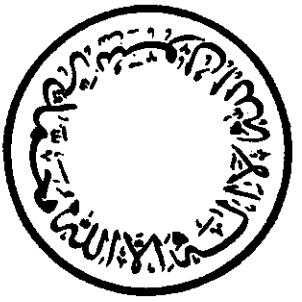

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক

(৫৭০ খ্রীস্টাব্দ-৬৩২ খ্রীস্টাব্দ)

অনেক অনেক দিন আগের কথা। তখনো মানুষ বন্দুক, কামান এগুলোর আবিস্কার শিখে নাই। তারা লড়াই করত তীর, তলোয়ার, পাথর খন্ড ইত্যাদি দিয়ে।

সেই সময়ের কথা। আরবের একটি লড়াই এর ময়দান। একটু আগেই সেখানে বেশ বড় একটা লড়াই হয়ে গেছে। উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের লাশ ময়দানের এখানে সেখানে পড়ে আছে।

এক পক্ষের নেতাকে অপর পক্ষের যোদ্ধারা দূর থেকে পাথর মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তিনি বেহুস হয়ে মাটিতে পরে আছেন। সঙ্গীরা এসে তাকে টেনে তুললো। তিনি কপাল থেকে রক্ত মুছতে মুছতে আকাশের দিকে চেয়ে বললেন- "আল্লাহ্! ওদের তুমি ক্ষমা করে হক পথে ফিরিয়ে আন। ওরা জানেনা ওরা কি করছে।"

একথা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল। লোকটাকে ওরা এভাবে মারলো, অথচ তাদের জন্য এই প্রার্থনা! অদ্ভুত!

সত্যিই তিনি অদ্ভুত ছিলেন। একবার তিনি তায়েফে গেলেন ধর্ম প্রচার করতে। মক্কা থেকে সত্তর মাইল দক্ষিন, পূর্বে তায়েফ। তায়েফবাসীরা তার ধর্ম প্রচারের কথা শুনে বললো, আমাদের বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষের পুরানো ধর্ম ছেড়ে নতুন ধর্ম নিতে যে ব্যক্তি বলে, সে আমাদের দুশমন! মার। তারপর তাকে মারতে মারতে তারা বেহুস করে ফেললো। সাথীরা তাঁর চোখে-মুখে পানি দিল। তাঁর হুশ ফিরে এল। তখন তাঁর মনে হল, ভাল কথা বলার জন্য কাউকে অকারণে যারা মারে তাদের উপর আল্লার গজব নাজেল হতে পারে। তিনি মনে মনে শিউরে উঠলেন। বললেন, আল্লাহ, এদের উপর যেন কোন গজব নাজেল না হয়। আমার জন্য কারো কোন বিপদ হোক এ আমি চাইনে।

এইভাবে নানান জুলুম ও অসহ্য কষ্ট সহ্য করে ছোট বেলা থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যিনি মানুষের মংগলের জন্য ভেবেছেন, তিনি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। আমাদের শেষ নবী, খোদার অতি পেয়ারের বান্দা ও সকল নবীর সেরা নবী।

তিনি ছিলেন শিশুর মত সরল। ফুল ও শিশুকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন।

একবার হলো কি, মদীনায় ঈদ। সর্বত্রই আনন্দের বন্যা বইছে। ঈদের নামাজ হয়ে গেলে ফিরবার পথে হযরত দেখলেন, অনেকগুলো ছোট ছেলেমেয়ে খেলাধূলা করছে। কেবল ময়লা ছেড়া কাপড় পড়া একটি বালক একপাশে বিষন্ন মনে বসে আছে। হযরত তার কাছে গেলেন ও সস্নেহে কাঁধে হাত রেখে বললেন, কি হয়েছে বাবা? তুমি একলা কেন।

বালক হযরতকে চিনত না। সে রেগে হযরতের হাত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললো, একলা থাকবোনা কি করবো? ওদের নূতন জামা-কাপড় আছে ওরা আমোদ করছে। আমার কি আছে ?

হযরত ফের জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তোমার নাই বাছা ? বালকটি এবার আরো রেগে গেল। বললো কেমন করে থাকবে? আমার কি বাপ আছে, না মা আছে ?

হযরতের বুক থেকে এক বড় দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। তিনি বললেন, ও তাই, আচ্ছা আজ থেকে রসুলুল্লাহ হলেন তোমার বাপ, আর বিবি আয়েশা হলেন তোমার মা। রাজী আছ? ছেলেটির মন খুশিতে ভরে উঠলো। হযরত তার হাত ধরে তাকে বাড়ীতে নিয়ে এলেন।

আর একটি ঘটনা - একদা হযরত একা এক গাছতলায় ঘুমিয়ে আছেন। কিসের শব্দে হঠাৎ জেগে দেখেন খোলা তলোয়ার হাতে এক দুশমন তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। সে গর্জন করে বলে উঠলো, এখন তোমাকে রক্ষা করবে কে? হযরত শান্ত কণ্ঠে বললেন, আল্লাহ্।

লোকটার দেহ মন হঠাৎ কেঁপে উঠলো। তার হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ল। তখন হযরত সে তলোয়ার নিজ হাতে নিয়ে বললেন, এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে ?

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিল, কেউ না। হযরত বললেন, না,

তোমাকেও সেই আল্লাহ্ রক্ষা করবেন। এই নাও ভাই তোমার তলোয়ার। এখন বাড়ী যাও।

আর একবার এক কওমের সর্দার হযরতের সঙ্গে দেখা করতে এল। অভদ্র ব্যবহার ও খারাপ চরিত্রের জন্য লোকটার দুর্নাম ছিল। হযরতের সঙ্গেও সে নিতান্ত অভদ্র ভাবেই কথাবার্তা বল্ল। কিন্তু হযরত তার সাথে খুব নম্র ও ভালো ব্যবহার করলেন। লোকটি চলে গেলে মহানবীর বিবি হযরত আয়েশা বললেন, হযরত এই লোকটি সব দিকেই মন্দ। তবু তার সঙ্গে আপনি এতো ভালো ব্যবহার করলেন কেন ? হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বললেন, আয়েশা , সেই ব্যক্তিই আসলে মন্দ, যে অন্যকে মন্দ ভেবে তার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করে।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তার কন্যা ফাতিমাকে খুব বেশী ভালবাসতেন। একদিন কন্যা হযরতকে বললেন, এই দেখুন বাবা, আটা পিষতে পিষতে আর পানি টানতে টানতে আমার হাতে কড়া পড়ে গেছে। আর তো পারি না বাবা। শুনেছি লড়াইয়ের ফলে বায়তুলমালে অনেক দাস দাসী হাজির হয়েছে। তারই একটি আমাকে দিন। হযরত উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, মা ওযে আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, ওতে তো আমার নিজস্ব কোন অধিকার নেই, কন্যা উত্তরে বললেন। কিন্তু সব তো আপনারই হাতে। হযরত বললেন, হ্যাঁ, আমারই হাতে। কিন্তু আমি দশের প্রতিনিধি হিসেবে এ সবের রক্ষক, জিম্বাদার মাত্র। তাদের অনুমতি নিয়ে তাদেরই মঙ্গল ছাড়া অন্য কাজে ব্যয় করার যে আমার কোন অধিকার নাই।

পরিশ্রমকে তিনি অসীম মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু দিতেন, নিজের জুতা মেরামত করতেন, কাপড় সেলাই করতেন। বকরী দোহন করতেন।

নিজে মায়ের স্নেহভোগের সুযোগ পান নাই। কিন্তু তিনি বলেছেন যে, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত। কন্যা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, মা হিসেবে, তিনি নারীর মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে গেছেন।

তিনি নিজে নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু বিদ্যা অর্জনকে তিনি নর-নারী উভয়ের জন্য ফরজ করে গেছেন। তিনি বলেছেন, জ্ঞান বেহেস্তের আলো। সুখের দিশারী, দুঃখের ঔষধ। বন্ধু মহলে অলংকার, শত্রুর মধ্যে ঢাল। আলেমের লিখিবার কালি শহীদের খুনের চেয়েও অধিকতর পাক।

আর একটি ঘটনা। এক বুড়ি ছিল। বড় হিংসুটে। মাঠে বকরী চরাতো

আর এই চলার পথে বাবলার কাঁটা পুঁতে রাখতো। হযরত হেসে কাঁটা তুলে পথের বাইরে ফেলে দিতেন। কখনো বা দুই একটা কাঁটা তাঁর পায়ে ফুটতো। তারপর তিনি যখন পায়ের কাঁটা খুলতেন বুড়ী তখন দূর থেকে হাত তালি দিয়ে হাসতো। একদিন দেখা গেল পথে কাঁটা নেই। বুড়ি ও আশে পাশে কোথাও নেই। সেইদিন গেল। পরদিন গেল। তারপর দিনও গেল। হযরতের তো খুশী হওয়ারই কথা, তাই না? কিন্তু নাহ্। তিনি ভাবলেন বুড়ির হলো কি? নিশ্চয়ই তার কোন অসুখ করেছে। তক্ষুণি তিনি বের হলেন বুড়ির খোঁজে। তারপর দেখতে পেলেন বুড়ি অসুখে বিছানায় পড়ে আছে। তার সেবা-শুশ্রুষা করার কেউ নেই। তখন তিনি বুড়ীর ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করলেন। তাকে শুশ্রুষা করে ভাল করে তুল্লেন। এরপরও কি আর বুড়ি এই ব্যবহার করতে পারে?

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জন্মগ্রহণ করেন আরব দেশে।

আরব দেশ আমাদের দেশের অনেক অনেক পশ্চিমে অবস্থিত। বিরাট মরুভূমির দেশ। শুধু বালি আর বালি। এই দেশের তিন দিকে পানি। একদিকে শুকনো মাটি। আরব দেশ আয়তনে বারো লক্ষ বর্গমাইল। ইউরোপের চার ভাগের এক ভাগ।

'আরব' নামকরণের পেছনেও এক কাহিনী আছে। শোনা যায় ইউফ্রেতীশ নদীর পূর্ব অঞ্চল থেকে সেমিটিক গোষ্ঠির একজাতি আরবে আসে এবং আদিম বাসিন্দাদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই বসবাস শুরু করে দেয়। এদের পূর্ব পুরুষের নাম ছিল কাহ্তান। কাহ্তানের এক পুত্রের নাম ছিল ইয়ারেব। ইয়ারেব ধন দৌলত ও সাহসের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেন। তাঁর নাম অনুসারেই দেশ ও জাতির নাম হয় আরব।

আগেই বলেছি আরবে তিনভাগ নদী, এক ভাগ মাটি। পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে পারস্য ও ওমান উপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, আর কেবল উত্তরে স্থলভাগ সিরিয়া। কাজেই ভূগোলের ভাষায় আরবকে একটি উপদ্বীপও বলা যায়।

আরবের দুটি শহর বিখ্যাত। মক্কা এবং মদিনা। আরবের যে অংশ লোহিত সাগরের নিকটবর্তী তার নাম হেজাজ। মক্কা ও মদীনা শরীফ এই হেজাজে অবস্থিত।

হযরতের জন্মের আগে আরবের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তারা কথায়

কথায় কলহ বিবাদ করতো। মারামারি কাটাকাটি করতো। তারা মদ খেতো, জুয়া খেলতো, চুরি ডাকাতি করতো আর কারও ঘরে মেয়ে সন্তানের জন্ম হলে সেই অসহায় শিশুটিকে গলা টিপে মেরে ফেলতো। স্ত্রীলোকদের প্রতি আরববাসীদের ব্যবহার ছিল খুবই খারাপ। সেই অজ্ঞযুগে আরবে কুরাইশরা ছিলেন সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত। তার প্রথম কারণ, তাঁরা ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধর এবং দ্বিতীয় কারণ, মক্কা ও তার আশেপাশে এদের প্রভাব ছিল প্রবল। তখন কুরাইশ কওমের সর্দার ও মক্কার শাসনকর্তা ছিলেন আবদুল মুত্তালিব। আবদুল মুত্তালিব ছেলেদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন আবু তলেব, হামজা, আব্‌বাছ ও আবদুল্লাহ। জুইরা কওমের সর্দারের কন্যা আমিনার সঙ্গে আবদুল্লার বিয়ে হয়। আবদুল্লার ঔরসে বিবি আমিনার গর্ভে ৫৭০ খৃষ্টাব্দে (১২ই রবিউল আউয়াল) সোমবার, ছোব্‌হে ছাদেকে মক্কা নগরে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জন্ম হয়।

হযরতের জন্মের আগেই তার পিতা আবদুল্লাহর মৃত্যু হয়। অনাথ পৌত্রের সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে দাদা আবদুল মুত্তালিবের মন আনন্দে ভরে গেল। তিনি শিশুর নাম রাখলেন মুহাম্মদ, অর্থাৎ প্রশংসিত।

তখন আরবের সম্ভ্রান্ত ঘরের মায়েরা বাচ্চা সন্তান পালতেন না। ধাত্রীরা পেলে দিত। সেই মোতাবেক হালিমা নামে এক বেদুইন ধাত্রী শিশু মুহাম্মদকে পালতে নিয়ে গেলেন। মুহাম্মদের বয়স যখন ছয় বৎসর তখন হালিমা তাঁকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। কিন্তু মায়ের স্নেহ বেশীদিন শিশুর ভাগ্যে সইলো না। সেই বছরই বিবি আমিনা মারা গেলেন।

আবদুল মুত্তালিব এতিম পৌত্রের ভার নিলেন। কিন্তু দুই বছর পর দাদা আবদুল মুত্তালিবও ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর আগে তিনি পুত্র আবু তালিবকে ডেকে তাঁর উপর অসহায় শিশু মুহাম্মদের ভার দিয়ে গেলেন। অতঃপর চাচা আবু তালিব তাঁকে বেশ আদরের সাথে লালন পালন করতে থাকেন।

আবদুল মুত্তালিব খুব দিলখোলা মানুষ ছিলেন। দুই হাতে টাকা পয়সা খরচ করতেন। কাজেই শাসনকর্তা হলেও মৃত্যুকালে তিনি টাকা পয়সা বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেননি। ফলে শিশুকে নিয়ে আবু তালিব একটু অসুবিধায় পড়লেন। তাঁর লেখাপড়ার সুযোগ আর হয়ে উঠলো না। চাচার সকল কাজে তিনি সহায়তা করতে লাগলেন। তিনি চাচার ভেড়া-বকরী নিয়ে মাঠে চরাতেন। মেষ পালকে চরতে দিয়ে তিনি ময়দানের এক কোনে বা পাহাড়ের পাশে বসে

প্রকৃতির বিচিত্র শোভা দেখতেন। মরুর তপ্ত হাওয়া বাবলার শাখায় শাখায় দোলা দিয়ে যেতো। খেজুর গাছের শুকনো পাতা ঘর ঘর শব্দে মিলিয়ে যেতো। কিন্তু বালক মুহাম্মদের ধ্যান ভাংগতো না। মেষপাল ঘুরে ফিরে ঘাস খেতো। শাবকেরা লাফালাফি করতো। হয়তো একটা আদূরে ছোট বাচ্চা তার চাঁদর ধরে টানাটানি করতো, কিন্তু তিনি তাতে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। কি এক অন্তহীন চিন্তায় যেন তলিয়ে যেতেন।

দূরে সারি সারি কাফেলা যায়। কোথায় যায় ওরা? মেলায় ? ওক্কাজের মেলায় ? ওক্কাজের মেলা তিনি চিনতেন। সেখানে মদ জুয়ার আড্ডা বসে। বচসা হয়। বচসা থেকে মারামারি। মারামারি করতে করতে একজন আর একজনের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়।

আচ্ছা এসব দূর করা যায় না ? এই মদ, জুয়া, মারামারি ? বালক নিজের মনে নিজেকেই প্রশ্ন করে। আবার নিজেই উত্তর দেয়- কেন করা যাবে না? এ দুনিয়ায় মানুষের অসাধ্য কী আছে ?

আবার বালক অন্তহীন চিন্তায় ডুবে যায়। তার বয়স যখন বারো তখন চাচা আবু তালিব তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গেলেন। সিরিয়া গিয়ে তিনি দেখলেন এখানে অনাচার আরও বেশী। মন তার ব্যথায় ভরে উঠলো।

দেশে তখন চুরি ডাকাতির উপদ্রব ছিল বেশী। এ জন্য অনেকেই চিন্তা করতে লাগলেন, এমন একজন বিশ্বাসী লোক দরকার, যার কাছে মূল্যবান জিনিস পত্রাদি রাখা যায়। সেই কিশোর বয়সেই মুহাম্মদের 'বিশ্বাসী' বলে নাম ছড়িয়ে গেল। কেউ কোনদিন তাকে মিথ্যা বলতে শুনে নাই। বহু লোক তার কাছে দামী দামী জিনিস আমানত হিসাবে রাখতো। তিনি পরম বিশ্বস্ততার সংগে এই সব আমানতের দায়িত্ব পালন করতেন বলে সকলে তাকে উপাধি দিল 'আল-আমিন' বা বিশ্বস্ত।

ধীরে ধীরে মুহাম্মদ (সঃ) যৌবনে পা দিলেন।

মক্কা নগরে তখন একজন খুব ধনবতী ও গুণবতী বিধবা মহিলা ছিলেন। তিনি খুব নেক ও সতী নারী ছিলেন বলে সকলে তাঁকে 'তাহেরা' (সতীসাধ্বী) বলে ডাকতো। তার আসল নাম ছিল খাদিজা।

তখন খাদিজা তার ব্যবসা চালাতে একজন সুদক্ষ ও বিচক্ষণ লোক

খুঁজছিলেন। তিনি হযরতের সুনাম ও বিশ্বস্ততার কথা শুনে লোক মারফত হযরতের চাচা আবু তালিবের নিকট জেনে নিলেন হযরত তার ব্যবসা চালাতে রাজী আছেন কি না। হযরত তার চাচার মত নিয়ে রাজী হলেন এবং ব্যবসার ভার নিয়ে সিরিয়া গেলেন।

ব্যবসায় খাদিজার খুব লাভ হলো। কারণ হযরত খুব সততা ও পরিশ্রমের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করেছিলেন। এতে হযরতের প্রতি খাদিজার ভক্তি আরও বেড়ে গেল। অবশেষে বিবি খাদিজা এমন একজন মহৎ ও সৎ লোককে চির সাথী করবার বাসনায় হযরতের মুরুব্বী চাচা আবু তালিবের নিকট লোক পাঠালেন। আবু তালিব ভাইপোর সাথে পরামর্শ করে রাজী হলেন। তারপর একশুভদিনে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সাথে বিবি খাদিজার বিয়ে হয়। তখন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বয়স ছিল পঁচিশ আর বিবি খাদিজার বয়স চল্লিশ বৎসর। এই বিয়ে সব দিক দিয়েই শুভ হয়েছিল। বিবি খাদিজাই সকলের আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তার ধন-দৌলত ইত্যাদি দিয়ে হযরতকে তার সকল কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। দীর্ঘকাল হযরত এই মহীয়সী মহিলার বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত স্বামী ছিলেন। তার মৃত্যুর আগে হযরত আর কোন দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেননি। বিবি খাদিজার ঘরে হযরতের বেশ কয়েকজন ছেলেমেয়ে হয়েছিল। বড় ছেলে কাসেম এবং পর পর সব ছেলেই মারা গেল। শুধু মাত্র চারটি মেয়ে বেঁচে রইল (১) জয়নব, (২) রোকেয়া, (৩) কুলসুম (৪) ফাতিমা ।

এই বিয়ের পর ১৫ বৎসর কাল পর্যন্ত হযরতের জীবনে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে।

আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর কয়েক জন সর্দার মিলে মক্কার শাসন ব্যবস্থার ভার নেন। কিন্তু শাসন কাজে বিশৃংখলা দেখা দিল। দিনে দুপুরে দূরাগত যাত্রীদের জিনিসপত্রাদি লুণ্ঠিত হতে থাকলো। শুধু টাকাকড়ি বা জিনিস পত্রাদি নয়, যাত্রীদের স্ত্রী কন্যাও লুট হয়ে যেতে লাগলো। এইসব অনাচার অত্যাচার দূর করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উৎসাহে মক্কার কয়েকজন বড় বড় নাগরিককে নিয়ে একটি সমিতি গঠিত হলো। এর নাম রাখা হয় - 'হিলফুল ফুজুল' । হযরত ছিলেন এর প্রধান কর্মকর্তা। এর উদ্দেশ্য ছিল ধনী গরীব নির্বিশেষে সকলকে অন্যায় অত্যাচার হতে রক্ষা করা, আর গরীব অসহায়দের সাহায্য করা। ইসলাম প্রচারের পরেও ৫০ বৎসর কাল পর্যন্ত এই সমিতি অনেক

লোকহিতকর কাজ করতে থাকে।

আর একটি ঘটনার কথা শোন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর বয়স তখন ২৪/২৫ বৎসর। সে সময় মক্কার কাবাঘর আর একবার মেরামত করার দরকার হয়। আরববাসী সকলে মিলে এই পবিত্র ঘরের মেরামত কাজ শুরু করেন। হযরত ও বড় বড় পাথরের বোঝা উঠিয়ে এই কাজ করেন। কাজ শেষ হয়ে এলে এক বড় ঝগড়া দেখা দিল তাদের মধ্যে। এই ঘরে একটি কালো পাথর আছে। এই পাথরটি 'হজ্‌রে আস্‌ওয়াদ' নামে পরিচিত। কথিত আছে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর ছেলে ইসমাঈল (আঃ) এই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কাবাঘর মেরামত করেছিলেন।

হজ্‌রে আস্‌ওয়াদ

হাজিগণ হজে এসে এই পাথরে চুমো দেন।

কুদরতী পাথর

হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে কাবাঘরের দেয়াল গেঁথেছিলেন।

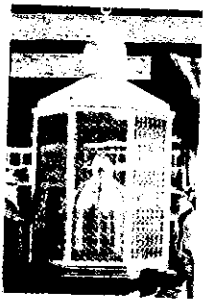

আরবে নানা গোত্রের লোক বাস করতো। প্রত্যেক গোত্রের সরদার চাইল তার দ্বারাই এই মহান কাজ সমাধা হোক। কারণ যিনিই এটা সরাবেন তিনিই বিশেষ মর্যাদা পাবেন। প্রত্যেক জনেরই একই দাবী। মীমাংসার কোন উপায় নেই। এই ঝগড়ায় তিনদিন কেটে গেল। প্রত্যেক গোত্র এটা করবার জন্য জান দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত হলো। আরবেরা এ বিষয়ে তো আগে থেকেই অভ্যস্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত কুরেশ সরদার আবু উম্‌মীয়ার প্রস্তাব দিলেন যে, পরদিন ভোর বেলা সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কাবাগৃহে প্রবেশ করবে সেই এই বিবাদের মিমাংসা করবে।

এই কথায় সকলেই রাজী হলো। সেদিনের মতো বিবাদ থামলো।

আল্লাহ্‌র কী অসীম লীলা। পরদিন দেখা গেল সকলেই যাকে ভালবাসে ও বিশ্বাস করে তিনিই সকলের আগে সেখানে এসে হাজির হয়েছেন। হযরতকে দেখে সকলেই ভীষণ খুশী হলো এবং বলতে লাগলো, এইবার আর বিবাদ থাকবে না। কারণ আল-আমীন ত অবিচার করবে না। আর তাঁর বিচার আমরা সকলেই খুশী মনে মেনে নেবো।

হলোও তাই। হযরত তাদের ধীর ও শান্ত হতে বললেন। সকল গোত্রের একজন করে সরদারকে ডাকলেন। তারপর নিজের চাদর খানা মাটিতে বিছিয়ে দিলেন এবং তার ভিতর কালো পাথরটি নিজ হাতে উঠিয়ে তাতে রাখলেন। সরদারদিগকে চাদর খানার কোণা ধরতে বললেন। পাথরটিকে তারা নিয়ে গেলে হযরত নিজ হাতে সেটা যথাস্থানে রেখে দিলেন। এতে সকলেই খুশী হলো। হযরতের বিচার ক্ষমতা দেখে সকলেই তাঁর প্রশংসা করতে লাগলো। এইভাবে হযরতের বুদ্ধিমত্তায় আরবের সমস্ত গোত্রের সম্মান রক্ষা হলো এবং আসন্ন কলহ হতে সকলেই রক্ষা পেল।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ঐ কাবা গৃহের প্রথম মেরামত করলেন।

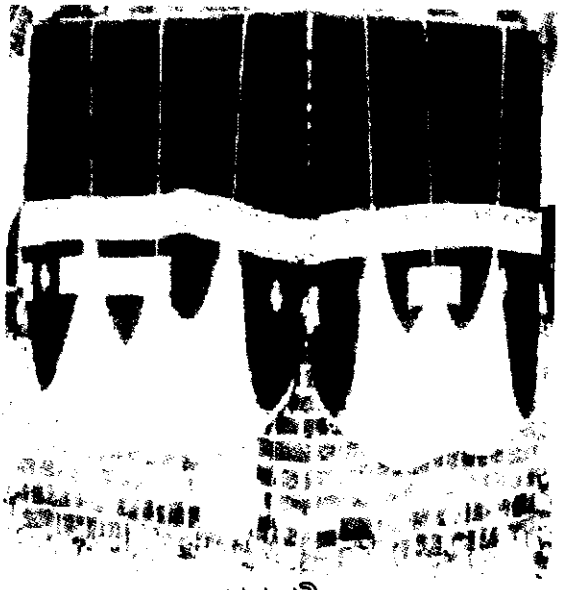

কাবা শরীফ

এ সময় হযরত আর একটি মহৎ আদর্শ স্থাপন করেন। খাদিজার এক আত্মীয় 'জায়েদ' নামক একটি বালক গোলাম খরিদ করে খাদিজাকে দেন। বিবি খাদিজা বালকটিকে হযরতের খেদমতের জন্য দেন। কিন্তু হযরত তক্ষুণি জায়েদকে মুক্তি দান করেন। জায়েদের পিতা তাকে নিতে আসে। কিন্তু বালক হযরতকে ছেড়ে যেতে রাজী হলো না।

সময় গড়াতে লাগলো। হযরতের মধ্যে আস্তে আস্তে দেখা দিল এক বিরাট পরিবর্তন। ব্যবসা-বণিজ্য থেকে তার মন উঠে গেল। একাকীত্ব আর নির্জনতাই তার বেশী ভালো লাগতো। কী এক অজানার সন্ধানে যেন মন ঘুরতো। এমন যখন মনের অবস্থা, তখন আরও একটি আশ্চার্য বিষয় দেখা গেল। তিনি যা মুখে বলেন, সেটাই সত্য হয়ে দেখা দেয়। তিনি যে স্বপ্ন দেখেন সেটাই বাস্তবে রূপ নেয়। সবাই অবাক হয়ে যায়। মাঝে মাঝে তিনি লোকালয় ত্যাগ করে নির্জনে বসে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। মক্কা থেকে মাইল তিনেক দূরে এক পর্বত, না হেরা পর্বত। সেই হেরা পর্বতের শূন্য গুহায় বসে হযরত এবাদত করতে লাগলেন। বাড়ী থেকে কিছু শুকনা রুটি খেজুর ও পানি নিয়ে যেতেন। এগুলো খেয়ে দিনের পর দিন তিনি গভীর এবাদতে মশগুল থাকতেন।

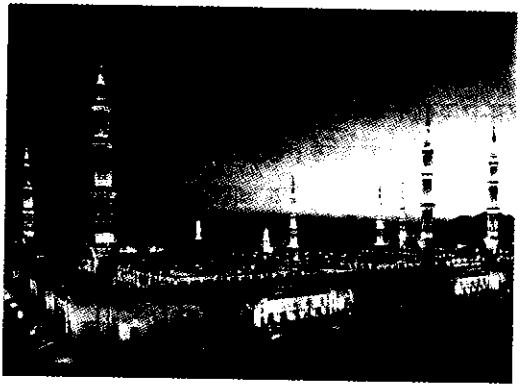

মসজিদে নববী

রমজান মাসে বাইরের জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ এক রকম বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কেবল পথহীন মরু প্রান্তরের অসহায় পথিকদের পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে তিনি গুহার বাইরে আসতেন। বাকী সময় তাঁর নির্জন ধ্যান-উপাসনায় কেটে যেত।

একবার কয়েকদিন পর্যন্ত হযরত বাড়ী ফিরলেন না। বিবি খাদিজা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ও তাঁর খোঁজে লোক পাঠিয়ে দিলেন। লোকেরা হেরা পর্বতের কাছে গিয়ে রাখালদের জিজ্ঞাসা করল - তোমরা কেউ মুহাম্মদকে দেখেছো ? তাদের একজন বললো, - মুহাম্মদ নামের কোন লোক তো আমি চিনি না, তবে আমার বকরী খুঁজতে ঐ পাহাড়ের উপর কিছুটা উঠেছিলাম, তখন কান্নার মত একটা আওয়াজ আমার কানে এল। আমি ভয় পেয়ে পালিয়ে এলাম।

যারা খুঁজতে এসেছিল, তারা খুঁজতে খুঁজতে গুহার দরজায় গিয়ে হাজির হন। দেখেন, হযরতের চোখে পানি। তারা জিজ্ঞেস করলো ঃ আপনার সব থাকতে আপনি এখানে বসে কাঁদছেন কেন ? হযরত জবাব দিলেন, বিপন্ন মানুষের মুক্তির পথ খুঁজে আমি হয়রান। কবে মিলবে এ মুক্তির পথ ?

হযরতের চিন্তাধারা গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগলো। অবশেষে সত্য ধরা দিল। হেরা পর্বতের নির্জন গুহা। রাতের অন্ধকারে ধ্যানে ডুবে আছেন

তিনি। এমন সময় তাঁর কাছে আল্লাহর বাণী এল। এক অশ্রুতপূর্ব শব্দ 'ইকরা বিছমে রাব্বেকা' যিনি বিশ্বের স্রষ্টা, তোমার সেই প্রভুর নামে পাঠ কর।

বিস্ময়ে-শিহরণে হযরত মুদ্রিত আখি খুললেন। দেখতে পেলেন তাঁর সামনে এক অপূর্ব জ্যোর্তিময় মূর্তি। ভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। তক্ষুণি গুহা ত্যাগ করে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ীতে এলেন এবং বিবি খাদিজাকে বললেন, "আমার গা ঢেকে দাও।"

তাঁর শরীরে বেশ তাপ উঠেছিল। বিবি খাদিজা তাঁর গা ঢেকে দিলেন। তাঁকে সাহস ও উৎসাহ দিলেন। হযরত বললেন, "এক দিব্য-মূর্তি তাকে কিছু পড়তে বললেন। " তখন খাদিজা (রাঃ) তাকে সাহস ও উৎসাহ দিয়ে বললেন যে, খোদা কখনই সৎলোককে বিফল করেন না। আপনি যে এতিমের বন্ধু, বিপন্নের সহায়, সত্যের সেবক।'

অতঃপর খাদিজা হযরতকে সাথে করে তার চাচাত ভাই ওরাকা বিন নাওফলের নিকট নিয়ে গেলেন। ওরাকা সব শুনে খুশী হয়ে বললেন, 'কুদ্‌দুস, কুদ্‌দুস। হযরত মূসার নিকট যে নামুস (আল্লাহর দূত) আসতেন, ইনি সেই নামুস। হায়, আজ যদি আমি যুবক থাকতাম, আর যখন তোমার আপনজনেরা তোমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে তখন যদি আমি বেঁচে থাকতাম, তবে কতই না ভাল হতো, তখন হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কি ওরা আমাকে তাড়িয়ে দেবে? ওরাকা বললেন, তোমার মত বাণী নিয়ে যারা আসে, তাদের উপর জুলুম হয়েই থাকে।

এর কিছুদিন পরই ওরাকা মারা যান। আগের মত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হেরা পর্বতে গেলেন এবং খোদার ধ্যানে মগ্ন হলেন। পূর্বের সেই 'আলো' বললেন "পড়"। হযরত বললেন, "আমিতো পড়া জানিনা। " তারপর হযরত জিব্‌রাইল (আঃ) যিনি কোরআনের বাহক, তাকে দৃঢ়ভাবে আলিংগন করলেন এবং পর পর তিনবার আলিংগন করলেন। হযরত লেখাপড়া জানতেন না। তথাপি তিনি এইবার পড়তে পারলেন। জিবরাইল কোরআন শরীফের সর্ব প্রথম আয়াত পাঁচটি পাঠ করলেন,'পড় তোমার রব্বের নামে পড়' যিনি তোমাকে ও সকলকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাট রক্ত হতে পয়দা করেছেন। তোমার সেই মহিমাময় রব্বের নামে পড়, যিনি মানুষকে কলমের সহায়তায় শিক্ষা দিয়েছেন। এই ভাবে মহান কেতাব কোরআনের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাজেল হলো।

তখন হযরতের বয়স চল্লিশ। তিনি বুঝলেন, তাঁর জীবনের মহান ব্রত সামনে পড়ে আছে। মানুষকে অন্যায় অসত্যের পথ হতে ফিরিয়ে আনার জন্য যে মহান কর্তব্যভার আল্লাহ্ তাঁর উপর ন্যাস্ত করেছেন, তা তিনি উপলব্ধি করলেন। তিনি বুঝলেন, এতকাল পর্যন্ত মানুষের যে দুঃখে, ব্যথায় তার প্রাণ কেঁদেছে সে দুঃখ দূর করার জন্য আল্লাহ্ তাঁকে মনোনীত করেছেন। তিনি আল্লাহর রসূল অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষ, তিনি পয়গম্বর, সংবাদবাহী। তিনি নবী।

হযরত মাঝে মধ্যেই ওহী পেতে লাগলেন। এই ওহী হল তার পথ প্রদর্শক। ওহী সংগ্রহীত গ্রন্থের নামই কোরআন।

কাবার অদূরে ছাফা পর্বত। সে কালে কেউ কোন জরুরী ঘোষণা করতে চাইলে এই পর্বতের উপরে উঠে নিশান উড়িয়ে দিত। তখন মক্কাবাসীরা সেখানে গিয়ে হাজির হতো। হযরত এই পর্বতের উপর উঠে নিশান উড়িয়ে সবইকে ডাকলেন। তারা এসে হাজির হল। তিনি বললেন, আমি যদি বলি এই পর্বতের পেছনে আপনদের একদল দুশমন লুকিয়ে আছে, তবে কি আপনারা তা বিশ্বাস করবেন ? সকলে উত্তর দিল, নিশ্চয়-নিশ্চয় আমরা বিশ্বাস করব। কারণ আমরা কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি। তখন হযরত বললেন, তবে আমার এ কথাও বিশ্বাস করুন যে, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়।

আবু লাহাব নামে একজন কুরাইশ মাতবর বলল, তুমি কি এজন্যে আমাদের ডেকেছো ? অন্যরাও তাকে উপেক্ষার হাসি হেসে চলে গেল। কিন্তু রসুলুল্লাহ তার সংকল্প থেকে টললেন না। তিনি তার বাণী শুনিয়ে গেলেন। এরপর মহিলাদের মধ্যে বিবি খাদিজা, বালকদের মধ্যে হযরত আলী, ক্রীতদাসদের মধ্যে জায়েদ, বয়স্কদের মধ্যে হযরত আবু বকর প্রথম মুসলমানরূপে এক খোদায় বিশ্বাস করে ইমান আনলেন। এইরূপে আরো কয়েকজন ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

এরপর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) খোলাখুলিভাবে ইসলাম প্রচার শুরু করলেন। তিনি বলতেন, ইবাদতের যোগ্য শুধু এক আল্লাহ্, যিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের সকলের মালিক ও সকলের পালন কর্তা। তিনি আরও বলতেন, হে লোক সকল, আপন শরীরকে নাপাকী হতে, কাপড়কে ময়লা হতে, মুখকে গালি-গালাজ হতে এবং দিলকে মন্দ চিন্তা হতে দূরে রাখ। ওয়াদা পূরণ করো। লেন-দেনে কাউকে ধোকা দিওনা। আর মনে রেখ, মানুষের আশা পূর্ণ করবার শক্তি খোদারই হাতে। খোদার হুকুম ছাড়া গাছের একটি পাতাও

নড়েনা। চাঁদ, সুরুয, আসমান, যমীন, মানুষ সবকিছুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা।

কুরাইশরা দেখল হযরতের ধর্মমত টিকে গেলে তাদের প্রচণ্ড আঘাত লাগবে। তারা ক্ষেপে উঠলো এবং জনসাধারণকে ভুল কথা বলে ক্ষেপিয়ে তুললো। শুরু হলো তদের জুলুম।

হযরত এবাদত করতে কাবায় যেতেন। ওরা তার পথে কাঁটা গেড়ে দিতো। তাঁর গায়ে থুতু দিতো। তাঁকে পাগল বলে হাত তালি দিতো এবং এমনও হতো তিনি সেজদায় পড়লে উট, ঘোড়ার ভুড়ি তাঁর মাথায় চাপিয়ে দিতো।

কিন্তু হযরত অটল, অবিচল। তিনি সমস্ত বিপদ বিদ্রুপ উপেক্ষা করে আল্লাহর পথে সবাইকে আহ্বান করে চললেন।

একদিন দুশমনরা হযরতকে তার পথ থেকে ফিরাবার জন্য এক ওঝা পাঠিয়ে দিলো। কিন্তু ওঝা হযরতের মুখে ইসলামের মধুর বাণী শুনে মুসলমান হয়ে ফিরে গেল।

বাইরে থেকে যেসব যাত্রী মক্কায় আসতো হযরত তাদের কাছে গিয়ে ইসলামের বাণী শুনাতেন। তারা মুগ্ধ হয়ে যেত। আর তখন কুরাইশরা তাদের কাছে গিয়ে বলতো, মুহাম্মদ যাদুকর। খবরদার, ওর কথা তোমরা কেউ শুনোনা। এ কথায় বাইরের যাত্রীদের মধ্যে হযরতের কথা শোনার আগ্রহ আরো বেড়ে যেতো। তারপর তারা দেশে ফিরে গিয়ে এই অদ্ভুত লোকটির অদ্ভুত কথা প্রচার করত। আর এতে দূর দূরান্ত হতে কৌতূহলী লোকেরা তাঁর কথা শুনতে আসতে লাগলো।

কুরাইশরা এবার ভাবলো এই বিষবৃক্ষ অংকুরেই বিনাশ করা প্রয়োজন। তাই তারা একযোগে মুসলমানদের উপর সর্ব প্রকার অত্যাচার করা শুরু করলো। তারা দেখলো হযরতের পেছনে আবুতালিব এবং আবু বকরের মতো শক্তিশালী আত্মীয়রা আছে, তাই তারা এদের বাদ দিয়ে অন্যদের উপর অত্যাচার শুরু করল। কাউকে তারা বন্দী করে চাবুক মারতে লাগলো। ক্ষুধায় কাতর হলে তখন তাদের চাবুক মেরে জিজ্ঞাসা করতো, এবার বল্ ইসলাম ধর্মে থাকবি, না মূর্তি পূজায় ফিরে আসবি ?

ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত বিলাল ছিলেন উমাইয়ার গোলাম। বিলাল গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন এটা জানতে পেরে উমাইয়া রোজ দুপুর

বেলায় তাঁকে জ্বলন্ত বালির উপর চিত করে শুইয়ে তার বুকে এক প্রকাণ্ড পাথর চাপিয়ে দিতো, আর বলতো যদি ইসলাম না ছাড়, তবে এই অবস্থাতেই মরতে হবে। বিলাল তখন পাথরের নীচ হতে ক্ষীণকণ্ঠে বলতেন- আহাদ আহাদ, অর্থাৎ আল্লাহ এক। আল্লাহ এক। অবশেষে হযরত আবু বকর তাঁকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন।

এভাবে দুশমনের অত্যাচারে ইসলামের শৈশব কাটতে লাগলো। কিন্তু এ রকম অত্যাচারেও কোন ফল হলো না দেখে শত্রুরা এবার প্রলোভনের ডালি নিয়ে এল। তারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে বললো ঃ মুহাম্মদ, এই যে, তুমি আমাদের দেবদেবীর নিন্দা শুরু করেছে, এতে তোমার কি লাভ ? তুমি যদি ধন সম্পদ চাও, তবে বল। তোমাকে আমাদের সবার চেয়ে ধনী বানিয়ে দিই। মান-সম্ভ্রম চাও? বেষ তোমাকে আমাদের সর্দার বানাবো। রাজত্ব চাও, বেশ তোমাকে আমাদের রাজা বানাব।' কিন্তু কোন প্রলোভনেই হযরত টললেন না।

ফলে কুরাইশরা আরো ক্ষেপে উঠলো। মুসলমানদের উপর আরো অত্যাচার করতে লাগলো। এসব দেখে হযরত খুব ব্যথিত হলেন। এ সময় আবিসিনীয়ার রাজা ছিলেন নাজাশী । তিনি ধর্মে খৃষ্টান ছিলেন। মনটা ছিল খুব উদার। তখন ৬১৫ খৃঃ। হযরতের উপদেশে অত্যাচারিত মজলুম মুসলমানেরা জন্মভুমি ছেড়ে আশ্রয়ের জন্য আবিসিনীয়ায় যাত্রা করলেন। তাদের পলায়নের সংবাদে কুরাইশরা ক্ষেপে উঠলো ও তাঁদের ফেরত পাঠানোর জন্য অনুরোধ করে নাজাশীর নিকট দূত পাঠিয়ে দিলো। কিন্তু নাজাশী আশ্রিতদের ফেরৎ দিলেন না।

কুরাইশরা আর কি করে। অগত্যা তারা গিয়ে আবু তালিবকে ধরল। বললঃ আপনি মুরব্বী মানুষ। আপনাকে আমরা সম্মান করি । আপনার ভাতিজা আমাদের দেব-দেবীর নিন্দা করছে। আমাদের পূর্বপূরুষদের বিরুদ্ধে কথা বলছে। আমরা আর তার এ অন্যায় সহ্য করবো না। আপনি হয় তাকে বারণ করুন, না হয় তার পক্ষ ছেড়ে দিন। তারপর আমারা বাঁচি-মরি লড়াই করে এর মীমাংসা করবো।

আবু তালিব তখন হযরতকে ডাকলেন। সব কথা জানিয়ে বললেন ঃ এ-প্রচারটা না হয় ছেড়েই দাও বাবা। হযরত বললেন ব্যপারটা। তার আপনজন তিনিও আজ তাকে ভুল বুঝলেন। আশ্রয় দিতে চাইছেন না। তখন তিনি শান্ত দৃঢ় স্বরে বললেন, পারব না চাচা। যদি ওরা আমার এক হাতে আসমানের চাঁদ ও অন্য হাতে সূর্য এনে দেয় তাহলেও আমি আমার ব্রত ত্যাগ করতে পারব না।

হয় আল্লাহর বাণী জয়যুক্ত হবে, না হয় আমার জান যাবে।

আবু তালিব তখন তাকে বললেনঃ বাবা, তোমার সংকল্প মতই কাজ করে যাও। আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি তোমাকে ত্যাগ করবো না। আবু তালিবের উৎসাহে হযরতের জ্ঞাতি বনি হাশম ও বনি মুত্তালিবগণ শত্রুদের হামলা হতে হযরতকে রক্ষা করার জন্য মনস্থির করলেন। শুধু আবু লাহাব এদের সাথে মিললেন না।

এ সময় এক শক্তিশালী ব্যক্তি খাত্তাবের পুত্র ওমর বিন খাত্তাব ভাবলেন, 'মক্কার দিকে এই যে দুরন্ত লড়াইয়ের আভাষ দেখা যাচ্ছে, একটা লোককে মেরে ফেললেই তো সব চুকে যায়। একটা লোকের ও কি সে হিম্মত নেই? ঠিক আছে। আমিই এ কাজ করবো। আর আমার দেশকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে রক্ষা করব।

সংকল্প মোতাবেক ওমর একদিন এক নাঙ্গা তলোয়ার হাতে চললেন হযরতকে হত্যা করতে।

হযরত তখন তাঁর সাহাবীদের সহ ছাফা পর্বতের কাছে অবস্থান করছিলেন। পথে নয়ীম নামক এক ব্যক্তির সাথে ওমরের দেখা। ওমর তাকে বললেন, 'নয়ীম এবার সব বিবাদের সমাপ্তি টানতে যাচ্ছি। মুহাম্মদের কল্লা কেটে আনব।'

নয়ীম কিছুটা বিদ্রুপের সুরে বললেন, 'বাবা, মুহাম্মদের কল্লা কাটার আগে নিজ বোন ফাতিমার একটু খোঁজ নাও। বোনটি তো স্বামীসহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে দিব্যি সুখে আছে।

কথাটা ওমরের অহংকারে আঘাত হানলো। তিনি রাগে আগুন হয়ে বোনের বাড়ীর দিকে ছুটলেন। তখন ফাতিমা কোরআন শরীফ পড়ছিলেন। ওমর স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই বেদম মার দিলেন। মারের চোটে উভয়েরই শরীর হতে রক্ত ঝরতে লাগলো। রক্ত দেখে ওমরের চেতনা ফিরে এলো ও তিনি লজ্জিত হলেন। বললেন, একটু পড়তো বোন। কোরআনের খানিকটা শুনেই ওমর মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বললেন, এই তবে তোমাদের কোরআন, এত সুন্দর ভাষা, এমন মহান বাণী।

তখনো ওমরের হাতে খোলা তলোয়ার। সেই অবস্থাতেই ছুটে গেলেন ছাফার দিকে । হযরতের সাহাবীরা তাকে দেখে আঁতকে উঠলেন। কিন্তু হযরত শান্তভাবে এগিয়ে গেলেন তার দিকে। মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কি মনে করে

ওমর ? তোমার কোন কাজে লাগতে পারি কি ? ওমর তখন বিনয়ের সাথে বললেনঃ রসুলুল্লাহ আমায় গ্রহণ করুন। আমি ইসলামে দীক্ষা নিতে এসেছি। রসুলুল্লাহ আনন্দের সাথে বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবর। তার সাথীরাও সমস্বরে বলে উঠলেন - আল্লাহুআকবর। ছাফা পর্বতের চূড়ায় চূড়ায়, গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হল - "আল্লাহু আকবর"

সে ধ্বনি হাজারো বিপদের মধ্যে মুসলমানদের বুকে নতুন আশা-উদ্দীপনা জাগিয়েছে। এমনিভাবে ইসলামের সে প্রাণবাণী তক্‌বীরের জন্ম হলো।

৬১৬ খৃষ্টাব্দের শেষ দিক। কুরাইশ সর্দারেরা পরামর্শসভা ডাকল এবং সবাই এক প্রতিজ্ঞাপত্রে দস্তখত করল যে, যে পর্যন্ত মুহাম্মদকে তাদের হাতে ছেড়ে না দেওয়া হবে, সে পর্যন্ত তাঁর (মুহাম্মদ) আশ্রয় দাতা বনি হাশিম ও বনি মুত্তালিবদের সঙ্গে তাদের সমাজ, জামাত, বিয়ে-শাদী ক্রয় বিক্রয় সমস্ত কিছু বন্ধ থাকবে।

জুলুমের ভয়ে মুসলমানরা তখন আবু তালিবের এক বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিল। সেখানে তারা তিন বৎসর পর্যন্ত কুরাইশদের দ্বারা অবরুদ্ধ রইলেন। খাদ্য-দ্রব্য ফুরিয়ে গেল। তার পর তারা গাছের পাতা ইত্যাদি সিদ্ধ করে খেতে লাগলেন। এরপর গাছের পাতাও নেই। ক্ষুধার্তের চিৎকার, শিশুদের কান্না বন্দীখানার প্রাচীর ভেদ করে বাইরে শোনা যেতে লাগলো। এ দৃশ্যে কোন কোন দুশমন সর্দারের মন নরম হলো। তখন অবরোধ উঠিয়ে নেওয়া হলো।

এক বিপদ গেল। অন্য বিপদ এলো। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নবয়ুতের তখন আট বৎসর। তার সকল দুঃখ ও বিপদের আশ্রয় চাচা আবু তালিব মারা গেলেন। এই দুঃখ না সরতেই হযরতের প্রিয় স্ত্রী বিবি খাদিজাও দুনিয়া হতে বিদায় নিলেন। এরা ছিলেন হযরতের পরম হিতৈষী। কিন্তু এদের হারিয়েও তিনি বিচলিত হলেন না। বন্ধু বিয়োগ ও শত্রু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আল্লাহ্‌র উপর আরো বেশী নির্ভর করতে লাগলেন। আল্লাহর বাণী প্রচার করতে লাগলেন।

এ সময় মদীনার ছয় জন যাত্রী মক্কায় এল। হযরত তাদের ধর্মের বাণী শোনালেন। শুনে তারা এতই মুগ্ধ হলেন যে, তক্ষুণি তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন ও মদিনায় ফিরে গিয়ে রসুলুল্লাহর আর্বিভাবের কথা জানাতে লাগলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে মদিনা থেকে আরো অনেকে এসে ইসলাম ধর্ম কবুল করল

ও হযরতকে মদীনায় যেতে দাওয়াত দিল। এসব সংবাদ কুরাইশদের কানে গেল তারা আরো ক্ষেপে উঠলো হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মনে অহংকার দেখা গেল নিজের জন্য নয়। সমগ্র মুসলমানদের জন্য। কুরাইশরা এবার তাদের নির্বিচারে হত্যা করতে পারে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাই মুসলমানদেরকে মদীনায় চলে যেতে পরামর্শ দিলেন। ফলে, একে একে প্রায় সকল মুসলিম পরিবার মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে গেল। হযরত শুধু আলী ও আবুবকরকে নিয়ে বিপদের মধ্যে রয়ে গেলেন।

মদীনায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে, এ সংবাদে কুরাইশ দলপতিরা আবার পরামর্শ সভা বসালো। তারা বলাবলি করতে লাগলো, মদীনায় যদি মুহাম্মদ প্রবল হয়ে ওঠে তবে সে একদিন আমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে। তখন আমরা তার হাতে মারা পড়বো। এছাড়া মদীনা বড় হয়ে উঠলে মক্কার গুরুত্ব কমে যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র মদীনা হবে। তখন আমাদের না খেয়ে মরতে হবে। কাজেই মুহাম্মদ সম্বন্ধে এখনই একটা ব্যবস্থা নিতে হবে।

একজন বললঃ মুহাম্মদকে নির্বাসনে দাও। দ্বিতীয় জন বললোঃ তাতে কোন লাভ নেই। যেখানেই যাবে, সেখানেই তার কথার যাদুতে লোককে পাগল করবে। তৃতীয় জন বলল, ওকে খুন কর। আপদ চুকে যাক। চতুর্থ জন বললোঃ কথাটি শুনতে ভাল, কিন্তু এই খুন করতে গিয়ে কে ওর গোষ্ঠী বনি হাশিমের দুশমন হবে? তখন আবু জেহেল বললঃ আমি একটি পথ বাতলে দিচ্ছি। আমাদের বারোটি কওম হতে বারোজন সাহসী যোদ্ধা বেছে নিতে হবে। তারা সবাই একসঙ্গে গিয়ে মুহাম্মদকে খুন করুক। তা'হলে বনি হাশেম একা বরোটি কওমের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরতে সাহস পাবে না। এ প্রস্তাবটি সকলের পছন্দ হল।

তারপর বারোটি কওমের বারোজন যুবক নাঙ্গা তলোয়ার হাতে সে রাতেই হযরতের বাড়ীর দিকে ছুটলো। উদ্দেশ্য ভোর তিনি জাগলেই তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু ভোরে তারা দেখতে পেল, হযরত নেই। তার বিছানায় শুয়ে আছেন আলী। তারা রাগে আগুন হয়ে ঘরে ফিরে গেল।

আসলে হয়েছে কি জানো। দুশমনদের ষড়যন্ত্রের কথা হযরতের কানে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি হযরত আলীকে নিজ বিছানায় শুইয়ে রেখে দুশমনদের চোখকে ফাকি দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিলেন, আর আলীকে বলে গেলেন, আমার কাছে কিছু লোকের আমানতী মাল আছে, তা কাল বুঝিয়ে দিয়ে

তুমি চলে এস।

হযরত, আবুবকরকে নিয়ে মদীনার দিকে চললেন। দুশমনরা তাঁর পেছনে ছুটবে এ তিনি জানতেন। তাই খানিক দূরে মক্কার দক্ষিণস্থ এক পর্বত গুহায় প্রবেশ করলেন। এদিকে কুরাইশরা দেশময় ঘোষণা করে দিল, মুহাম্মদ ও আবুবকরকে যারা জ্যান্ত বা মৃত অবস্থায় এনে দেবে, তারা এদের প্রত্যেকের জন্য একশ উট পুরাস্কার পাবে। কাজেই তন্ন তন্ন করে তাদের খোঁজ হতে লাগল। তাঁদের লুকানস্থ গুহার দরজায় দুশমনদের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল। আবুবকর ভয় পেয়ে রসূলুল্লাহকে বললেন, ওরা অনেক, আমরা মাত্র দু'জন। রসূলুল্লাহ দৃঢ় স্বরে বললেন, ভয় নেই, আমাদের সাথে আরো একজন - আল্লাহ্ আছেন। তারপর তারা মক্কা থেকে মদীনায় এসে হাজির হলেন।

এটা ইংরেজী ৬২২ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। হযরতের এই দেশ ত্যাগের নাম হিযরত। এই হিযরত হতেই আরবী হিজরী সাল গণনা করা হয়। হযরত ওমর(রাঃ) খলিফা হয়ে এই হিজরী সাল জারি করেন।

আর মদিনার আসল নাম কিন্তু 'মদিনা' ছিল না। আগে এর নাম ছিল 'ইয়াসরেব'। পরে যখন নবী করীম (সঃ) এই শহরে আসেন, তখন থেকে লোকে একে 'মদীনাতুন নবী' বা নবীর শহর বলতো। তারপর আস্তে আস্তে এটা 'মদিনা' নামেই সুপরিচিত হলো।

হযরত তো মদিনায় এলেন। মদিনাবাসীরা মহানন্দে হযরত ও তার সংগীগণকে অভ্যর্থনা জানালেন। যারা হযরতের সঙ্গে হিযরত করে মদিনায় এলেন, তাঁদের নাম হল মুহাজের। মুহাজের অর্থ দেশ ছাড়া, গৃহ হারা। আর যে মদিনাবাসীরা তাঁদের আশ্রয় দিলেন, তাঁদের নাম হল আনছার। এর অর্থ, সাহায্যকারী। আনছাররা মুহাজিরদের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তা তুলনাহীন। তাঁরা আপন ঘর-দুয়ার, বিছানা-পত্র, থালা-বাসন, ধন-দৌলত, খাবার-দাবার সমস্তেরই ভাগ মুহাজিরদের দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ইহুদী ছাড়া মদিনার বাসীন্দাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

এখানে হযরত একটি মসজিদ তৈরী করলেন- খেজুর গাছের খুটি, খেজুর পাতার ছাউনি। নবীর মসজিদ বলে এর নাম হল মসজিদ এ নবী।

এ মসজিদ মুসলমানদের কেবল ইবাদত বন্দেগীর স্থান ছিল না, এখানে বসে হযরত রাজনীতি, ধর্মনীতি সমাজনীতি শিক্ষানীতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের

আলোচনা ও মীমাংসা করতেন। হযরতের বসবাসের জন্য এই মসজিদের পাশে খেজুর পাতার একটি ঘর বানানো হল।

এরপর হযরত এক সম্মিলিত জাতি গঠনে হাত দিলেন। এতকাল যে সব কওম আত্মকলহে লিপ্ত ছিল, হযরতের উদাত্ত আহবানে তারা সব দুশমনী ভুলে গিয়ে একত্রিত হল। মদীনায় বেশ কিছু সংখ্যক ইহুদী ছিল। তারা কেল্লার মত সুরক্ষিত পল্লীতে বাস করত ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে ভাল অবস্থায় চলত। হযরতকে মদীনায় পেয়ে তারা ভাবল, লোকটাকে খাটিয়ে নিয়ে আমাদের স্বার্থ উদ্ধার করা যাবে। তারা সে জন্যে হযরতের দলে যোগ দিল এবং সকলে মিলে হযরতকে করল এ নবরাষ্ট্রের অধিনায়ক। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ইহুদীরা টের পেল হযরত বিপুল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি। তাকে দিয়ে তাদের স্বার্থ উদ্ধার সম্ভব নয়। এদিকে মক্কাবাসীদের সাথে সেই ইহুদীদের সওদাগরী লেনদেন ছিল। মক্কাবাসীদের ইচ্ছে হযরত যেন মদীনায় শক্তি সঞ্চয় করতে না পারেন। তাই ইহুদীরা মক্কার কুরাইশদের গোপনে খবর দিল তোমরা সসৈন্যে চলে এস। আমরা তোমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মুহাম্মদকে ধবংস করে ফেলব। মদীনায় কতগুলো কপট প্রকৃতির মুসলমান ছিল। তাদের সর্দার ছিল আবদুল্লাহ্ বিন উবাই। ইহুদীদের মত সেও মক্কাবাসীদের যুদ্ধের উৎসাহ দিয়ে খবর পাঠালো।

কুরাইশরা তখন ইসলামের নাম দুনিয়া হতে মুছে ফেলার জন্য আবু জেহেলের সেনাপতিত্বে এক হাজার সৈন্য মদীনা আক্রমণ করতে পাঠিয়ে দিল। হযরত দেখলেন এদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া উপায় নেই। অথচ তার সঙ্গে তখন মাত্র তিনশ তের জন যোদ্ধা। তাই নিয়েই তিনি আল্লাহ্র নামে এগিয়ে গেলেন। এটা ৬২৪ সালের, আরবী দ্বিতীয় হিজরী, রমযান মাসের তিন তারিখের ঘটনা। মদীনা থেকে আশি মাইল দূর 'বদর' নামক এক কূপের নিকট মুসলমানগণ তাবু খাটালেন। হযরত আল্লাহর দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা জানালেন। সাহস ও শক্তি চাইলেন। এরপর শুরু হল ভীষণ লড়াই। কুরাইশরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে তাদের সেনাপতি আবু জেহেলও অন্যান্য বহুজনের লাশ ময়দানে ফেলে পলায়ন করল। মুসলমানদের জয়-জয়কার পড়ে গেল। সংখ্যায় এত অল্প হয়েও প্রবল ও অধিক সংখ্যক শত্রুর উপর জয়লাভে মুসলমানদের বুক আশায়, বিশ্বাসে, সাহসে ভরে উঠল। এই বছরেই হযরত আলীর সাথে ফাতেমার বিয়ে হয়। রোজা ফরজ হয়। ঈদের সদ্গায়ে ফেৎরার প্রচলন করা হয় এবং ঈদগাহে ঈদের নামাজ জামাতে পড়া শুরু হয়।

আর যুদ্ধে যারা বন্দী হল, তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করার জন্য হযরত কঠোর হুকুম জারি করলেন। মুসলমানগণও অনেক সময় নিজে উপবাস থেকে এই যুদ্ধ বন্দীদের খেতে দিতেন। কিছুদিন পর হযরত বিনা শর্তে এই বন্দীদের ছেড়ে দিলেন। বদরের অপমান কুরাইশরা ভুলতে পারল না। তাই পরের বৎসর ইংরেজী ৬২৫ খৃঃ, আরবী তৃতীয় হিজরীতে কুরাইশরা তাদের সর্দার আবু ছুফিয়ানের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্য মদীনা আক্রমণ করতে পাঠালো। এক হাজার মুসলিম যোদ্ধা নিয়ে হযরত বাধা দিতে এগিয়ে গেলেন। ওহোদ নামক পাহাড়ের কাছে উভয় দলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হল। মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণে প্রথমে দুশমন বাহিনী টলে উঠলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুশমনদের জয় হল।

এ যুদ্ধে হযরত হামজা শহীদ হলেন। হযরত আবু বকর, ওমর ও আলী সাংঘাতিক রূপে আহত হন। পাথরের আঘাতে হযরতের একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। শরীর ক্ষত-বিক্ষত হল। তাঁর সহচরেরা তাঁকে ঘিরে রেখে মৃত্যুবরণ করতে লাগলো। তিনি অজ্ঞান অবস্থায় এক গর্তে পড়ে গেলেন। তাঁকে টেনে তোলা হল। তিনি কপালের রক্ত মুছতে মুছতে বললেন, 'আল্লাহ্, এদের সুপথে পরিচালনা কর। এরা কিছুই জানে না।'

ইতিমধ্যে হযরতের স্ত্রী, কন্যা ও অন্যান্য কয়েকজন মুসলিম রমনী লড়াইয়ের ময়দানে আহতদের সেবা ও তাদের পানি খাওয়াতে লাগলেন।

এ যুদ্ধে কুরাইশরাও এত ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল যে, তারা মদীনা আক্রমণ না করে লড়াইয়ের ময়দান থেকেই ফিরে গেল। যাওয়ার সময় আবু ছুফিয়ান হযরতকে শাসিয়ে গেল- তোমাকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য আমি শীগগিরই আবার আসছি।

হযরত শান্ত কণ্ঠে বলে পাঠালেন 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।'

আবু-ছুফিয়ান তার প্রতিজ্ঞা ভুললেন না। তিনি আরবের বিভিন্ন দিকে সৈন্য সংগ্রহের জন্য লোক পাঠালেন। ইহুদীরা আগ্রহের সাথে এ কাজে সাহায্য করতে লাগলো। অল্প দিনের মধ্যেই দশ হাজার যোদ্ধা নিয়ে আবু-ছুফিয়ান মদীনার দিকে যাত্রা করল।

হযরতের সঙ্গে ইহুদীদের সন্ধি ছিল, বিপদের সময় তারা তাঁকে সাহায্য করবে। হযরত তাদের কাছে লোক পাঠালেন। তারা উত্তর দিল, মুহাম্মদ কে?

আল্লাহর রসূলই বা কে, যে আমরা তার হুকুম মানব? তার সাথে আমাদের কোন সন্ধি নেই।

সন্ধি ভঙ্গ করে তারা শত্রুদলে যোগ দিল। এদিকে মদীনায়ও বিশ্বাসঘাতকের অভাব ছিল না।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও হযরত বিচলিত হলেন না। তিনি তিন হাজার যোদ্ধা সহ শহরের বাইরে এসে খন্দক অর্থাৎ পরিখা কাটা শুরু করলেন। অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি নিজে খন্দকের মাটির টুকরি কাঁধে বয়ে দূরে নিয়ে ফেলতে লাগলেন। অবশেষে লড়াই শুরু হল। দুশমনরা ক্রমাগত আক্রমণ করেও পরিখা পার হতে পারছিল না। এমন সময় শুরু হল প্রচন্ড ঝড় আর মুষলধারে বৃষ্টি। শত্রুদের তাবু উড়ে গেল, রসদ ভিজে গেল, উঠ, ঘোড়া, মরতে লাগলো। অবশেষে তারা অবরোধ উঠিয়ে চলে গেল। এটা ইংরেজী ৬২৬ সালের, আরবী ৫ম হিজরীর ঘটনা। এটাই খন্দকের লড়াই নামে পরিচিত।

বিশ্বাসঘাতক ইহুদীরা তখনো মুসলমানদের ধ্বংসের স্বপ্ন দেখছিল। তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য হযরত তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরলেন। খয়বর নামক স্থানে যুদ্ধ হল। তারা পরাজিত হয়ে মদীনা ছেড়ে চলে গেল।

এদিকে নির্বাসিত মুসলমানদের প্রাণ মাতৃভূমির জন্য হাহাকার করছিল। তারা মক্কা দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। আরবের রীতি, দুশমনও যদি তীর্থ যাপনের জন্য নিরস্ত্রভাবে মক্কায় আসতে চায়, তবে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। সেই রীতি অনুযায়ী চৌদ্দ'শ নিরস্ত্র সঙ্গী সহ হজ্ব উপলক্ষে হযরত মক্কা যাত্রা করলেন। কিন্তু কুরাইশরা এগিয়ে এসে বাধা দিল। এই অন্যায় বাধায় হযরতের সঙ্গীরা রুখে উঠলেন। কিন্তু হযরত চিরদিনই শান্তিপ্রিয়। তাই তিনি তাদের বলে কয়ে রাজী করে দুশমনদের সাথে সন্ধি করলেন-হুদায়বিয়ার সন্ধি। এই সন্ধি মোতাবেক মুসলমানেরা সে বারের মত হজ্ব না করে ফিরে এলেন।

হুদায়বিয়া সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ৬২৯ সালে হযরত দুই হাজার সঙ্গিসহ হজ্ব যাপনের জন্য মক্কায় যান। তারা তিন দিন শহরে থেকে তাদের ধর্ম-কর্ম শেষ করে চলে আসেন। তাদের সাথে কথাবার্তা যাতে না হয়, সে জন্য নগরবাসীরা নগর ত্যাগ করে নিকটবর্তী উচ্চস্থানে গিয়ে সেখান থেকে এই দৃশ্য দেখতে লাগলো।

এর কিছু দিন পর মক্কাবাসীরা মুসলমানদের এক মিত্র কওমকে

অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে তাদের কয়েকজনকে হত্যা করল। তারা এসে হযরতের কাছে বিচার জানাল। হযরত এই অন্যায় লুণ্ঠন ও হত্যার ক্ষতিপূরণ দাবী করে দূত পাঠালেন। কুরাইশরা ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করল।

মক্কায় অন্যায়ের রাজত্ব বহুদিন ধরে চলছে। এবার তার চরম হল। হযরত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মক্কা আক্রমণের সংকল্প করলেন। অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে দশ হাজার সংগী সহ হযরত মক্কার পথে যাত্রা করলেন। পথে পথে মুসলমানদের মিত্র গোত্রের লোকগণও যোগ দিতে লাগলে।

এই দৃশ্য দেখে কোরেশদের মুখ শুকিয়ে গেল। তারা আবার সন্ধির জন্য লালায়িত হল। হযরতের নিকট দূত এলো। হযরত সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন। তিনি জানতেন, এবার খোদার নাম সর্বত্র প্রচারিত হবে এবং ইসলামের জয় হবে।

দ্বিতীয় দিন মুসলিম সৈন্য খাস মক্কার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। তাদের পক্ষ হতে যেন প্রথম আক্রমণ না হয় হযরত সে বিষয়ে সৈন্যদের সতর্ক করে দিলেন।

কোরেশদের একদল সৈন্য মুসলমানদের আগমন দেখেই তীর চালানো শুরু করে দিল। এতে দু'জন মুসলমান শহীদ হলেন। তখন মহাবীর খালেদ কোরেশদের আক্রমণ করলেন। ফলে তারা বার/তের টি লাশ ফেলেই পালিয়ে গেল। হযরত বিজয়ী বেশে মক্কা প্রবেশ করলেন।

যে সমস্ত মক্কাবাসী নবুয়তের পর হতে দিনের পর দিন হযরতকে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট, লাঞ্ছনা, যন্ত্রনা দিয়েছে, ইসলামকে দুর্নিয়ার বুক হতে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে, তারা আজ সকলে হযরতের অনুগ্রহ ও দয়ার প্রার্থী হয়ে হযরতের সামনে এসে দাঁড়াল।

হযরত জনতার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আমার দেশবাসীগণ, আজ তোমরা আমার কাছ থেকে কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর। উত্তরে তারা বলল- মহৎ, ভাইয়ের মত, হে মুহাম্মদ।

হযরত মুহাম্মদের দু'চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'তবে তাই হোক। আজ তোমাদের কোন অপরাধ নেই। তোমরা সবাই মুক্ত।'

এর পর শুরু হল এক অপূর্ব দৃশ্য। দলে দলে সবাই এসে মহানবীর

কাছে ইসলাম গ্রহন করতে লাগলো।

এমনিভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ইসলাম চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। অবশেষে মুষ্টিমেয় ইহুদী ও খৃস্টান ছাড়া আরবে আর কেউ অমুসলমান রইল না।

হযরতের সময় যে সমস্ত যুদ্ধ হয়েছে, এবং যাতে হযরত (সঃ) স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেছেন ইসলামের ইতিহাসে তা ধর্মযুদ্ধ নামে পরিচিত। ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য, আল্লাহ্‌র পথে বিভ্রান্ত মানুষকে ফিরাবার জন্যই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর এই সংগ্রাম। অন্যায়, লোভ, অত্যাচার এসবের সাথে তিনি কোন দিন আপোষ করেন নাই।

ধর্মযুদ্ধের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণটা মনে রেখো।

বদরের যুদ্ধ–	২য় হিজরি
উহুদের যুদ্ধ–	৩য় "
খন্দকের যুদ্ধ–	৫ম "
হোলেহ্ হোদাইবিয়া চুক্তি–	৬ষ্ঠ "
খায়বরের যুদ্ধ–	৭ম "
মুতার যুদ্ধ–	৮ম "
হেনায়েন যুদ্ধ–	৮ম "
তাবুকের যুদ্ধ–	৯ম "

মহানবীর জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তিনি বুঝতে পারলেন তার ইহজীবন শেষ হয়ে আসছে। হিজরীর দশম মাসে তিনি শেষ বারের মত হজ্ব সমাপন করলেন। আরাফাতের ময়দানে লক্ষাধিক লোকের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি তার জীবনের শেষ খোতবা অর্থাৎ বক্তৃতাদিলেন।

আরাফাতের ময়দান ঃ লক্ষ লক্ষ হাজীদের সমাবেশ হয় এখানে।

খোতবায় বললেন ঃ-

'বন্ধুগণ', আমি সামনের বার হয় তো তোমাদের মধ্যে থাকব না। তাই আমার শেষ কথা তোমরা শুনে রাখ। মনে রেখো, তোমরা সবাই ভাই ভাই, তোমরা সবাই মিলে এক মস্ত পরিবার। তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করো। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার, তোমাদের উপরে তাদের তেমনি অধিকার। তোমরা যা খাও, তা-ই তোমাদের দাস-দাসীকে দিয়ো। তোমরা যা পর, তাই তাদের পরতে দিও। যদি তারা এমন কোন অপরাধ করে, যা তোমরা মাফ করতে পার না, তবে তাদের ছেড়ে দিও। বংশের অহংকার করোনা। তোমরা সকলেই এক আদমের সন্তান। তোমাদের জন্য দুটি মূল্যবান বস্তু রেখে যাচ্ছি। একটি কোরআন, অন্যটি হাদীছ। যতদিন তোমরা এ দুটির নির্দেশ মেনে চলবে, ততদিন তোমাদের কোন ভয় নাই। তোমাদের মধ্যে একের রক্ত, ধন, মান অন্যের জন্য হারাম।'

অতঃপর হযরত মদীনায় ফিরে এলেন। তার দেহের দুর্বলতা দিন-দিন বাড়তে লাগল। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

জীবনের শেষ অসুখ শুরু হয় সফর মাসের ২৯ তারিখ রোববারে। সেদিন তিনি একজন মৃতের জানাজা পড়ে বাড়ী ফিরছিলেন। এমন সময় পথে

তার মাথা ব্যথা শুরু হয়। পরদিন সোমবার ব্যথা আরও বেড়ে যায়।ব্যথায় তিনি অধীর হয়ে পড়েন।

হযরত আলী ও হযরত আব্বাস হযরতের বাহু ধরলেন এবং হযরত আয়শা (রাঃ) এর ঘরে নিয়ে গেলেন।

হযরতের অসুখ একটু ভালোর দিকে দেখা গেল। হযরত সেদিন বুধবারে মাথায় পানি দিলেন। এতে কিছুটা ভাল বোধ করলেন। এই দিনটিই 'আখেরী চাহার শোম্‌বা' অর্থাৎ শেষের বুধবার নামে পরিচিত। হযরতের ইনতেকালের দুই দিন আগের কথা। হযরতের আদেশেই আবুবকর জোহরের নামাজের ইমামতি করছিলেন। হযরতের মন মসজিদের দিকে ছুটে গেল। হযরত আলী ও হযরত আব্বাসের কাঁধে ভর দিয়ে মহানবী মসজিদে গেলেন। সকলেই অধীর হয়ে হযরতের দিকে ফিরলেন। হযরত আবুবকর হযরতকে ইমামের জায়গা ছেড়ে দিয়ে পিছনের দিকে ফিরছিলেন। হযরত হাত দিয়ে ইশারা করে বারণ করলেন। তারপর মহানবী হযরত আবু বকরের পাশাপাশি বসে নামাজ পড়ালেন। নামাজ ও মসজিদ হযরতের কাছে যে কত প্রিয় ছিল তা অন্তিম কালের এই আচরণ থেকে বুঝা যায়।

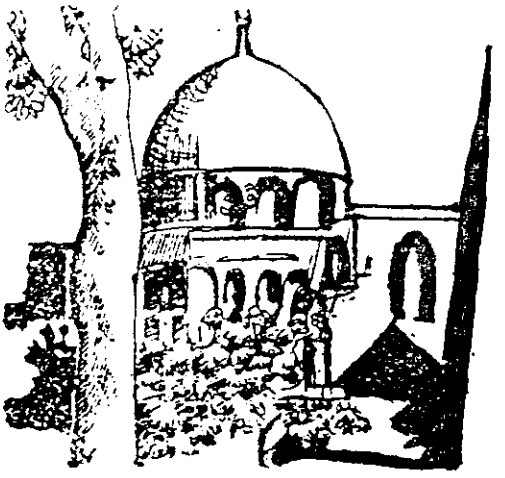

মসজিদে আকসা

নামাজ শেষ করে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে মহানবী বললেনঃ 'বন্ধুগণ, দুনিয়ায় কেহ চিরকাল বেঁচে থাকে না। আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাতেই জীব জন্মগ্রহণ করছে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি তারই কাছে ফিরে যাবো। তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে থাকবে এবং আজীবন আল্লাহ্ পাকের ওপরে ঈমান রাখবে, এই বলে তিনি নীরব হলেন। কেননা বেশী কথা বলবার সামর্থ্য তার ছিল না। মসজিদ থেকে তিনি ঘরে ফিরে এলেন।

হযরত মুহাম্মদের ঘরে মাত্র সাতটি দিনার ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) কে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বললেন, 'দিনারগুলো গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দাও। দুনিয়ার দৌলত ঘরে রেখে রসূল কি করে তার আল্লাহ্-পাকের সাথে দেখা করবে।'

এরপর ৬৩২ খ্রীস্টাব্দের ৮ই জুন, আরবী এগার হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ সোমবার হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জান্নাতবাসী হলেন। আল্লাহ্ তা'লার নিকট তাঁর পাকরুহ্ চলে গেল। যে দিন জন্মগ্রহন করেছিলেন, তেষটি বছর পরে সেই মাসের সেই তারিখের সেই দিনে তিনি ইন্তেকাল করলেন।

(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন) ।

(হযরত মুহাম্মদ স. এর ব্যবহৃত জিনিস)

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর কিছু বাণী

✷ বিদ্যার জন্য যে জীবন উৎসর্গ করে তার মৃত্যু নেই।

✷ ঐশী গুণাবলীতে তোমরা ভূষিত হও।

✷ যে নিজের জন্য বা অপরের জন্য শ্রম করে না সে আল্লাহর পুরস্কার পাবে না।

✷ যে সমর্থ ও কর্মক্ষম হয়েও শ্রমবিমুখ আল্লাহ তার প্রতি সদয় নন।

✷ যারা সৎ উপায়ে জীবিকার্জন করে তারাই আল্লাহর প্রিয়পাত্র।

✷ প্রকৃত বিনয় সকল সদ্‌গুণেরই উৎস।

✷ নম্রতা ও সচ্চরিত্রতা ঈমানের অংগ।

✷ মানুষের মধ্যে তিনিই উত্তম, যার দ্বারা মানব জাতির কল্যাণ সাধিত হয়।

✷ তারাই মুমিন, যারা দায়িত্ব পালন করে। কথার খেলাফ করেনা ও অঙ্গীকার পালন করে।

✷ বিদ্যার্জন প্রতিটি মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র।

✷ যে ব্যক্তি ক্রোধকে দমন করে আল্লাহ্ তার হৃদয়ে নিরাপত্তা ও ভরসা দেন।

✷ আত্মাকে জয় করাই সর্বোৎকৃষ্ট জিহাদ।

✷ অতিরিক্ত পানাহার করে তোমার মৃত্যু ঘটিও না।

✷ দুনিয়ার প্রতি আসক্তি সকল পাপের মূল।

✷ প্রত্যেক ব্যক্তি তার উন্নতিতে ঐশী সাহায্য পায় তার চরিত্র অনুসারে।

✷ নিদ্রা মৃত্যুর সহোদর।

✷ ছোট কি বড় যত দুর্ভাগ্য বা হয়রানি ব। -স আরোপিত হয়, সবই অবশ্য নিজের কর্মদোষে।

✷ যে নিজেকে জানে সে আল্লাহ্‌কেও জানে।

ইহজীবন যেন কর্ষিত জমি মাত্র। পরজীবনে ফসল লাভের জন্য এখানে সুকর্ম কর। তবে সেখানে ফল পাবে। জীবন সংগ্রাম আল্লাহর প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ তা বিধান করেছেন, শুধু কঠোর চেষ্টা দ্বারাই তা লাভ করা যায়।

ধর্মগ্রন্থঃ মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম কোরআন। এটা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর নাযিল হয়েছিল। তবে এ কোরআন একদিনে বা একযোগে নাযিল হয়নি। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ৪০ বৎসর বয়সে একদিন রমযান মাসের শব-ই-কদর রাতে এ কোরআনের একটি সুরা (সুরা আলাক্ব) সর্ব প্রথম নাযিল হয়। এর পর দীর্ঘ ২৩ বৎসর ধরে অল্প অল্প করে জিব্রাইল (আঃ) মারফত রসূল (সঃ) উপর এ কোরআন নাযিল হতে থাকে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সেটা মুখস্ত করে রাখতেন। পরে সাহাবীদের মুখস্ত করাতেন বা গাছের ছালে, পাথরের গায়ে পশুর চামড়ায় বা গাছের পাতায় লিখিয়ে রাখতেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মৃত্যুর পরে হযরত ওসমান (রাঃ) এগুলো একত্রিত করে কোরআন আকারে লিপিবদ্ধ করেন। কোরআনে আছে ৩০ পারা। এতে ১১৪টি সূরা ও ৬৬৬৬টি আয়াত। সেকালে আরববাসীদের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলায় এ কোরআনের আয়াতগুলো নাযিল হতো। তাই কোরআনে রয়েছে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের সকল সমস্যার সমাধান। কোরআনের সর্ব প্রথম যে সুরাটি নাযিল হয়েছিল তা ছিল সুরা আলাকে। সুরা আলাকের প্রথম ৫টি আয়াত এর অর্থ হলো- (১) পাঠ কর- তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

(২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে গাঢ় রক্তপিন্ড থেকে।

(৩) পাঠ কর- তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত।

(৪) যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে।

(৫) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে - যা সে জানত না।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রচারিত ধর্মের নাম ইসলাম। ইসলাম অর্থ কি জান? আত্মসমর্পণ। এটাকে শান্তির ধর্মও বলা হয়। সুরা আল-ইমরানে বলা হয়েছে, "তুমি বল, আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।"

ইসলাম ধর্মের ভিত্তি ঃ

৫টি মূল ভিত্তির উপর ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। (১) কলেমা (২) নামাজ (৩) রোজা (৪)হজ্জ্ব এবং (৫) যাকাত।

(১) কলেমা ঃ কলেমা হলো সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তার প্রেরিত রাসূল। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-হু-মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ"

(২) নামাজ ঃ নামাজ আল্লাহ্‌র নির্দেশ। দিনে সাধারণতঃ পাঁচবার নামাজ পড়তে হয়।

(ক) ফজর ঃ সূর্য উদয়ের কিছুক্ষণ আগে ফজর নামাজ পড়তে হয়।

(খ) যোহর ঃ বেলা বারোটার পরে যোহর নামাজ পড়তে হয়।

আছর ঃ আছর নামাজ বিকেলে পড়তে হয়। অর্থাৎ যোহরের নামাজের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আছরের সময় থাকে।

(ঘ) মাগরীব ঃ সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে পশ্চিম আকাশে লাল আভা থাকা পর্যন্ত মাগরীবের সময় থাকে।

(ঙ) এশা ঃ সূর্য ডোবার এক ঘন্টা পর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত এশার নামাজ পড়া যায়।

(৩) রোজা ঃ রমজান মাসে ছোব্‌হে ছাদেকের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সকল পান আহার ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাকে রোজা বলা হয়। বৎসরে এক মাস রোজা রাখা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। অবশ্য অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য নয়।

(৪) হজ্জ্ব ঃ বছরে একবার পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে মক্কার কা'বা শরীফে ও আরাফাত ময়দানে মুসলমানরা মিলিত হন। কাবা শরীফ জেয়ারত করেন ও পাপের ক্ষমা চান। এটাই হজ্জ্ব। হজ্জ্ব সকলের জন্য ফরজ নয়। শুধু সামর্থ্যবান নারী-পুরুষের জন্য এ হজ্জ্ব ফরজ।

(৫) যাকাত ঃ সামর্থ্যবান ব্যক্তিগণ তাদের সম্পদের উপর কোরআনের নির্ধারিত কিছু পরিমাণ অর্থ গরীবদের মাঝে দান করে থাকেন। এটাই যাকাত।

ইসলামী দর্শন ও ইসলাম ধর্মের মূল উদ্দেশ্যেঃ

ইসলামী শিক্ষা অনুসারে "আল্লাহ্" এই বিশ্বজগত ও সমস্ত জীবের সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ্ মানুষের জন্য এই বিশ্ব জগত সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সেটা প্রতিপালনও করেন। তবে বিশ্ব জগতের সকল প্রাণী, উদ্ভিদ ও অন্যান্য সমস্ত কিছু মানুষের সেবায় নিয়োজিত। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব।

ইসলামী বিধানে কতগুলো বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। যেমন- আল্লাহ্ ,ফেরেশতা, কিতাব, নবী-রাসূল এবং আখিরাত।

এই পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকে। সময় শেষ হয়ে গেলে তা ধ্বংস হয়ে যায়। এই বিশ্ব-জগতও একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকবে তারপর একদিন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এটাই হলো কিয়ামত। কিয়ামতের পর পাপ-পূণ্যের বিচারের জন্য আল্লাহ্ সবাইকে ডাকবেন। এটাই হলো শেষ বিচার, হাশরের দিন। হাশরের দিন সবার সামনে যার যার আমলনামা পেশ করা হবে। পাপ-পূণ্য, ভাল-মন্দ কথা ও কাজের হিসাবকে বলে আমলনামা। আমাদের সকল কথা ও কাজের হিসাব রাখা হয়। হিসাব রাখেন ফেরেশতা কিরামন ও কাতিবীন।

হাশরের দিন আমলনামা সহ প্রত্যেকে একাকী আল্লাহর দরবারে হাজির হবে। পাপ পূণ্যের ওজন করা হবে। যাদের পূণ্য বেশী হবে, তারা যাবে বেহেশতে। আর যাদের পাপ বেশী হবে তারা যাবে দোযখে। বেহেশত হলো সুখ-শান্তি ও আনন্দের চিরস্থায়ী স্থান। আর দোযখ সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের স্থান, আগুনে জ্বলতে হবে সারাজীবন। কাজেই বেঁচে থাকতেই পৃথিবীতে সৎ কাজ করে যেতে হবে, সৎ পথে চলতে হবে। যাতে আখিরাতে অনন্ত সুখ শান্তি ও আরাম পাওয়া যায়। কাজেই এই পৃথিবীতে আমাদের পাপ-পূণ্যের হিসাব করে চলতে

ইসলাম ধর্মের কিছু আদেশ- নির্দেশের কথা।

* এক আল্লাহ্‌র এবাদত করবে।

* পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না এবং পিতা-মাতার মনে কষ্ট দিবে না।

* মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না। আয় অনুযায়ী ব্যয় করবে-ইসলাম ধর্মে বলে। যারা অপব্যয় করে, তারা শয়তানের ভাই।

* ব্যভিচার করো না এবং এতিমের ও নাবালকের সম্পত্তি নষ্ট করো না।

* কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না।

* চুরি করো না, এবং মিথ্যা কথা বলো না।

* নিয়ত অর্থাৎ উদ্দেশ্য মোতাবেক ফল পাবে। যার মন ধনী সে-ই প্রকৃত ধনী।

* দুনিয়ার প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি সদয় হও। মানুষকে প্রতারণা করো না। যা শোন তা যাচাই না করে অন্যের কাছে বল না।

* ছোটদের দয়া ও বড়দের শ্রদ্ধা করো।

* অন্যের প্রতি যেরূপ ব্যবহার আশা কর, অন্যের প্রতি ও তেমন ব্যবহার কর।

ইসলামী পর্বদিন

(১) মহররম ঃ ১০ই মহররম। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নাতি দৌহিত্র হোসেন কারবালা ময়দানে শহীদ হওয়ার স্মরণে।

(২) আখেরী চাহার শোম্বা ঃ সফর মাসের শেষ বুধবার। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে, সাময়িক রোগ মুক্তির দিন।

(৩) ঈদে মিলাদুন্নবী ঃ ১২ই রবিউল আউয়াল। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জন্ম দিন।

(৪) শব-ই মেরাজঃ ২৭শে রজব। উর্দ্ধাকাশে বা মেরাজের গমন দিবস। মেরাজ হযরত রসূলে করীম (দঃ) এর জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা। এটা

রাসূলুল্লাহর নবুয়ত লাভের পঞ্চম সনে সংগঠিত হয়।

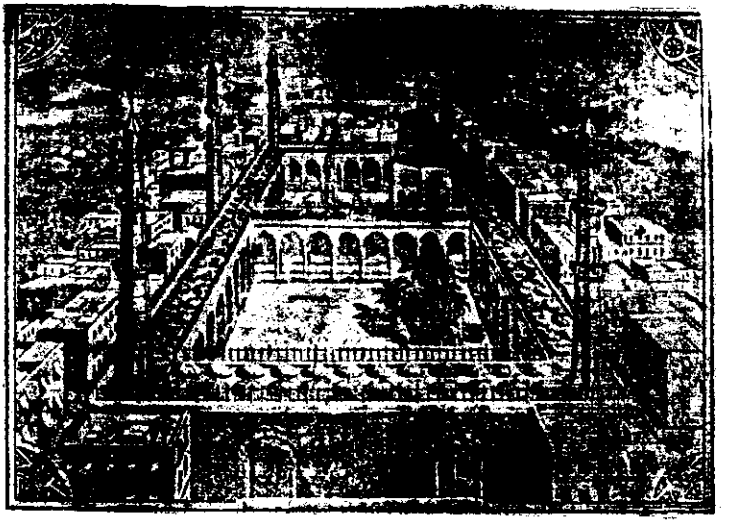

ঘটনাটি এই- রাসূলুল্লাহ (দঃ) এক রাত্রিতে কাবা শরীফের প্রাঙ্গনে শুয়েছিলেন। এই সময় হযরত জিব্রাইল ও মিকাঈল ফেরেশতা আসমান হতে অবতীর্ণ হলেন। তারা 'বোরাক' নামে একটি সওয়ারী এনে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে আসমানে আরোহণ করলেন। তারা তাকে নিয়ে প্রথম পহেলা আসমানে গেলেন। সেখানে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সাথে হযরত আদম (আঃ) এর সাক্ষাৎ হলো। অতঃপর দ্বিতীয় আসমানে হযরত ঈসা ও ইয়াহিয়া (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আঃ), ৪র্থ আসমানে হযরত ইদ্রিস (আঃ), ৫ম আসমানে হযরত হারুন (আঃ), ৬ষ্ঠ আসমানে হযরত মুসা (আঃ) এবং সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। এরপর তিনি বেহেশ্‌ত ও দোজখ পরিদর্শন করেন। রাত্রি শেষ হবার পূর্বেই হযরত মুহাম্মদ এর মেরাজ সফর শেষ হয়। যে রাত্রে এই ঘটনা ঘটে তাকে মেরাজ রাত্রি বলে। রজব মাসে ২৭শে রাত্রিতে এই ঘটনা ঘটেছিল বলে প্রতি বৎসর উক্ত রাত্রিতে মেরাজ রজনী পালন করা হয়। মুসলমানদের নিকট এই রাত্রিটি পবিত্র এবং পুণ্যময় বলে গণ্য হয়ে আসছে।

(৫) শব-ই-বরাতঃ ১৫ই সাবান দ্বিতীয় বার কোরআন নাজিল আরম্ভ।

(৬) শব-ই-কদরঃ ২৭শে রমজান। প্রথম বার কোরআন নাজিল আরম্ভ।

(৭) ঈদুল ফেতরঃ ১লা সাওয়াল। রোজার মাস শেষ হওয়ার পরের দিন।

(৮) ঈদুল আজহাঃ ১৫ই জিলকদ, হজ্জের পরদিন বা কুরবানীর দিন। হযরত ইব্রাহীমের কুরবানী স্মরণ করা।

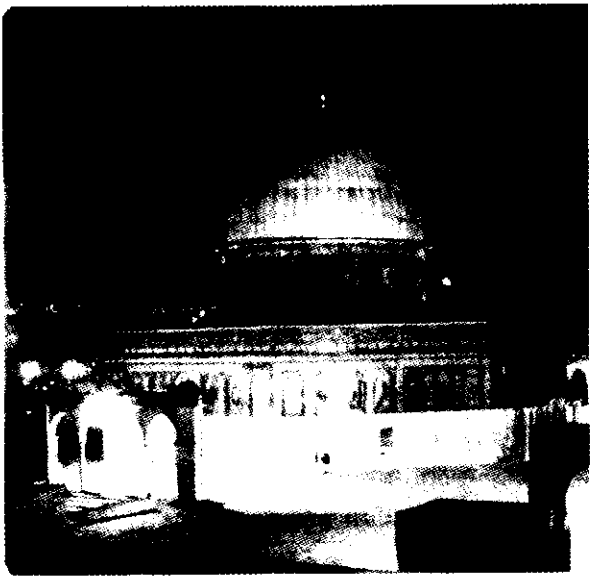

মসজিদে কুব্বাতুস সাখরা ঃ যেখান থেকে মহানবী (সাঃ) মেরাজের রাত্রে দুনিয়া থেকে বোরাক যোগে উর্দ্ধাকাশের ভমন শুরু করেছিলেন।

যীশু খ্রীষ্ট

খ্রীষ্ট ধর্মের প্রবর্তক

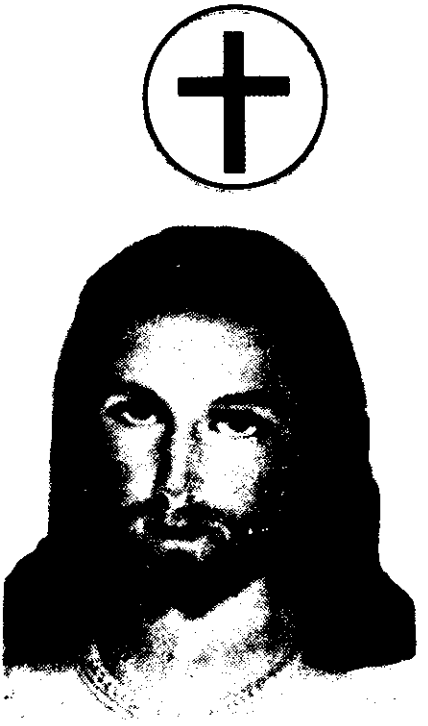

। যীশু শব্দের অর্থ মুক্তিদাতা বা ত্রাণকর্তা। আর খ্রীষ্ট শব্দের অর্থ অভিষিক্ত। অর্থাৎ পরমেশ্বর তাকে শান্তি রাজ হিসাবে অভিষিক্ত বা মনোনীত করেছেন। যীশু খ্রীষ্ট হলেন খ্রীষ্ট ধর্মের প্রবর্তক। খ্রীষ্ট ধর্মের অনুসারীদের বলা হয় খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টান শব্দের অর্থ যীশু খ্রীষ্টের অনুগামী।

পৃথিবীতে যীশু খ্রীষ্টের আগমন রচনা করেছে এক নতুন ইতিহাস। তার শুভ জন্মলগ্ন থেকেই ইতিহাসের বৎসরগুলো নির্ধারিত হয়ে আসছে। তিনি হচ্ছেন যুগের কেন্দ্রবিন্দু।

তার জন্মকালের পূর্ব বৎসরগুলি 'খ্রীষ্টপূর্বাব্দ' এবং পরবর্তী বৎসরগুলি'খ্রীষ্টাব্দ' হিসাবে ধরা হয়।

প্যালেষ্টাইন যখন রাজা হেরোডের শাসনাধীনে ছিল, তখন যীশু জন্মগ্রহণ করেন। যীশুর জন্ম হয় অসাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে।

যীশুর জন্ম সময়ে প্যালেষ্টাইন ছিল রোম সম্রাটের অধীন। প্যালেষ্টাইন দেশটি পশ্চিম মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত। রোম সম্রাটের নাম ছিল সিজার অকটাভিয়ান আগস্টাস। তার প্রতিনিধি হিসেবে হেরোড নামে একজন বিদেশী অ-ইহুদী প্যালেষ্টাইন শাসন করতেন। রোমকরা তাকে বলতো ইহুদীদের রাজা।

প্যালেষ্টাইনের উত্তর অঞ্চলে গালেলিয় প্রদেশের নাজারেথ পল্লীতে রাজা ডেভিডের বংশের একটি ধার্মিক পরিবার বাস করতেন। এই বংশেই মারীয়ার জন্ম। মারীয়ার বাবার নাম জোয়াকিম এবং মায়ের নাম আন্না। ছোট বেলা থেকেই মারীয়া ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক এবং নিষ্ঠাবতী। তিনি নিয়মিত জেরুসালেমের মন্দিরে যেতেন সেবা ও উপাসনা করার জন্যে। মারীয়ার পিতা-মাতা যোসেফ নামে একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান যুবকের সাথে মারীয়ার বিয়ের কথা পাকা করলেন। যোসেফ পেশায় ছিলেন সূত্রধর। ইহুদীদের প্রথা অনুযায়ী এই বাগদান পুরো এক বৎসর কাল স্থায়ী হত এবং প্রতিশ্রুত পাত্র-পাত্রী সম্পুর্ণ আলাদাভাবে নিজ ঘরে থাকত। তাই বিয়ের আগে মারীয়াও পিতার ঘরেই থাকতেন।

একদিন মারীয়া একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে প্রার্থনা করছেন। হঠাৎ কক্ষটি দিব্য জ্যোতিতে ভরে গেল। চমকে উঠলেন মারীয়া। দেখলেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক দেবদূত। নিজের পরিচয় তিনি দিলেন। তিনি হচ্ছেন মহাদূত গাব্রিয়েল। মারীয়াকে সম্বোধন করে তিনি বল্লেন, হে কৃপাপূর্ণা। তোমাকে প্রণাম, প্রভূ তোমার সহায়।

এ কথা শুনে মারীয়া ঘাবড়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন এই অভিবাদনের অর্থ কি? স্বর্গদূত তাকে বললেন, ভয় পেও না মারীয়া। তুমি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছ। পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভধারণ করে তুমি এক পুত্রের জন্ম দেবে। তার নাম রাখবে যীশু। তিনি ঈশ্বরের পুত্র বলে পরিচিত হবেন। অশেষ হবে তার রাজত্ব। এ কথা শুনে অবাক হয়ে মারীয়া বললেন, এটা কেমন করে সম্ভব হবে? আমি তো কুমারী।

দেবদূত মারীয়াকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'ঈশ্বরের প্রভাবে তা সম্ভব হবে। কারণ ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নেই।'

মারীয়া উত্তর দিলেন, 'আমি প্রভুর দাসী। আমাকে যা বলা হয়েছে তাই

হোক।'

ঈশ্বরের প্রভাবে কুমারী মারীয়ার গর্ভে একটি সন্তানের দেহ সঞ্চারিত হয়। এদিকে ভাবী পত্নী অন্তঃসত্ত্বা দেখে যোসেফ মারীয়ার সঙ্গে বাগদান প্রত্যাহার করতে চাইলেন। তখন ঈশ্বরের দূত স্বপ্নে দেখা দিয়ে যোসেফকে বললেন, হে দাউদের বংশধর যোসেফ। মারীয়াকে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করো না। তার গর্ভে যা সঞ্চারিত হয়েছে, তা পবিত্র আত্মার শক্তিতে সম্ভব হয়েছে। তার গর্ভ থেকে যে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন, তার নাম রাখবে যীশু (মুক্তিদাতা)। তিনি মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।

যোসেফ ছিলেন অতি সজ্জন ও ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি কুমারী মারীয়ার রক্ষক ও ঐশ্বপুত্র যীশুর পালক পিতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এই সময়ে রোম সম্রাট অগষ্টাস জানতে চাইলেন, তার বিশাল সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা কত? গণনার সুবিধার জন্যে তিনি এক আদেশ জারি করেন। প্রত্যেক প্রজা নিজ নিজ বংশের কেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত করবে। যোসেক ও মারীয়া উভয়েই ডেভিড রাজার বংশধর। ডেভিডের জন্মভূমি বেথ্‌লেহেম। বেথ-লেহেম নগরটি ছিল প্যালেষ্টাইনের দক্ষিণে রাজধানী জেরুসালেম থেকে ৭ কি. মি. দূরে।

তখন মারীয়ার প্রসবকাল আসন্ন। তবুও সম্রাটের আদেশ পালনের জন্যে তাকে দেশ ছেড়ে দীর্ঘ তিনদিন যোসেফের সঙ্গে হাঁটতে হল।

বেথ্‌লেহেম নগরে এসে থাকবার মত কোনও জায়গা পেলেন না তারা। নাম লেখাবার জন্যে বিভিন্ন জায়গার লোক এসে শহর ভরে ফেলেছে। তাই বাধ্য হয়ে এক নির্জন মাঠে এক পরিত্যাক্ত গোশালায় তারা আশ্রয় নিলেন। এখানে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে প্রচন্ড শীতের রাতে জন্ম নিলেন যীশু খ্রীষ্ট। মা মারীয়া শিশু যীশুর গায়ে কাপড় জড়িয়ে একটি যাবপাত্রে তাকে শুইয়ে দিলেন। যাব পাত্রের মধ্যে ছিল কিছু বিচালী।

সেই অঞ্চলে রাখালেরা রাত জেগে মাঠে ভেড়ার পাল পাহারা দিচ্ছিল। হঠাৎ ঈশ্বরের এক দূত তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। স্বর্গীয় দ্যুতিতে চারদিক আলোকিত হয়ে উঠল। রাখালেরা ভয়ে অভিভূত হয়ে গেল। স্বর্গদূত তখন তাদের বললেন, তোমরা ভয় পেয়ো না। তোমাদের জন্য সমগ্র জাতির মহা আনন্দের শুভ সংবাদ আজ আমি এনেছি। আজ বেথলেহেমে স্বয়ং প্রভু খ্রীষ্ট

জন্মেছেন। তোমরা গেলে দেখতে পাবে এক গোশালায় যাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে। তিনিই সেই ত্রাণকর্তা।

ইতিমধ্যে সেই স্বর্গদূতের পাশে আরও অসংখ্য স্বর্গদূত আর্বীভূত হয়ে ঈশ্বরের বন্দনা করে গেয়ে উঠলেন, 'জয় উর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়, ইহলোকে নামুক শান্তি তার অনুগৃহীত মানবের অন্তরে।

স্বর্গদূতেরা চলে গেলে রাখালেরা চলল যীশুর সন্ধানে। মারীয়া, যোসেফ আর যাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে দেখতে পেল তারা। উপহার সহ যীশুকে জানাল তারা তাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম। তারপর ফিরে গেল ভগবানের মহিমা কীর্তন গাইতে গাইতে।

ইহুদীদের প্রথা অনুসারে আটদিনের শিশু সন্তানের ত্বক ছেদ করা হতো এবং নাম রাখা হতো। এই নিয়ম অনুসারে ত্বক ছেদের সময় মারীয়ার পুত্রের নাম দেওয়া হল যীশু, অর্থাৎ মুক্তিদাতা। অবশ্য এই নামটি দেওয়া জন্য স্বর্গের দূত আগেই মারীয়াকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এরপর চল্লিশ দিনের দিন শিশু সন্তানকে জেরুসালেম মন্দিরে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করা হত। এটাও ইহুদীদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এই সময় সন্তানের মা মন্দিরে উপস্থিত থেকে শুচিতালাভের জন্য আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী একটি মেষশাবক বা দুটি ঘুঘু দান করতেন। দরিদ্র মারিয়া ঘুঘুই দিলেন।

মন্দিরে ছিলেন ধর্মপ্রাণ সিমিয়ন। ঈশ্বরের নিকট তিনি বহুদিন ধরে প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন যে, মৃত্যুর আগে তিনি যেন তার প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতাকে দেখে মরতে পারেন। শিশু যীশুকে দেখে তিনি চিনতে পারলেন যে, এই শিশুই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা। তিনি শিশুকে বুকে চেপে ধরে ঈশ্বরের বন্দনা করতে লাগলেন। তার দু'চোখ বেয়ে নেমে এল ভক্তি আর আনন্দের অশ্রুবন্যা। তারপর ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, মারীয়াকে সন্তানের জন্য কষ্ট ভোগ করতে হবে। যীশুর দুঃখকষ্ট দেখে তার মাতৃ হৃদয় শোকসাগরে ডুবে যাবে।

জেরুসালেম মন্দির থেকে বেথলেহেমে ফিরে যীশু, মারীয়া এবং যোসেফ আরও কিছুদিন সেখানে থাকলেন।

এই সময় একদিন জেরুসালেম রাজধানীতে এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেল। পূর্বদেশ থেকে অর্থাৎ প্রাচ্যের কোন একটি দেশ থেকে তিন জন জ্যোতিষী পন্ডিত এলেন জেরুসালেম। রাজকীয় তাদের চেহারা।

জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করে এবং ইহুদীদের ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে তারা জানতে পেরেছিলেন যে, মুক্তিদাতার জন্মগ্রহণের সময় একটি অদ্ভুত নক্ষত্র আকাশে দেখা দেবে। এ সময়ে একটি নক্ষত্র আকাশে দেখা দেওয়ায় তারা ঐ নক্ষত্রটিকে অনুসরণ করে করে জেরুসালেমে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের দেখার জন্যে বহুলোক সমবেত হলো। জ্যোতিষিরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইহুদীদের রাজা কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন? এ কথা শুনে তো সবাই অবাক! তারা তো জানে রাজা বলতে তো একজনই, হেরোড। তাই তারা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলো । কী উত্তর দেবে ঠিক বুঝতে পারলো না! জেরুসালেমের অধিবাসীরা যখন বলতে পারলো না মুক্তিদাতা কোথায় জন্মেছেন, তখন বিদেশাগত জ্যোতিষীরা রাজপ্রাসাদে গেলেন রাজা হেরোড এর সাথে দেখা করতে। রাজা তো ইহুদী ছিলেন না। তাই শাস্ত্র সম্বন্ধে তেমন কিছুই বলতে পারলেন না। তবে জ্যোতিষীদের কথা শুনে তার মনে হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। ভাবলেন, তিনি ছাড়া কিভাবে ইহুদীদের আর একজন রাজা হতে পারে? নিজেকে কোন রকমে সংযত রেখে তিনি ইহুদী শাস্ত্রজ্ঞদের নতুন রাজার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বাইবেল শাস্ত্র ব্যাখা করে জানালেন, বেথলেহেমে এই মৃক্তিদাতার জন্ম হওয়ার কথা।

এই সংবাদে হেরোড বেশ ভীত হয়ে পড়লেন। তাই জ্যোতীর্বিদদের বেথলেহেমে যেতে বলে অনুরোধ করলেন যে, তারা যদি শিশুটির সন্ধান পান, তবে তাকেও যেন জানান। কেননা তিনিও নবজাতককে শ্রদ্ধা জানাবেন।

আসলে রাজা হেরোডের উদ্দেশ্য কি ছিল জানো? শিশুটির সন্ধান পেলে তাকে হত্যা করবেন। যাতে তার বংশধর ছাড়া আর কেউই রাজা হতে না পারে।

রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে জ্যোতির্বীদরা দেখলেন যে, তারাটি তাদের আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে। তারাটিকে অনুসরণ করে বেথলেহেম নগরে এসে যে ঘরে যীশু ছিলেন সেখানে এসে তারা উপস্থিত হলেন। শিশুটিকে দেখেই তারা বুঝতে পারলেন, এই সেই প্রত্যাশিত মুক্তিদাতা। নতজানু হয়ে তারা তাকে আরাধনা করলেন। উপহার স্বরূপ তাকে দিলেন, স্বর্ণ, ধূপ ও গন্ধনির্যাস। এই তিনটি উপহার সামগ্রী হল এক একটি প্রতীকঃ শোন তাহলে-

স্বর্ণ উপঢৌকন দিয়ে তারা স্বীকার করলেন যে, যীশু রাজা, ধূপ দিয়ে বোঝালেন যে তিনি ঈশ্বর এবং নির্যাস যা মৃত দেহে লেপন করা হয় তা দিয়ে স্বীকার করলেন যে, যীশু ঈশ্বর হওয়া ছাড়াও তিনি প্রকৃত মানুষ।

জ্যোতির্বীদগণ কিছুদিন বেথলেহেমে থাকার পর দেশে ফিরে যাবার আয়োজন করলেন। এমন সময় একটি দৈববাণী তারা শুনলেন, "হেরোড শিশুটিকে হত্যা করার সংকল্প করেছেন। জেরুসালেমে তার কাছে না গিয়ে অন্যপথে স্বদেশে ফিরে যাও।" এই দৈববাণী পেয়ে জ্যোতির্বীদগণ আর হেরোডের কাছে ফিরে গেলেন না, অন্য পথে নিজ দেশে ফিরে গেলেন।

জ্যোতির্বিদগণ চলে যাওয়ার পর যোসেফ রাতের বেলায় একটি দৈববিণী শুনতে পেলেন। দেবদূত তাকে বললেন, "উঠে পড়। শিশু এবং তার মাকে নিয়ে মিশরে পালাও। যতদিন না আমি বলব, ততদিন সেখানেই থাকবে। কারণ শিশুটিকে হত্যা করবার জন্য হেরোড শীঘ্রই চারদিক খুঁজে বেড়াবে।"

স্বপ্নে এ আদেশ শুনে যোসেফ উঠে পড়লেন। তখনও বেশ রাত। যোসেফ শিশু ও তার মাকে নিয়ে মিশর দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

এদিকে হেরোড যখন দেখল জ্যোতীর্বিদরা তাকে ঠকিয়ে গেছে, তখন সে ক্রোধে ফেটে পড়ল। যীশূ কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন তা জানতে না পেরে তিনি আদেশ দিলেন যে, দু'বছর বয়স পর্যন্ত যত শিশু বেথ্লেহেমে আছে তাদের প্রত্যেককে হত্যা করা হোক।

হেরোডের এই নিষ্ঠুর আদেশে সৈন্যগণ বেথলেহেমের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করল এবং যেখানেই ঐ বয়সের শিশু দেখতে পেল তাকেই হত্যা করল। বেথলেহেমের ঘরে ঘরে শোনা গেল গভীর আর্তনাদ আর হাহাকারের শব্দ। রাজা হেরোড ভাবলেন, যীশু যেখানেই জন্মগ্রহণ করে থাকুক এই নারকীয় হত্যালীলায় তার মৃত্যুও অনিবার্য।

এদিকে এই সব শত শত নিষ্পাপ শিশু হত্যার পর রাজা হেরোড কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। দেহে অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা এবং ক্রমে ক্রমে সর্বাঙ্গে ক্ষতদেখা দিল। চিকিৎসকদের আদেশে বায়ু পরিবর্তনের জন্য তাকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু কোন উপকার হলো না। দুর্গন্ধের জন্য সবাই তাকে ত্যাগ করে চলে গেল যন্ত্রণায় অস্থির হেরোড আত্মহত্যারও চেষ্টা করেন। কিন্তু তাও বিফল হয়। এইভাবে দীর্ঘদিন কঠিন যন্ত্রণা ভোগের পর জেরিকো নগরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

এদিকে মিশর দেশে দীর্ঘদিন কেটে গেল। একদিন দেবদূত যোসেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, যোসেফ, শিশু এবং তার মাকে নিয়ে ইস্রায়েল ভূমিতে

ফিরে যাও, কারণ যে শিশুটিকে হত্যা করতে চেয়েছিল সে মারা গেছে।

এ কথা শুনে যোসেফ দেশে ফিরে যাওয়ার আয়োজন করলেন এবং শিশু ও তার মাকে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু ইস্রায়েলে গিয়ে শুনলেন জুডিয়ার রাজা হয়েছে হেরডের এক ছেলে আরখেলাও, তখন যোসেফের জুডিয়ায় যেতে ভয় হল। কেননা আরখেলাও তার পিতার মতই নিষ্ঠুর ছিলেন। সেই রাতে দেবদূত আবার তাকে দেখা দিলেন এবং তাকে গ্যালিলি প্রদেশে যেতে বললেন। এটা শুনে যোসেফ গ্যালিলি অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং নাজারাথে নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে গিয়ে তিনি যীশু ও মারিয়াকে নিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। যীশু ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন।

ক্রমে তার বয়স হলো বার। ইহুদীদের নিস্তার পর্ব আসন্ন। এই পর্বানুষ্ঠানে ইহুদীরা মিশর দেশ থেকে তাদের পিতৃপুরুষদের মুক্তিলাভের কথা স্মরণ করত। সে সময়ে নিয়ম ছিল বারো বছরের উপরের সবাইকে নিস্তার পর্বের সময়ে জেরুসালেমে যেতে হবে। প্রতিবারেই নিস্তার পর্বে যোগ দিতে যোসেফ ও মারিয়া জেরুসালেমে যেতেন। এবার যীশুর ও যাবার সুযোগ হলো। উৎসব শেষে তারা যখন বাড়ী ফিরছিলেন তখন বালক যীশু তাদের অজান্তেই রয়ে গেলেন জেরুসালেমে। তারা মনে করলেন, যীশু অন্য সহযাত্রীদের সাথে রয়েছেন। একদিনের রাস্তা পার হয়ে তারা আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যীশুর পিরে পেলেন মন্দিরে দেখলেন তিনি পন্ডিতদের মাঝে বসে তাদের কথা শুনেছেন ও খোঁজার জন্য আবার জেরুসালেমে ফিরে গেলেন। তিনদিন পর তাকে খোঁজ করলেন কিন্তু তাকে পাওয়া গেলনা। তখন যোসেক ও মরিয়া তাকে প্রশ্ন করছেন। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে সবাই অবাক। উৎকণ্ঠিত মা তাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, খোকা তুমি এখানে, আর আমরা তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। যীশু বললেন কেন আমাকে খুঁজছিলে? তোমরা কি জানতে না যে, আমার পিতার গৃহই আমার বাসস্থান ?

যীশু বাবা-মার সাথে নাজারেথে ফিরে গেলেন। মাতা এবং পালক পিতাকে সকল কাজে সাহায্য করতেন। কখনো তাদের অবাধ্য হতেন না।

যীশু যখন উপার্জনক্ষম যুবক, তখন একদিন যীশুর পালক পিতা যোসেফ মারা যান।

ইহুদী প্রথানুসারে কারো বয়স ত্রিশ না হলে সে অপরকে শিক্ষাদানের

উপযুক্ত বলে গণ্য হত না। সেজন্য যীশুর বয়স ত্রিশ বৎসর হলে তিনি একদিন তাঁর ছোট্ট কারখানার যন্ত্রপাতি, কাজের পোশাক ছেড়ে আলখাল্লা ও চাদর গায়ে দিয়ে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হয়ে পড়েন। এই সময় জেরুসালেম থেকে তীর্থযাত্রীরা স্বদেশে ফিরে এসে এক নতুন সংবাদ প্রচার করল। জর্ডন নদীতীরে একজন সাধু ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে। তিনি যাজক জাকারিয়া ও এলিজাবেথের পুত্র জন (যোহন)। পাপের জন্য অনুশোচনা করার জন্যে তিনি সকলকে জর্ডন নদীর জলে অবগাহন করে দীক্ষিত হওয়ার আহবান করছেন এবং ভাবী মুক্তিদাতার আগমবার্তা ঘোষণা করছেন।

যীশু জর্ডন নদীর তীরে এসে দাঁড়ালেন। অনতিদূরে দীক্ষাগুরু যোহন। যোহন তখন সমবেত জনতাকে দেখিয়ে বললেন, ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষশাবক। যিনি মানুষের পাপ হরণ করতে এসেছেন, ইনিই সেই ব্যক্তি। তাঁর পরিচয়দেবার জন্য আমি এসেছি। আমি শুধু জলে তোমাদের দীক্ষিত করছি। আর তিনি তোমাদের পবিত্র আত্মা দ্বারা দীক্ষিত করবেন।

স্বয়ং মুক্তিদাতা দীক্ষা গ্রহণ করতে এসেছেন দেখে যোহন নিজেকে অযোগ্য মনে করে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তারপর যীশুর কথামত তাকে দীক্ষিত করলেন।

'দীক্ষাগুরু যোহন ও জনতার সামনে যীশুর অলৌকিক পরিচয় দিলেন। তাকে তিনি 'বিশ্ব পাপহর' বলে ঘোষনা করলেন।

দীক্ষা গ্রহণের পর যীশু নির্জন মরুভূমিতে যান এবং দীর্ঘ চল্লিশ দিন উপবাসী থেকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। চল্লিশ দিন অনাহারে থাকার পর যীশু ক্ষুধার্ত হলেন। এই সুযোগে মানুষের চিরশত্রু শয়তান তার কাছে এসে তাকে প্রলোভিত করতে লাগল। শয়তান যীশুকে বলল, 'নিশ্চয় তোমার ক্ষুধা পেয়েছে। তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই পাথরগুলিকে রুটিতে পরিণত হতে বল।' এই কথার উত্তরে যীশু বললেন, মানুষ শুধু রুটিতে বাঁচে না। ঈশ্বরের বাণীই তার খাদ্য। তখন শয়তান যীশুকে জেরুসালেমের মন্দিরের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে বলল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহলে লাফিয়ে মাটিতে নাম দেখি। কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে তিনি স্বর্গদূতের হাতে তোমার ভার তুলে দিয়েছেন। তারা তোমাকে হাতে করে তুলে ধরবে, যাতে তুমি কোন পাথরের ওপর গিয়ে না পড়।

যীশু শয়তানকে বললেন, 'শাস্ত্রে আরও লেখা আছে, তুমি কখনও ঈশ্বরকে পরীক্ষা করতে যেও না।'

আবার শয়তান তাঁকে পর্বত চূড়ায় নিয়ে গিয়ে পৃথিবীর প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য দেখিয়ে বলল, এ সবই তোমার হবে, যদি তুমি প্রণত হয়ে আমায় পূজা কর।

তখন শয়তানকে ভৎসনা করে যীশু বললেন, 'কেবলমাত্র ঈশ্বরকেই সেবা ও আরাধনা করতে হবে।'

বাধ্য হয়ে শয়তান যীশুকে পরিত্যাগ করে চলে গেল। এবার স্বর্গদূতেরা এসে যীশুর ভজনাও সেবা করতে লাগলেন।

মরুভূমি ছেড়ে যীশু গ্যালিলি প্রদেশ অভিমুখে রওনা হলেন। পথিমধ্যে তিনি আর একবার জর্ডন নদীর তীর বরাবর চলতে লাগলেন। তাকে দেখে দীক্ষাগুরু জন উল্লাসিত হয়ে জনতাকে বলতে লাগলেন, 'ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষশাবক। তিনিই মানুষের পাপ হরণ করেন।'

দীক্ষাগুরু জন এর শিষ্যগণের মধ্যে শিষ্য আন্দ্রু ও জন দীক্ষা গুরুর মুখে যীশুর প্রশংসার পরিচয় পেয়ে গুরুকে পরিত্যাগ করে নীরব যীশুর অনুসরণ করলেন। যীশু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কী চাও? তারা বললো, গুরু আপনি কোথায় থাকেন?

যীশু উত্তর দিলেন, এস দেখবে। এরপর শিষ্যদের নিয়ে যীশু যুদেয়া প্রদেশে চলে গেলেন। সেখানে ঈশ্বরের মঙ্গল সমাচার প্রচার করে বলতে লাগলেন, সময় উপস্থিত, ঐশরাজ্য আসন্ন। তোমরা অনুতাপ কর এবং মঙ্গল সমাচারে বিশ্বস কর।

একদিন কেনা নগরে এক বিয়ে বাড়ীতে মা ও শিষ্যদের সাথে যীশু নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। উৎসবের দ্রাক্ষারস হঠাৎ ফুরিয়ে যাওয়ায় মায়ের অনুরোধে যীশু পরিচালকদের বললেন, ঐ জালাগুলি জলে পুর্ণ কর। তারা বড় বড় ছটি জালায় জল ভর্তি করল। তখন যীশু তাদের বললেন, এবার খানিকটা জল তুলে নিয়ে বাড়ীর কর্তাকে দেখাও। বাড়ীর কর্তা তা আস্বাদন করে অবাক হয়ে গেল। বিয়ে বাড়ীর সবাই বলাবলি করতে লাগল, এতো উত্তম দ্রাক্ষারস এখন পর্যন্ত রেখে দিয়েছেন? এটাই হল যীশুর প্রথম আশ্চর্য কাজ।

বিবাহের অনুষ্ঠানাদির পর যীশু মায়ের সঙ্গে গেলেন নাজারেথ নগরে।

সেখানে তিনি বসবাস না করে গেলেন নিকটবর্তী কাপের্ণায়ুম নগরে। দ্রুত তাঁর দিব্য কার্যাবলীর সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

নিকোদেম নামে একজন ফরাসি ধর্মনেতা এক রাতে যীশুর কাছে এসে বললঃ- "আপনার অলৌকিক কাজ দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে, আপনি পরমেশ্বরেরই লো।" যীশু তাকে বললেনঃ "নতুন করে জন্ম না নিলে কেউই ঐশ রাজ্যে প্রবেশ করতে পারেনা।" নিকোদেম অবাক হয়ে বললেন, "যার বয়স হয়েছে সে কি করে নব জন্ম লাভ করবে? সে কি আবারো মাতৃগর্ভে ফিরে যাবে?" যীশু উত্তরে বললেনঃ জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউই ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে পারেনা।" অর্থাৎ মানব জীবনের দুটি দিক। একটি মানবীয় অপরটি ঐশ্বরিক। জন্মসূত্রে আমরা পাই মানবীয় জীবন, কিন্তু ঐশ্বরিক জীবন পাই দীক্ষাস্নানে।

যীশু শুধু উপদেশই দেননি। যাতে মানুষের উপকার হয়, সে রকম অনেক কাজ তিনি করেছেন। একবার এক কুষ্ঠরোগী এসে বললো, প্রভু, আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে সুস্থ করতে পারেন। যীশু হাত বাড়িয়ে তাঁকে স্পর্শ করে বললেন, "আমি তাই চাই, তুমি এখুনি রোগমুক্ত হয়ে ওঠ।

লোকটি তৎক্ষনাৎ রোগমুক্ত হল। একদিন যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা নৌকাযোগে গেনেজারেথ হ্রদ পার হচ্ছিলেন। পরিস্কার আকাশটা হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড ঝড়। ভীত শিষ্যেরা তাই দেখে যীশুকে ডেকে বললেন, 'প্রভু রক্ষা করুন। নতুবা আমরা ডুবে মরব।' তাদের ঈশ্বর বিশ্বাস দুর্বল বলে যীশু তাদের মৃদু তিরস্কার করলেন। তারপর তিনি ঝড়-বাতাসকে শান্ত হতে আদেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হ্রদের জল শান্ত নিস্তব্দ হয়ে গেল।

একবার 'নাইম' নগরে প্রবেশ করে যীশু দেখতে পেলেন, একটি মৃত ছেলেকে সমাধি স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছেলেটির বিধবা মা একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোকে কাঁদতে কাঁদতে পেছনে পেছনে চলছে দেখে যীশুর খুব মায়া হল। তিনি মৃত ছেলেটির কাছে গিয়ে বললেন, 'বাছা, আমি বলছি, এখনি উঠে পড়।' ছেলেটিও তখনই জীবিত হয়ে উঠে বসল এবং কথা বলতে লাগল।

এই ভাবে যীশু যেখানেই যেতেন সেখানেই অনায়াসে অলৌকিক কাজ করতেন। জেরিকো নগরে যীশুর আগমনের সংবাদ শুনে দু'জন অন্ধ রোগী আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলো- হে দায়ূদ বংশধর যীশু, আমাদের উপর দয়া

করুন। যীশু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা আমার কাছে কি চাও।'

লোক দুটি উত্তর দিল, 'আমরা অন্ধ, আমাদের দৃষ্টিশক্তি দান করুন। যীশু তাদের চোখ স্পর্শ করলেন। অমনি তারা দৃষ্টিশক্তি লাভ করল।

একবার কার্পেণায়ুম নগরে এক বিধর্মী সেনাপতি যীশুকে বললেন যে, তার চাকর পক্ষাঘাতে পঙ্গু। যীশু বললেন, 'চলুন, আপনার বাড়ি গিয়ে তাকে রোগমুক্ত করবো। সেনাপতি তখন সবিনয়ে তাঁকে বললেন, সে কি প্রভু! আপনি আমার বাড়িতে শুভাগমন করবেন, এমন যোগ্যতা তো আমার নেই। আপনি শুধু আদেশ করুন, তা'হলেই সে সুস্থ হয়ে উঠবে। "বিধর্মী হয়েও সেনাপতির এই দৃঢ় বিশ্বাস দেখে যীশু অত্যন্ত খুশী হলেন এবং তাকে বললেন, যান আপনার এই বিশ্বাসের জন্য আপনার প্রার্থনা পূর্ণ হল।

দেখতে দেখতে যীশুর এ-সব অলৌকিক কাজের সংবাদ দ্রুত সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোকজন তার কাছে আসতে লাগলো রোগমুক্ত হওয়ার জন্য ও উপদেশ শোনার জন্য।

লোকের ভিড় দেখে যীশু একটি পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন, আর সেখানে বসেই সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, "অন্তরে যারা দীন তারা ধন্য - স্বর্গরাজ্য তাদেরই। যারা শোকার্ত, তারাই পাবে সান্তনা। বিনীত যারা, তারাই ধন্য, কারণ তারা পৃথিবী অধিকার করবে। যারা মনে প্রাণে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহী তারা ধন্য, তাদের আশা পূর্ণ হবে। যারা দয়ালু, তারা ধন্য। তারা দয়া পাবে। শান্তি প্রবর্তকরা ধন্য, তারা ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে। ধর্মের জন্য যারা নির্যাতিত, ধন্য তারা-স্বর্গরাজ্য তাদেরই। আর ধন্য তোমরা, আমার জন্য লোকে যখন তোমাদের অপমান ও নির্যাতন করে, তোমাদের নামে অপবাদ রটায়, তখন আনন্দ করো, উল্লাস করো, কারণ তোমাদের জন্য সঞ্চিত হয়ে আছে এক মহা পুরস্কার।"

কৃষক শ্রোতাদের যীশু বলতেন, স্বর্গরাজ্যকে এমন একটা লোকের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যে লোকটি তার ক্ষেতে ভাল গমের বীজ বুনেছিল। বপন কার্য শেষ হয়ে গেলে তার মজুররা ঘুমিয়ে পড়ার পর শত্রু এসে ক্ষেতে গমের ভাল বীজের মধ্যে শ্যামা ঘাসের বীজ বপন করে চলে গেল। কৃষকটি এখন কি করবে? দুই প্রকার বীজকেই অংকুরিত হতে দেবে। গম ও শ্যামা ঘাসের ফল পেকে গেলে মজুরদের বলবে, "শ্যামা ঘাস আটি করে বেধেঁ পুড়িয়ে ফেলো।

অন্যদিকে গম গোলাতে মজুত করে রাখো।' এ - রকম উদাহরণ দিয়ে যীশু বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, পৃথিবীতে ভাল মন্দ সব রকমের মানুষ আছে। জগতের শেষে ঈশ্বর যখন সকল মানুষের পাপ-পূর্ণের বিচার করবেন, তখন সৎ মানুষদের দেওয়া হবে পুরস্কার এবং অসৎ মানুষদের দেওয়া হবে শাস্তি।

ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলতেন, 'স্বর্গরাজ্য এমন একজন সওদাগরে মত, যে শ্রেষ্ঠ মুক্তো খুঁজছিল। একটি মুল্যবান মুক্তোর খোঁজ পাবার পর সে তার সর্বস্ব বিক্রি করে মুক্তোটি কিনলো। এর তাৎপর্য হল- স্বর্গরাজ্য লাভের জন্য যাবতীয় লৌকিক বিষয় পরিত্যাগ করা শ্রেয়।

দীন-দুঃখীদের আশ্বস্থ করে তিনি বলতেন, 'স্বর্গরাজ্যে তোমাদের পুরস্কার অধিক।' আর সবাইকে তিনি বলতেন, "জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়োনা, কারণ তোমাদের এমন একজন পিতা আছেন, তিনি জানেন তোমাদের কী প্রয়োজন। তিনি তোমাদের স্নেহ করেন। তোমরা সর্ব প্রথম স্বর্গরাজ্যের অনুসন্ধান কর। সৎ ও নিষ্ঠাবান হয়ে জীবন পথে চল। তাহলে সব পাবে।"

যীশু তাঁর শিষ্যদের বলতেন, 'প্রার্থনার সময় তোমরা অযথা বেশী কথা বলোনা। কারণ তোমরা চাওয়ার আগেই ইশ্বর জানেন, তোমাদের কি প্রয়োজন। অতএব তোমরা এই ভাবে প্রার্থনা করোঃ হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পূজিত হোক, তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠা হোক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক। আমাদের দৈনিক অন্ন আজ আমাদিগকে দাও। তুমি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো। আমাদিগকে প্রলোভনে পড়তে দিওনা এবং অনর্থ হতে রক্ষা করো।

ধনীদের উদ্দেশ্যে যীশু একটি উপমা বলতেন, 'একজন ধনীর জমিতে প্রচুর ফসল হওয়ায় সে তার পুরানো গোলা ভেঙ্গে বড় করে নতুন গোলা তৈরী শুরু করলো। আর মনে মনে চিন্তা করলো যে অনেক বছর চলার মত সম্পদ তো জমা হচ্ছে। তখন পরমেশ্বর বললেন, "ওরে মূর্খ! আজ রাতেই যদি তোর প্রাণটা ফেরত নেওয়া হয়, তাহলে তোর সম্পদ কার হাতে গিয়ে পড়বে? 'তারপর যীশু বললেন, "যে লোক নিজের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করে, অথচ পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে নিঃস্ব থেকে যায়, তার অমন দশাই ঘটে।"

যীশু যখন দেখলেন তাঁর প্রচার শোনার জন্য শ্রোতার সংখ্যা দিনের পর

দিন বেড়ে চলছে, তখন তিনি একটি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তিনি শিষ্যদের তাঁর কাছে আহবান করে তাঁদের শিক্ষিত করে তুললেন এবং রোগীদের সুস্থ্য করা ও সকল রকম আশ্চর্য কাজ করার ক্ষমতাও তাদের দিলেন। তারপর বলে-ন, "ঐশরাজ্যের বাণী প্রচার করতে যাও। সকলকে শুভ বাণী শোনাও।"

এ কাজ বেশ ফলপ্রদ হল। শিষ্যরা কাজ শেষ করে কার্পেনায়ুম শহরে যীশুর কাছে ফিরে এসে তাদের সাফল্যের কথা যীশুকে জানিয়ে বলতেন, আপনার নাম উচ্চারণ করলে শয়তান পর্যন্ত আমাদের আদেশ পালন করে দূরে চলে যায়।

একদিন জনৈক অনুগামী এসে একটি দুঃসংবাদ জানালেন, 'হেরোডরাজা নিষ্ঠুর ভাবে ধার্মিক দীক্ষাগুরু জনকে হত্যা করেছেন।' এই সংবাদ শুনে সকলেই মর্মাহত হলেন।

তখন এপ্রিল মাস। যীশু হয়তো ভেবেছিলেন এর দুই বৎসর পর তাঁকেও নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হবে। তাই শোকার্ত হৃদয়ে শিষ্যদের উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'চল নির্জন স্থানে গিয়ে একটু বিশ্রাম করি।' জনতাকে পরিত্যাগ করে তাঁরা নির্জন স্থানে যাবার উদ্দেশ্যে পিটারের নৌকা করে বেথ্‌সেইডা অভিমুখে চলতে লাগলেন। কিন্তু জনতা তাদের অনুসরণ করতে লাগল। যীশু গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেখলেন, এক বিরাট জনতা তার সামনে।

অগত্যা যীশু নৌকা থেকে নেমে সেই জনতাকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাঁর শিক্ষা ছিল ঈশ্বরকে ভক্তি করা, সৎভাবে চলা, নিঃস্বার্থভাবে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে ভালবাসা, ত্যাগ স্বীকার, বিলাসিতা বর্জন, অপরাধিকে ক্ষমা করা প্রভৃতি সৎকাজের দ্বারা ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি আবার ও বুঝালেন, ঐশরাজ্য তোমাদের মধ্যেই বিরাজিত। এই রাজ্যটি ভাবীকালের নয় বর্তমানের। এই রাজ্যের বৈশিষ্ট ও বিধান হলো- সততা, প্রেম-ভালবাসা, কোমলতা ও দয়া। তিনি আরো বললেন, তোমাদের সংঙ্গে যারা খারাপ ব্যবহার করে তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়োনা, বরং তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, যারা তোমাদের অত্যাচার করে, তাদের জন্য প্রার্থনা কর যারা তোমাদের অভিশাপ দেয়, তাদের আর্শীবাদ কর। অপরের কাছে তোমরা যে আচরণ কামনা কর, তেমনি তাদের প্রতিও সেরূপ আচরণ করবে। প্রতিদানের আশা না করে নিঃস্বার্থ ভাবে দান কর। কী খাব, কী পরিধান করবো তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না। কারণ খাদ্যের চেয়ে প্রাণ এবং বস্ত্রের চেয়ে শরীর অধিক মূল্যবান। ঈশ্বরে নির্ভরতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যীশু বললেন, আকাশের পাখিদের দিকে তাকাও। তারা

বোনেওনা। কাটেওনা। সঞ্চয় ও করে না। তবু ঈশ্বর তাদের খেতে দেন। মাঠের ফুলগুলি দেখ। তারা শ্রম করেনা। সুক্ষ্ম বস্ত্র ও পরিধান করেনা, অথচ তারা কি অপরূপ সাজে সজ্জিত থাকে। তেমনি তোমরা যদি ঈশ্বর নির্ভর কর, তা'হলে সবকিছু তিনিই তোমাদের দেবেন।'

শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যীশুর ভাষণ শুনতো। আগে এ-রকম অপূর্ব শিক্ষা তারা কখন ও পায়নি।

উপদেশ শেষ করে যীশু বললেন, তোমরা প্রথমে ঐশরাজ্যের বিষয়ে ও ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কার্যরত হও। তা'হলে তোমাদের যা প্রয়োজন তা লাভ করবে। বিরাট জনতা যীশুর উপদেশ শুনছিল। গোধূলি বেলা। শ্রোতারা অনেকক্ষণ ধরে কিছু খায়নি। যীশু শিষ্যদের বললেন 'আজ তোমরাই বরং ওদের খেতে দাও।' শিষ্যরা জবাব দিলেন, আমাদের এখানে মাত্র পাঁচখানা রুটি এবং দুটি মাছ আছে। তা দিয়ে কি করে হবে। যীশু সেগুলো নিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং লোকদের মধ্যে বিতরণ করতে আদেশ দিলেন। সবাই পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়ার পরেও যা থাকলো তাতে বারটা ঝুড়ি ভরে গেল। স্ত্রীলোক এবং ছোট ছেলের মেয়ে ছাড়াও প্রায় পাঁচ হাজার লোক তাতে পেট ভরে খেয়েছিল।

নির্জন পাহাড়ে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করার পর যীশু কার্পেনায়ুমের দিকে যান। শিষ্যরা তাঁর অনেক আগে নৌকাযোগে রওনা হয়েছে। এদিকে বহু লোক যীশুকে নিকটবর্তী সব জায়গায় খুঁজলো। অবশেষে তাদের মধ্যে অনেকে কার্পেনায়ুমে চলে গেল। সেখানে তারা যীশুকে পেল সমাজ গৃহের প্রাঙ্গণে। কেমন করে যীশু সেখানে তাদের আগে পৌঁছে গেছেন, তা নিয়ে তারা বেশ অবাক হল। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করল প্রভু, কখন এসেছেন এখানে? যীশু একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, 'বুঝেছি, এর আগে তোমরা পেটভরে রুটি খেয়েছ বলে এখন আমার অনুসন্ধান করছ। কিন্তু যে খাদ্য সামগ্রী নষ্ট হয় না, যা চিরজীবনের জন্য স্থায়ী, তার জন্য ব্যস্ত হও। সেই খাদ্য-সামগ্রী যীশু তোমাদের দেবেন।

শ্রোতারা পরস্পরের দিকে চেয়ে এর রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টা করল। যীশু তখন বললেন, আমার পিতা যে রুটি স্বর্গ থেকে তোমাদের দেবেন তা প্রকৃত খাদ্য। এই রুটি জগতকে জীবনদান করে।

জনতা আশান্বিত হয়ে বলে উঠলো, 'তা'হলে সেই রুটি সর্বদা আমাদের দিন।

এই সময় যীশুর চেহারা জ্যোতীর্ময় রূপ ধারনা করল। তিনি বললেন, 'আমিই স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ সেই জীবনদায়ী রুটি। মানুষ যেন অনন্ত জীবন লাভ করে, সেজন্য আমি আমার এই দেহ দান করব। আমার দেহই প্রকৃত খাদ্য আমার রক্তই প্রকৃত পানীয়।

এই কথা শুনে জনতা বিচলিত ও অস্থির হয়ে উঠল। কেউ হাসল। কেউ বা প্রতিবাদ করল। আবার কেউ কেউ মাথা নেড়ে চলে গেল। যীশুর বারো জন শিষ্য তখনও নির্বাক হয়ে তাঁর চারদিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদের মনেও সন্দেহ দেখে যীশু জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরাও কি চলে যেতে চাও?

পিটার এগিয়ে এলেন, প্রভু। আপনাকে পরিত্যাগ করে আমরা কার কাছে যাবো? আমরা বিশ্বাস করেছি এবং জানতে পেরেছি, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি।

পিটারের বিশ্বাস উক্তিতে যীশু খুশী হলেন। অন্যান্য শিষ্যও পিটারকে সমর্থন করলেন, মাত্র একজন ছাড়া। তিনি হলেন জুড়াস্ ইস্কারিয়ৎ। যীশু তখন শিষ্যদের বললেন, "আমি কি তোমাদের বারোজনকে বেছে নিইনি। অথচ তোমাদের মধ্যে একজন আছে, শয়তানের অনুসরণ করে। যীশুর মন ভারাক্রান্ত হলা। ভাবলেন, জুডাস্ তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

ইতিমধ্যে ফরিশির দল খাদ্যরূপে যীশুর দেহ রক্তের কথা শুনে জেরুসালেমে ফিরে গিয়ে তাদের নেতাদের সব কথা জানিয়ে দিল। তারা আরও জানাল যে, যীশুর রুটি বৃদ্ধির আশ্চর্য কাজ দেখে জনসাধারণ তাঁকে অনুসরণ করে। যীশু পিতৃ পুরুষদের রীতিনীতি ও বিধান মানেন না। বিশ্রাম বারেও তিনি লোকদের সুস্থ করেন। এমন কি নিজেকে ঈশ্বরের সমকক্ষ বলে পরিচয় দিয়ে তিনি ঈশ্বরকেও অপমান করেন।

এসব শুনে ইহুদী প্রধানগণ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যীশুকে তার কার্যকলাপের জন্য সতর্ক করে দিতে হবে। প্রধানগণ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যীশুকে তার কার্যকলাপের জন্য সতর্ক করে দিতে হবে। আর তিনি যদি তাদের বিধান আবারও লংঘন করেন তবে তাকে শাস্তি এমন কি মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হবে। ইহুদীদের মতে যারা পুরোহিতদের নির্দেশ অমান্য করত, মন্দিরের অবমাননা করত, ঈশর নিন্দা অথবা ঐশগুণ নিজেদের উপর আরোপ করত তাদের শাস্তি হত মৃত্যুদন্ড।

এরপর থেকে যীশু যেখানে যান না কেন সেখনেই ফরিশিদের অর্থাৎ ইহুদীদের নেতাদের সংগে তর্কের সংঘাত হতে লাগল। যীশু পাপীদের সঙ্গে মেলামেশা করেন বলে ফরিশিদের মধ্যে বিক্ষোভ লক্ষ্য করে তিনি বললেন, "মনে কর, কারও একশ'টি মেষের মধ্যে যদি একটি হারিয়ে যায় তা'হলে সে-কি নিরানব্বইটাকে প্রান্তরে ফেলে একটাকে খুঁজে বেড়ায় না? আর হারানো মেষটি খুঁজে পেলে সে-কি আনন্দে বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীকে বলে বেড়ায় না? তেমনি যাদের মন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই, এমন নিরানব্বই জন ধার্মিকের চেয়ে যখন একজন পাপী মন পরিবর্তন করে তখনই স্বর্গে বেশী আনন্দ হয়।

নিস্তার পর্বের বেশ কয়েকদিন পর যীশু জেরুসালেমে গেলেন। জেরুসালেমের মধ্যে বেথেস্‌দা নামে একটি পুকুর ছিল। পুকুরঘাটে একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী শুয়েছিল। আটত্রিশ বৎসর ধরে সে রোগে ভুগছিল। সেদিন ছিল শনিবার। বিশ্রামের দিন। যীশু তাকে রোগমুক্ত করলেন এবং রোগীকে তার বিছানা নিয়ে চলে যেতে বললেন। লোকটি তাই করল। এটা ইহুদী নেতারা জানতে পারলেন। তাই রেগে গিয়ে তারা যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন বিশ্রামবারে তিনি এই কাজ করেছেন। যীশু উত্তরে বললেন, আমার পিতা সব সময় কাজ করছেন। আমিও করছি। মানুষের জন্যই বিশ্রামবার সৃষ্টি হয়েছে, বিশ্রাবারের জন্য মানুষ সৃষ্ট হয়নি। মানব পুত্র (যীশু) বিশ্রামবারের কর্তা।

যীশুর এই কথা শুনে ইহুদী নেতারা আরও উত্তেজিত হলেন। কারণ তিনি শুধু যে বিশ্রামবারের নিয়ম মানেন না তা নয়। পরন্তু ঈশ্বরের সমকক্ষ বলে মনে করেন। তাই ইহুদী নেতারা যীশুকে হত্যা করার সংকল্প করলেন।

যীশু বুঝতে পারলেন যে, পৃথিবীতে তার কাজ শেষ হয়ে গেছে। শিষ্যরা নীরব নিস্তব্দ। যীশুর দুঃখে দুঃখিত। যীশু হঠাৎ শিষ্যদের প্রশ্ন করলেন, বল তো আমার বিষয়ে লোকে কী বলে?

শিষ্যরা বললেন, কেউ কেউ বলে আপনি দীক্ষাগুরু জন। কেউ বলে আপনি প্রবক্তা এলিয়। আবার কেউ বলে আপনি ভাববাদী জেরেমিয় বা নবীদের মধ্যে একজন।

যীশু তাদের দিকে চেয়ে দৃঢ়ভাবে বললেন- কিন্তু তোমরা কি বল? আমি কে? সেই মুহূর্তে কেউ কোন উত্তর দিল না। কেউ বা চিন্তা করতে লাগল। পিটার তখন দ্বিধা না করে দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন- আপনি মুক্তিদাতা খ্রীষ্ট। জীবন্ত

ঈশ্বরের পুত্র।

যীশু তার ক্ষমতাশালী হাত পিটারের দিকে প্রসারিত করে বললেন, জন এর পুত্র সাইমন, তুমি ধন্য, কারণ কোন দেহরক্ত বিশিষ্ট মানুষ এই তথ্য তোমাকে জানায়নি। এটা প্রকাশ করেছে আমার স্বর্গবাসী পিতা। আর আমি তোমাকে বলছি, তুমি প্রস্তররূপী পিটার। এই প্রস্তরে আমি আমার মন্ডলী প্রতিষ্ঠা করব।

এই উক্তির মাধ্যমে যীশু শিষ্যদের উপর এবং তার প্রতিষ্ঠিত মন্ডলীর উপর প্রধান দায়-দায়িত্ব পিটারকে দান করলেন। পিটারকে খৃষ্টমন্ডলীর উপর যে প্রাধান্য দান করা হয়েছে, যুগের পর যুগ ধারাবাহিকভাবে সেই প্রাধান্য ভোগ করে আসছেন তার উত্তরসুরি খ্রীষ্টমন্ডলীর মুখ্য ধর্মাধ্যক্ষ, অর্থাৎ পোপ। মহামান্য সার্বভৌম ধর্মগুরু হিসেবে মহামান্য পোপ খ্রীষ্টের নামে খ্রীষ্টমন্ডলী পরিচালনা করেন।

যাক, আমরা আবার যীশুর কথায় আসি। যীশু 'পাস্কা' পর্বোপলক্ষে জেরুসালেম অভিমুখে শেষ যাত্রা করলেন, এবং বারজন শিষ্যের সঙ্গে যীশু জেরুসালেমে তার বন্ধুর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন।

তখন সন্ধ্যা। ইহুদী প্রথানুসারে একটি মেষশাবক, তিক্ত শাক, খামির শূন্য রুটি ও দ্রাক্ষারস প্রভৃতি আহার্য দ্রব্যের আয়োজন করা হলো। যীশু দ্রাক্ষারসের একটি পাত্র হাতে নিয়ে তা থেকে কিছু পানীয় পান করলেন। তারপর তা শিষ্যের হাতে দিলেন। এভাবে প্রত্যেকেই কিছু পান করে অপরাপর শিষ্যদের পাত্রটি দিতে লাগলেন।

এরপর যীশু শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়ে বললেন আমি কি করলাম বুঝতে পারলে? তোমরা আমাকে প্রভু বল। অথচ প্রভু হয়েও আমি যখন তোমাদের পা ধুয়ে দিয়েছি তখন তোমাদেরও উচিত পরস্পরের পা ধুয়ে দেওয়া। অর্থাৎ বিনীতভাবে মানুষের সেবা করা।

যীশুর সেই ভোজন সভায় শিষ্য জুডাস ও উপস্থিত ছিলো। সে আগেই জেনেছিল যে, ইহুদী নেতারা যীশুকে ধরবার জন্য সুযোগ খুঁজছে। কিন্তু জনতার ভয়ে তাঁর গায়ে হাত তুলতে সাহস করছে না। অর্থলোভী জুডাস ইহুদী যাজকদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, যীশুকে তাদের কাছে ধরিয়ে দিলে তারা তাকে কত টাকা দেবে। এই কাজের জন্য নেতারা ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রা প্রতিজ্ঞা করল। এই

হীন চুক্তির পর জুডাস সেই ভোজে উপস্থিত হয়। সে ভেবেছিল যে যীশু এসব ব্যাপার কিছুই জানেন না।

আহারের সময় যীশু শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে একজন আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে। শিষ্যরা অবাক! জানতে চাইল কে সেই ব্যক্তি। যীশু বললেন, যে আমার সঙ্গে খাবার পাত্রে হাত দেবে, সেই সে ব্যক্তি। আর সেই সময় জুড়াসই প্রভুর সাথে এক সঙ্গে থালায় হাত দিচ্ছিল। তাই আকস্মিকভাবে ধরা পড়ে জুডাস সেখানে থেকে সরে পড়লো। যীশু তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যা করতে চাও তাড়াতাড়ি সেরে নাও।

এই সান্ধ্য ভোজে যীশু তাঁর সেই রহস্যময় প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন। যীশু রুটি নিয়ে সেটাকে আশীর্বাদ ও উৎসর্গ করে শিষ্যদের বললেন, এইটি আমার শরীর। পরে পাত্রে দ্রাক্ষারস নিয়ে বললেন, এইটি আমার রক্ত, তোমরা তা গ্রহণ কর। তার দৈব উক্তিতে সেই রুটি ও দ্রাক্ষারস যথাক্রমে তার শরীর ও রক্তে পরিণত হয়ে গেল। এইরূপ পরিবর্তনের পর রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকার, রং ও স্বাদ পূর্বের মত থাকলেও তাতে রুটি বা দ্রাক্ষারসের সত্তা আর রইলো না, তা যীশুর দেহ ও রক্তে পরিণত হল। এই সত্যকে শিষ্যেরা বিশ্বাস করে শ্রদ্ধার সঙ্গে তা গ্রহণ করলেন।

যীশু যে অলৌকিক পরিবর্তন সাধন করলেন তা অনুরূপভাবে সাধন করতে তিনি শিষ্যদের আদেশ ও ক্ষমতা দিলেন। নিজ শিষ্যদের মধ্য দিয়ে এই ক্ষমতা খ্রীষ্টমন্ডলীর পরবর্তী যাজকগণের মধ্যেও যাতে সঞ্চারিত হয় তা ব্যবস্থাও তিনি করলেন। আর এইভাবেই প্রতিষ্ঠিত হলো 'খ্রীষ্টপ্রসাদ'। খ্রীষ্টযোগের সময় যাজক যখন নৈবেদ্যের রুটি ও দ্রাক্ষারস উৎসর্গ করে যীশুর সেই উক্তি করেন- 'এটি আমার শরীর এটি আমার রক্ত', তখন রুটি ও দ্রাক্ষারস যীশুর শরীর ও রক্তে পরিণত হয় ও বলিরূপে উৎসর্গ করা হয়।

এই বিস্ময়কর ধর্ম সংস্কার দ্বারা যীশু তার প্রতিশ্রুতি অনুসারে যুগের পর যুগ মানুষকে তার দেহ খাদ্যরূপে দান করে আসছেন। রুটির আকারে যীশুকে গ্রহণ করে মানুষ যীশুর সঙ্গে মিলিত হয়।

ভোজন শেষে যীশু শিষ্যদের নিয়ে জৈতুন পর্বতে গেলেন। যেতে যেতে শিষ্যদের বললেন, আমি দ্রাক্ষারস আর তোমরা শাখা প্রশাখা। যদি কেউ আমার মধ্যে থাকে, আর আমি তার মধ্যে থাকি, তবে তার জীবনবৃক্ষ ফুলে ফুলে

শোভিত হয়ে উঠবে। যদি তোমরা আমাকে ভালবাস তাহলে আমার আদেশ পালন কর। আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালবেসো। যেন তোমাদের ভালবাসার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, তোমরা আমার শিষ্য।

জৈতুন পর্বতের পাশেই গেথ্‌সেমানী বাগান। যীশু যখন বাগানে পৌঁছলেন তখন রাত্রি এগারো- বারোটা হবে। যীশু তখন শিষ্যদের বললেন, দুঃখে আমার প্রাণ যায় যায়। তোমরা এখানে জেগে থাক এবং প্রার্থনা কর। কারণ আত্মা উৎসুক কিন্তু দেহ দুর্বল।' একটু দূরে গিয়ে যীশু নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন। বললেন, 'পিতা এই দুঃখ ভরা পাত্র আমার কাছ থেকে দূর হোক। তবে আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছানুসারেই হোক।' এ সময় তার দেহ থেকে রক্তময় ঘাম ঝরছিল। স্বর্গদূতেরা এসে তার সেবা করল।

যীশু আবার শিষ্যদের কাছে ফিরে এলেন। দেখলেন যে, তারা সকলে ঘুমিয়ে আছে। তাদের ডেকে তিনি বললেন, তোমরা উঠ, চল দেখ শত্রুদল তো আসছে।

জুডাস তখন শত্রুদল নিয়ে আসছে। যীশুকে চিনিয়ে দেবার জন্য সে শত্রুদের আগেই বলে রেখেছিল, 'যাকে আমি চুম্বন করবো, তাকেই তোমরা ধরবে। তাই জুডাস যীশুর কাছে এসে যেমনি তাকে চুম্বন করতে যাবে অমনি যীশু বললেন, 'বন্ধু একটি চুম্বন দিয়ে তুমি আমাকে ধরিয়ে দেবে?'

এবার প্রহরীরা যীশুকে চিনতে পেরে তাকে ধরবার জন্য এগিয়ে এল।

যীশু জিজ্ঞাসা করলেন

- কাকে খুঁজছ?

- নাজারেথের যীশুকে। তারা উত্তর দিল।

- আমি - ই সেই।

যীশু এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রহরীরা যেন একটা প্রচন্ড ধাক্কা খেল। তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। যীশু তাদের বললেন, যদি আমার খোঁজ কর, তবে আমার অনুগামীদের ছেড়ে দাও।

এই বলে তিনি স্বেচ্ছায় বন্দী হলেন। শত্রুরা যীশুকে শক্ত করে বেঁধে জেরুসালেমের ভেতর দিয়ে নিয়ে গেল। যীশুকে প্রথম আনা হলো ইহুদী নেতা

সন্ন্যাস এর কাছে। আন্না ছিলেন 'কাইফা' নামক ইহুদীদের প্রধান যাজকের শ্বশুর। এই কাইফাই ইহুদীদের পরামর্শ দিয়েছিল যে, জাতির জন্য যদি একজন মারা যায়, সেটাই ভাল।

তিনি যীশুকে জেরা করতে লাগলেন- জানতে চাইলেন কী কী নতুন ধর্মমত তিনি প্রচার করে বেড়ান।

যীশু বললেন, আমি তো জনসাধারণের কাছে খোলাখুলি কথা বলেছি। সমাজ গৃহে ও উপাসনা মন্দিরে সবার সামনেই শিক্ষা দিয়েছি। গোপনে তো কিছু করিনি। তাই আমাকে জিজ্ঞাসা না করে যারা আমার কথা শুনেছে তাদের জিজ্ঞাসা করুন আমি কি বলেছি।

একজন কর্মচারী এগিয়ে এসে যীশুকে চড় মেরে বলল, মহাযাজককে এইভাবে উত্তর দিচ্ছ?

যীশু বললেন, আমি যদি কোন অন্যায় বলে থাকি, তাহলে আমাকে দেখিয়ে দাও। কিন্তু যদি ঠিক কথা বলে থাকি, তাহলে আমাকে মারছ কেন?

হান্নাস্ একটি সংকেত করলেন। প্রহরীরা যীশুকে বন্দী অবস্থায় তখনকার মহাযাজক কাইফাসের ভবনে নিয়ে গেল। মহাযাজক কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি, পুরোহিত, শাস্ত্রজ্ঞ প্রভৃতির সামনে যীশুকে অনেক জেরা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে যীশুর গ্রেফতার বিষয়ে মহাসভার সদস্যগণকে সংবাদ দেয়া হল। তারা যেন সিনহেড্রিন্ নামে জরুরী অধিবেশনে উপস্থিত হন। সিনহেড্রিন্ কাকে বলে জান? ইহুদীদের সর্বোচ্চ বিচারালয়। তখন গভীর রাত। ইহুদী নেতারা আসতে না আসতেই যীশুকে মন্দির প্রহরী ও কাইফাসের প্রাসাদে রক্ষীদের হাতে ছেড়ে দেয়া হল। তারা যীশুকে প্রহার, অপমান ও উপহাস করতে লাগল।

ইতিমধ্যে পিটার যীশুকে অনুসরণ করে প্রাসাদের ভিতর ঢুকে পড়লেন এবং আগুন পোহাতে লাগলেন। সেখানকার দ্বাররক্ষী ও প্রহরীরা অনুমান করে পিটারকে বললেন যে, তিনি নিশ্চয়ই যীশুর দলের লোক? পিটার পর পর তিনবার এ কথা অস্বীকার করে বললেন তিনি যীশুকে চেনেনই না। তৃতীয়বার যীশুকে অস্বীকার করার পর মোরগ ডেকে উঠল। তখন পিটারের মনে পড়ল যীশুর পূর্বের সেই বাণী-মোরগ ডাকবার আগেই তুমি আমাকে অস্বীকার করবে। যীশুর এই কথায় পিটার তখন শপথ করে বলেছিলেন যে, তাকে মরতে হলে ও এমন জঘন্য কাজ কখনও করবেন না। কিন্তু আজ তাকে তাই করতে হয়েছে! লজ্জায়

অনুশোচনায় পিটার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং সেখান থেকে চলে গেলেন।

ইহুদী মহাসভার অধিবেশন বসল। সভাপতিত্ব করলেন মহাযাজক কাইফা। ইহুদী প্রথানুযায়ী ন্যায়বিচার নির্ভর করত অভিযোগকারী সাক্ষীদের উপর।

যীশু সকলের সামনে আসামীর মত দুই হাত বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। পরপর যে সকল অভিযোগ করা হলো তার একটিও যথার্থ বলে গৃহীত হল না। শেষে দু'জন সাক্ষী এসে বলল, লোকটি বলেছে, মন্দিরটি ধ্বংস হলে আমি তিনদিনে পুনরায় গড়ে তুলতে পারব। (যীশু তাঁর দেহ মন্দিরের উদ্দেশ্যে এ বাণী করেছিলেন। তাঁকে নিঃশেষ করলে তিনি তিনদিনের দিনে পুনরুত্থান দ্বারা তাঁর দেহটিকে নতুন করে গড়ে তুলবেন।) অভিযোগ যদিও সত্য, সাক্ষীদের কথায় অমিল দেখা দিল। ফলে তাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হল।

মহাযাজক যীশুকে মৃত্যু দন্ড দানের জন্য কোন গুরুতর অপরাধ খুঁজে না পেয়ে নিজেই যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, জীবন্ত ঈশ্বরের দিব্য করে আমাদের বল, তুমি কি সেই খ্রীষ্ট, (মুক্তিদাতা) ঈশ্বর পুত্র?

ইহুদীদের মুক্তির ইতিহাস ও আশা প্রত্যাশা সম্পূর্ণই প্রতিশ্রুত মুক্তিদারা বা খ্রীষ্ট- এর উপর নির্ভর করত।

যীশু স্থির কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি তাই-ই। তোমরা আবার আমাকে দেখতে পাবে ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট, দেখতে পাবে স্বর্গ থেকে মেঘ বাহনে আসতে।

যীশুর স্বীকারোক্তিতে মহাযাজক চিৎকার করে সদস্যদের বলে উঠলেন, এই লোকটা ঈশ্বরকে অপমান করছে। আমাদের আর সাক্ষের কী দরকার? এরূপ ঈশ্বর অবমাননার জন্য আপনাদের মতে ওকে কি শাস্তি দেওয়া উচিত?

সদস্যরা বলে উঠলো- ও মৃত্যুদন্ডের যোগ্য। যদিও ইহুদী সভা রায় দিয়েছিল যে, যীশু মৃত্যুদন্ডের যোগ্য, তবু মৃত্যুদন্ড দেবার অধিকার তাদের ছিল না। তারা ছিল রোমকদের অধিন জাতি। একমাত্র রোমক প্রতিনিধিরাই ছিল মৃত্যুদন্ড বিধানের অধিকারী। তখন রোমক প্রতিনিধি ছিলেন প্রন্টিয়াস পাইলেট বা পন্তিয় পিলাত।

পরদিন শুক্রবার যীশুকে আনা হল পিলাতের কাছে। পিলাত ইহুদী নেতাদের জিজ্ঞাসা করলেন, এর বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী?

চতুর ইহুদী নেতারা ধর্মীয় বিষয় উত্থাপন না করে ব্যাপারটা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝাবার জন্য বললো-

লোকটা আন্দোলনকারী। সে লোকদের কাছে বলে বেড়ায় সে ইহুদীদের রাজা। পিলাত যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন

- তুমি কি ইহুদীদের রাজা?

যীশু বললেন- 'হ্যাঁ, আমি রাজা। তবে আমার রাজা এই জগতের নয়। যদি এই জগতের হত, তবে ইহুদী নেতাদের হাতে আমি যাতে বন্দী না হই, সেজন্য আমার লোকেরা আমার সমর্থনে লড়াই করত। আমি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য এই জগতে এসেছি। যে কেউ সত্যের পক্ষে, সে আমার কথা শোনে।

পিলাত যীশুর কথার অর্থ বুঝতে পারলেন না। শুধু বুঝতে পারলেন যীশু নির্দোষ, নিরীহ। তাকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় কোন সমস্যা নেই। তাই তিনি অকারণে যীশুকে মৃত্যুদন্ড দিতে চাইলেন না এবং এ ব্যাপারে জড়িত হতে চাইলেন না। তিনি যীশুকে তারই প্রদেশের অর্থাৎ গ্যালিলি প্রদেশের শাসক রাজা হেরোড অষ্টপাই এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। যীশুকে তার কাছে আনা হচ্ছে শুনে হেরোড খুশী হলেন। কেননা তিনি যীশুর বিষয়ে অনেক শুনেছেন। কিন্তু এতদিন তাকে সামনে পাননি। তিনি যীশুর অলৌকিক কোন কাজ দেখতে চাইলেন। কিন্তু হেরোডের যুক্তিহীন প্রশ্নে যীশু নীরব রইলেন। যীশুর নীরবতায় রুষ্ট হয়ে হেরোড তাকে উপহাস করলেন এবং যীশুকে হাস্যকর রাজা বোঝাবার জন্য রংচঙ্গা পোশাক পরিয়ে পিলাতের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

যীশুকে নিয়ে পিলাত এবার সমস্যায় পড়লেন। তখন নিয়ম ছিল নিস্তার পর্বোপলক্ষে একজন কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া। সেই সময় কারাগারে বারাব্বাস নামে একজন দুর্ধষ ডাকাত ও খুনী ছিল। পিলাত ভাবলেন। লোকেরা নিশ্চয়ই বরব্বাসের চেয়ে যীশুর মুক্তিই চাইবে। তাই তিনি জনতাকে বললেন, তোমাদের কাছে আমি কাকে ছেড়ে দেব। বারাব্বাসকে, না যীশুকে।

জনতা চিৎকার করে উঠলো- যীশুকে নয়, বারাব্বাসকে ছেড়ে দিন।

পিলাত এবার বললেন, আমি ওর মধ্যে এমন কোন দোষ খুঁজে পেলাম না, যাতে ওর মৃত্যুদন্ড হতে পারে। রাজা হেরোড ও কোন দোষ পাননি। তাই আমি তাকে কষাঘাত করে ছেড়ে দেবো।

কষাঘাত করার আদেশ দিয়ে তিনি যীশুকে সৈন্যদের হাতে ছেড়ে দিলেন। সৈন্যেরা যীশুর গায়ের কাপড় খুলে নিয়ে তাঁকে একটি থামে বেঁধে, সুতীক্ষ্ণ কাঁটার চাবুক দিয়ে প্রহার করতে লাগল। যীশুর পিঠের চামড়া কেটে ক্ষতের সৃষ্টি হল। এত রক্তক্ষরণ হল যে, সেখানকার মাটি লাল হয়ে গেল।

চাবুক চালিযে ক্লান্ত সৈন্যরা যীশুকে একটা পাথরের ওপর বসিয়ে তাকে লাল চাদর পরিয়ে দিল। একটি কাঁটার মুকুট তৈরী করে সজোরে তা পরিয়ে দিল যীশুর মাথায়। কাঁটার আঘাতে মাথার চারদিক অগণিত ক্ষতের সৃষ্টি হল। প্রচুর রক্তক্ষরণ হলো। সৈন্যরা যীশুর হাতে একটি নল দিল, আর বিদ্রুপ করে নতজানু হয়ে বলতে লাগলঃ রাজকীয় পোশাক, মাথায় মুকুট, হাতে দন্ড ইনিই আমাদের রাজা। নমস্কার, হে ইহুদীরাজ। অনেকে তার গায়ে থুথু ফেলল এবং মুখে আঘাত করল।

পিলাত আবার যীশুকে জনতার সামনে এনে বলল, দেখ, এই সেই লোকটি। কি করুণ অবস্থা।

কিন্তু যীশুকে এরূপ শোচনীয় অবস্থায় দেখেও ইহুদীদের মনে এতটুকু মায়া হল না। তারা চিৎকার করে উঠলো, ওকে ক্রুশে দিন। ওকে ক্রুশে দিন।

পিলাত তাদের বললেন, আমি এর কোন অপরাধই পাচ্ছি না।

উত্তেজিত জনতা চিৎকার করে বললো- ওকে ক্রুশে দিন। ওকে মেরে ফেলতে হবে। কারণ ও নিজেকে ঈশ্বরপুত্র বলে মনে করে। আমাদের শাস্ত্র অনুসারে মৃত্যুই তার একমাত্র শাস্তি।

জনতা আবার বললো, আপনি যদি ওকে মুক্তি দেন, তা'হলে আপনি রোমক সম্রাটের বন্ধু নন। কারণ এই লোকটি নিজেকে রাজা বলে প্রচার করছে। যে নিজেকে রাজা বলে প্রচার করে সে সম্রাটের পরম শত্রু।

পাছে তার বিরুদ্ধে সম্রাটের কাছে এই অভিযোগ করা হয় সেই ভয়ে পিলাত যীশুকে নির্দোষ জেনেও ক্রুশে তার মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিলেন এবং এ দন্ড বিধানের জন্য তিনি যে দায়ী নন, তা বুঝাবার জন্য পিলাত জলে হাত ধুলেন। ইহুদীদের মধ্যে প্রথা প্রচলিত ছিল যে, নিজেকে নির্দোষরূপে প্রকাশ করতে হলে হাত ধুয়ে ফেলতে হত।

আর যীশুর যে শিষ্য জুডাস তাঁকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল, তার কি হয়েছিল জান? যীশুর মৃত্যুদন্ডের আদেশ হওয়ায় সে বিবেকের তাড়নায়

মন্দিরে ছুটে গেল এবং গভীর দুঃখ ও হতাশায় চিৎকার করে ইহুদী নেতা ও প্রধান যাজকদের বলল, আমি ন্যায়বানের বিরুদ্ধে প্রতারণা করেছি। একজন নিষ্পাপ লোককে ধরিয়ে দিয়ে আমি তার রক্তপাতের দোষে দোষী।

তারা বলল, তাতে আমাদের কী? তুমি বোঝগে।

জুডাস তখন মন্দিরের মধ্যে মুদ্রাগুলি ফেলে দিয়ে চলে গেল।

টাকাটা নিয়ে প্রধান যাজক বলল, এই টাকাটা অর্থভান্ডারে রাখা উচিত নয়। কারণ এটা রক্তের মূল্য। এদিকে নিজের মহাপাপের কথা চিন্তা করে ভয়ে জুডাস দৌড়াতে দৌড়াতে উপস্থিত হল ক্ষুদ্র কেডন নদী তীরে। পাহাড়ের গায় একটি গাছ। দড়ি হাতে নিয়ে জুডাস নিজের গলায় বাঁধল, অপর প্রান্ত বাধল ঐ গাছের একটি ডালে। তারপর দিল ঝাঁপ, ফলে গলায় ফাঁস লেগে ঝুলে পড়ল। জুডাসের মৃত্যু হল। ডালটি তার দেহের ভার সহ্য করতে না পেরে ভেঙ্গে গেল এবং একটি বড় পাথরের উপর তার দেহ আছাড় খেয়ে পড়ল। দেহটি খেতলে বিকৃত হয়ে গেল।

জুডাসের সেই ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে একটি সমাধি ক্ষেত্র ক্রয় করা হল। সেটিকে বলা হয় হেচেল্‌দামা। অর্থাৎ রক্ত ক্ষেত্র।

আর যে সকল ব্যক্তি যীশুর নির্যাতনে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের প্রত্যেকের অমঙ্গল হল। হান্নাসের বংশ অভিশপ্ত হল। তার পুত্র চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করে নিহত হল। মহাযাজক কাইফাস রোমক সম্রাট কর্তৃক পদচ্যুত হলেন। রাজা হেরোড আন্তিপাস নির্বাসিত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। পিলাত ও সম্রাট কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে অনুশোচনায় আত্মহত্যা করলেন।

যীশুর প্রাণদন্ডের স্থানটি ছিল জেরুসালেম শহরের প্রান্তে কালভেরী নামে এক ক্ষুদ্র পাহাড়ে। কালভেরী শব্দের অর্থ-কংকালের স্থান। সৈন্যরা ভারী ক্রুশ যীশুর কাঁধে চাপিয়ে যাত্রা শুরু করল। অত্যাধিক রক্তক্ষরণে যীশু এত দূর্বল যে হাঁটতে পারছিলেন না। ক্রুশের ভারে তিনি বারে বারে পড়ে যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যেই যাতে যীশুর মৃত্যু না হয়, সেজন্য ইহুদীরা সিমোন নামে একজন পথিককে জোর করে ক্রুশ বইতে বাধ্য করল।

পথে আবার তাঁর মায়ের সংগে দেখা হলো। যীশুর এই অবস্থা দেখে তাঁর মা অত্যাধিক শোকে যেন পাথর হয়ে গেলেন। কয়েকজন ধর্মপ্রাণা মহিলা তাঁর জন্য কাঁদতে লাগল। যীশু তাদের বললেন, 'আমার জন্য কেঁদ না, বরং

নিজেদের জন্য এবং নিজ নিজ সন্তানদের জন্য কাঁদ।'

যীশু বধ্যভূমিতে এসে পৌঁছালেন। সিমোন ক্রুশটিকে মাটিতে রেখে দিলেন।

সৈন্যরা যীশুর দেহ থেকে কাপড় খুলে নিল। তার ক্ষতসমূহ আবার উন্মুক্ত হল। তারা যীশুর যন্ত্রণা লাঘবের জন্য কয়েক ফোঁটা পানীয় দিল। যীশু তা গ্রহণ করলেন। কিন্তু পান করলেন না। কারণ যন্ত্রণার উপশম তিনি চাননি।

সৈন্যরা যীশুকে ক্রুশের উপর শুইয়ে তাঁর দু'হাতে পেরেক দিয়ে চামড়া, মাংস ও হাড় ভেদ করে বিদ্ধ করল। তারপর পা দুটো একত্রিত করে সজোরে টেনে নির্মমভাবে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ করল। আর তখনই যীশু তাঁর শত্রুদের জন্য প্রার্থনা করলেন, 'পিতা এদের ক্ষমা করো, এরা জানে না এরা কি করছে।' যীশুকে ক্রুশে আটকিয়ে এরপর ক্রুশটিকে খাড়া করে মাটিতে পুতে দেয়া হলো। যীশু সেই অবস্থায় ঝুলতে থাকলেন।

তিন ঘন্টা পর্যন্ত, দুপুর বারোটা থেকে বিকাল প্রায় তিনটা পর্যন্ত যীশু এইরকম কষ্টকর অবস্থায় ছিলেন। ক্রুশের নীচে দাঁড়িয়ে ইহুদীরা তাঁকে উপহাস করে বলতে লাগল যদি তুমি ঈশ্বরপুত্র হও তবে ক্রুশ থেকে নেমে এস। তার দুই পাশে দু'জন ডাকাতও ক্রুশে ঝুলছিল। এদের একজন যীশুর কাছে নিজের অপরাধের জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। যীশু তাকে স্বর্গে স্থান দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তখন যীশুর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন তার শোকার্ত মাতা ও শিষ্য যোহন। যীশুর মৃত্যুতে জননী মারীয়ার কর্তব্য যাতে শেষ হয়ে না যায় তাই যীশু তাকে বিশ্ব মানবের মাতা করে দিলেন এবং মানুষের উদ্দেশ্যে শিষ্য যোহনকে দেখিয়ে বললেন, মা এই দেখ তোমার সন্তান। যোহনকে বললেন, যোহন এই দেখ তোমার মা।

সবরকম কষ্ট সহ্য করা এবং রক্তশূন্য হওয়ার পর যীশু সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন হয়ে পড়লেন। গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'হে পিতা, সমস্ত সমাপ্ত হয়ে গেল।' দুপুর তিনটার দিকে, যে সময়ে মন্দিরে নিস্তার' পর্বের মেষশাবকগুলো বলিরূপে উৎসর্গ করা হচ্ছিল, সেই সময় প্রকৃত মেষশাবক মানব মুক্তির জন্য নিজেকে পিতা ঈশ্বরের হাতে উৎসর্গ করলেন। বললেন, পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মাকে সমর্পণ করলাম।

এই বলে মাথা হেলিয়ে প্রাণত্যাগ করলেন যীশু।

যীশুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ও পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। ভূমিকম্প হল। কালভেরী পাহারে ধ্বস নামল। বড় বড় পাথর গড়িয়ে নীচে পড়ল। বহু কবরের মুখ খুলে গেল। তা দেখে সেনাপতি ও প্রহরীরা ভয় পেয়ে বলল, ইনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তারা অনুতাপ ও শোক প্রকাশ করে বুক চাপড়াতে লাগল।

সেদিন ছিল শুক্রবার। সন্ধ্যায় ইহুদীদের নিস্তার পর্ব আরম্ভ হবে বলে ক্রুশে কাউকে জীবিত রাখা নিষেধ। তাই সৈন্যরা দু'জন জীবিত ডাকাতের হাত পা ভেঙ্গে দিল। কিন্তু যীশুকে মৃত দেখে তারা তার হাত পা ভাঙল না। এক জন সৈন্য একটি বর্শা তাঁর বুকে বিধিয়ে দিল। বুক থেকে রক্ত ও জল বার হল।

যীশুর দু'জন শিষ্য পিলাতের অনুমতি নিয়ে ক্রুশ থেকে যীশুর মৃতুদেহ নামিয়ে একটি লম্বা চাদরে তা জড়ালেন। পরে পাহাড়ের গায়ে এক সমাধিত রেখে তার মুখটি একটি বড় পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিলেন।

যীশুকে সমাধিস্থ করা হলে ইহুদী নেতারা এসে পিলাতকে বলল, যীশু জীবিতাবস্থায় বলেছিলেন যে, তিনদিন পরে তিনি উঠে আসবেন। তাই ভাল পাহারার ব্যবস্থা না করলে শিষ্যরা হয়ত তাঁর দেহটিকে চুরি করে বলবে যে, তিনি পুনরুত্থান করেছেন। পিলাত তাদের কথায় অস্ত্রধারী প্রহরী দ্বারা পাহারার ব্যবস্থা করল।

কিন্তু সব কিছু বৃথা প্রতিপন্ন করে তৃতীয় দিন রবিবার ভোরে মৃত্যুঞ্জয়ী যীশুখ্রীষ্ট সমাধি থেকে পুনরুত্থান করলেন।

যীশুর পুনরুত্থান মুহূর্তে প্রচন্ড ভুমিকম্প হল। তাঁর দেহটি ছিল সূক্ষ্ম ও আলোকময়। একজন স্বর্গদূত কবরের মুখ থেকে পাথরটি সরিয়ে দিয়ে তার উপর বসলেন। তাঁর দেহ ও আলোকময় এবং পোশাক দুধের মত সাদা। দূতকে দেখে প্রহরীরা ভয়ে সংজ্ঞাহীন হলো। জ্ঞান হলে দেখল সমাধি শূণ্য।

কিছুক্ষণ পর কয়েকজন ধর্মপরায়না মহিলা সমাধির কাছে এলে স্বর্গদূত তাঁদের বললেন, তোমরা কি ক্রুশবিদ্ধ যীশুকে খুঁজছ? তিনি এখানে নেই, পুনরুত্থান করেছেন।

সংবাদ পেয়ে পিটার ও জন দৌড়ে কবরের কাছে এসে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। তারা দেখলেন, যে কাপড় দিয়ে যীশুর দেহ জড়ানো ছিল,

সেগুলো এক জায়গায় গুটানো অবস্থায় আছে। তারা বিশ্বাস করলেন যে, শাস্ত্রবাণী অনুসারে যীশু পুনরুত্থান করেছেন।

সেই রবিবার সন্ধ্যায় জেরুসালেম নগরের যে ঘরে যীশু শেষ ভোজ করেছিলেন, শিষ্যরা সেখানে ছিলেন। ইহুদীদের ভয়ে তারা দরজা বন্ধ করেছিলেন।

যীশু তাদের বললেন, তোমাদের শান্তি হোক। দেখ, এ আমি- ই

শিষ্যরা তাকে চিনতে পেরে খুব আনন্দিত হলেন।

যীশু তাদের আবার বললেন, পিতা আমাকে যেমন পাঠিয়েছেন, সেইভাবে আমিও তোমাদের পাঠাচ্ছি। পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। তোমরা যাদের পাপ ক্ষমা করবে তাদের পাপ ক্ষমা হবে। কিন্তু যাদের পাপ ক্ষমা করবে না, তাদের পাপ থেকেই যাবে।

কথাগুলো বলেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

যীশু শিষ্যদের পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা দিলেন। পাপের জন্য মানুষের কাছে যাতে স্বর্গের পথ বন্ধ না হয়, সেজন্য পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা যীশু তাঁর শিষ্যদের দিলেন। শিষ্যগণ কালক্রমে সেই ক্ষমতা তাদের শিষ্যদের অর্থাৎ বিশপ ও পুরোহিতদের দিয়ে গেলেন।

পুনরুত্থানের পর যীশু চলি-শ দিন এই পৃথিবীতে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি অনেকবার শিষ্যদের দেখা দিয়ে নানান উপদেশ দিয়েছেন। সকল জাতির কাছে তাঁর বাণী প্রচার করতে আদেশ দিলেন। তিনি বলে-ন, যারা আমার বাণী বিশ্বাস করে দীক্ষা নেবে, তারা পরিত্রাণ পাবে। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করবে, তাদের শাস্তি হবে। জগতের অবসান পর্যন্ত আমি তোমাদের মধ্যে অবস্থান করব।

একদিন যীশু পিটারের কাছে দর্শন দিয়ে তাকে বারবার জিজ্ঞাসা করলেন তিনি তাকে ভালবাসেন কি - না। পিটারের নির্মল প্রেমের পরিচয় পেয়ে যীশু পিটারকে তাঁর মন্ডলীর পরিচালনা ভার অর্পণ করলেন। পিটার হলেন মন্ডলির প্রথম পরিচালক ও গুরু অর্থাৎ প্রথম পোপ। যীশু শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে জেরুসালেমের সামনে জৈতুন পাহাড়ে উঠলেন। সেখানে তিনি শিষ্যদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তাদের প্রতি হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করে তিনি উঁচুতে উঠতে লাগলেন। শিষ্যরা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ একটি মেঘ

এসে যীশুকে ঢেকে ফেলল। তখন দু'জন স্বর্গদূত এসে তাদের বললেন, 'হে গ্যালিলীবাসিগণ, তোমরা আকাশের দিকে চেয়ে আছ কেন? যীশু যেভাবে তোমাদের কাছ থেকে উঠে স্বর্গে গেলেন, সেইভাবে তিনি আবার আসবেন।' এটা শুনে শিষ্যরা আনন্দিত হয়ে জেরুসালেমে ফিরে গেলেন।

যীশুর আদেশ মত তাঁর শিষ্যগণ, যীশুর মাতা মারীয়া ও অন্যান্য ভক্তরা জেরুসালেমে রইলেন। একটি ঘরে একত্রিত হয়ে তারা প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং পবিত্র আত্মার আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। তখন যীশুর ভক্তের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২০ জন।

যীশুর স্বর্গারোহনের পর দশম দিনে হঠাৎ প্রচন্ড ঝড়ের শব্দ হল। ঘরে উপস্থিত সবার মাথায় হঠাৎ এক একটি আগুনের শিখা এসে নামল। তাদের মনে পবিত্র আত্মার প্রেরণা এলো। সাহস ও উদ্যোগ সঞ্চারিত হলো।

ইহুদীদের কাছে গিয়ে তারা যীশুর বাণী প্রচার করতে লাগলেন।

সে সময়ে জেরুসালেমে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী ইহুদীরা পঞ্চাশতম উৎসব উদ্‌যাপন করতে এসেছিল। শিষ্যদের কথা তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাষায় শুনতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। পিটার তখন সবাইকে যীশুর বাণী শুনিয়ে বলতে লাগলেন যে, ঈশ্বর পুত্র যীশু পৃথিবীতে বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ করে প্রমাণ করেছেন যে, ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ইহুদীরা তাঁকে অন্যায়ভাবে, নিষ্ঠুরভাবে বিনা দোষে হত্যা করল। ঈশ্বর তবুও তাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। পিটারের উপদেশে ইহুদীরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলো। বললো- এখন আমাদের কী করতে হবে? পিটার বললেন, অনুতাপ করে যীশুর নামে দীক্ষা নাও, তবে পাপের ক্ষমা পাবে এবং পবিত্র আত্মাকে লাভ করবে। লোকে তাতে রাজী হল। সেদিনই তিন হাজার লোক দীক্ষা নিয়ে খ্রীষ্টভক্ত হল।

শিষ্যরা এবার সকল দেশে গিয়ে সবার কাছে মুক্তির বাণী প্রচার করতে লাগলেন এবং যীশুর নামে অনেক আশ্চর্য কাজও করতে লাগলেন। তাদের প্রচারের ফলে দিনের পর দিন ভক্তসংখ্যা বাড়তে লাগল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খ্রীষ্টমন্ডলী প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। শিষ্যগণ বিভিন্ন দেশে উপযুক্ত লোকদের মনোনীত করে তাদের ধর্মাধ্যক্ষ ও পুরোহিত পদে অভিষিক্ত করতে লাগলেন। শিষ্যগণ যীশুর পুনরুত্থানের কথা ঘোষণা করে যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে অনেক নির্যাতনও সহ্য করলেন। এমনকি অনেকে ধর্মের জন্য প্রাণও দিলেন। শিষ্য

থমাস্ ভারতে এসে সর্বপ্রথম খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন এবং মাদ্রাজের কাছে একটি স্থানে ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন।

প্রেরিত শিষ্যগণের মৃত্যুর পর শিষ্যদের পদাধিকারী পোপ ও বিশপগণ মন্ডলী পরিচালনা করতে লাগলেন। পোপ হলেন পিটারের পদাধিকারী, যীশুর প্রতিনিধি এবং মন্ডলীর প্রধান ধর্মগুরু। তাঁর নির্দেশমত বিশপগণ বিভিন্ন দেশে মন্ডলীর কাজ চালিয়ে যান। বিশপগণের সাহায্যকারী হলেন পুরোহিতগণ।

যীশুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রাকৃতির বিপর্যয়ের সাথে সাথে এক অলৌকিক ঘটনাও ঘটেছিল। তা'হলো জেরুসালেমের মন্দিরের পবিত্রতম কক্ষের সামনে যে সুবৃহৎ পর্দা ছিল, সেটি উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছিড়ে গিয়েছিল। এই অলৌকিক ঘটনাটি সবাইকে এই কথাই জানিয়ে দিল যে, ইহুদীদের মন্দিরটি যে উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল তা শেষ হয়ে গেল, শুরু হলো যীশু খ্রীষ্ট প্রবর্তিত নতুন বিধান।

খ্রীষ্টানদের কিছু ধর্মীয় কথা-

খ্রীষ্টধর্মের প্রধান দুটো ভাগ- (১) রোমান ক্যাথলিক ও (২) প্রটেষ্টটান।

খ্রীষ্টানরা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা বা পরমেশ্বরে বিশ্বাস করেন। তিনি আকাশ জমিন ও বিশ্বজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তিনি জীবনের উৎস। তাই খৃষ্টানরা তাকে পিতা বলে সম্বোধন করেন। তিনি শুধু যে এই জগতকে সৃষ্টি করেছেন, তা নয়। বরং পিতার মত যত্নের সাথে লালন- পালন করেন এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর প্রয়োজনীয় সব কিছুই দিয়ে থাকেন। যে অসীম জ্ঞান ও বাক্য তাঁর আছে তাকে খ্রীষ্টানদের পরিভাষায় বলা হয় পরমেশ্বরের পুত্র এবং তাঁর পূর্ণ ভালবাসা ও শক্তিকে বলা হয় পবিত্র আত্মা। খৃষ্টানরা বিশ্বাস করেন, একমাত্র ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বর তিনটি বিশেষ মহিমায় বিকশিত। ভিন্ন ভিন্ন যুগে মানুষের কাছে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার আকারে প্রকাশিত হয়েছেন। যেমন একই ব্যক্তির দেহ, মন ও আত্মা আছে। এই তিনটি পৃথক হলেও মানুষের অস্তিত্ব একান্ত প্রয়োজন। কেননা এই তিনটির একটা না থাকলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। তেমনি পরমেশ্বরের স্বভাব এই তিনটি মহিমা দ্বারা সংগঠিত। যীশু খ্রীষ্ট হলেন পরমেশ্বরের পুত্র। যীশুতে ঐশ স্বভাব ও মানব স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন থাকলেও একসঙ্গে বিদ্যমান। ফলে তাঁর জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে পরমেশ্বর ও মানুষের মধ্যে যোগাযোগপূর্ণ হল। এই জন্য যীশু খ্রীষ্টের জীবন খৃষ্টানদের কাছে

আদর্শস্বরূপ।

খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, যীশু খ্রীষ্ট পৃথিবীর শেষদিন পুনর্জীবিত হয়ে আসবেন এবং পরমেশ্বরের সঙ্গে মানুষকে পুনর্মিলিত করে চিরশান্তি স্থাপন করবেন।

খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থের নাম বাইবেল। বাইবেল হল গ্রীক শব্দ। এর অর্থ হলো পুস্তকাবলী বা কেতাবাবলী। কাজেই বুঝতেই পারছো, খৃষ্টানদের সমস্ত ধর্মপুস্তক একটি বড় গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে বলেই নাম হয়েছে বাইবেল। খ্রীষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বাইবেল হলো মানুষের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগাযোগের ইতিহাসের পুস্তকগুলি।

বাইবেলের পুস্তকগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। (ক) পুরাতন নিয়ম (খ) নতুন নিয়ম।

পুরাতন নিয়মে আছে মোট ৪৩টি বই আর নতুন নিয়মে মোট ১১টি বই। তাহলে বাইবেলে মোট বইয়ের সংখ্যা হলো ৫৪টি।

কোন্ বিভাগে কি কি বই আছে।

(১) পুরাতন নিয়ম মোট	৪৩টি বই।
পঞ্চপুস্তক (তৌরাত)	৫টি বই।
ঐতিহাসিক পুস্তকাবলী	১২টি বই।
জ্ঞান পুস্তকাবলী	৭টি বই।
গীত সংহীতা (জাবুর)	১টি বই।
প্রবক্তা বা নবীদের পুস্তকাবলী (সহিফাত)	১৮টি বই।
	মোট ৪৩ খানা বই।
(২) নতুন নিয়ম মোট	১৪ টি বই।
মঙ্গল সমাচার (ইঞ্জিল)-	৪টি বই।
প্রেরিতদের কার্যাবলী	১টি বই।
সাধু পৌলের ১৩ টি পত্র	১টি বই।
সাধু যাকবের পত্র	১টি বই।

সাধু পিতরের ২টি পত্র	১টি বই।
সাধু যোহনের ৩টি পত্র	১টি বই।
সাধু যিহূদার পত্র	১টি বই।
প্রকাশিত বাক্য	১টি বই।
	মোট ১১ খানা বই।

খ্রীষ্টধর্মের প্রধান আদেশ হলো, 'তোমরা মনে প্রাণে প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে। আর তোমরা একে অন্যকে ভালবেসো। আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তেমনি তোমরা একে অন্যকে ভালবেসো। আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।'

খ্রীষ্টধর্মের মূল তত্ত্ব ঃ

খ্রীষ্টধর্মের মূলতত্ত্বকে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়-

(১) একমাত্র সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরে বিশ্বাস।

(২) যীশু খ্রীষ্টের জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস।

(৩) পবিত্র আত্মার প্রেরণায় খ্রীষ্ট মন্ডলী স্থাপনে ও পরকালে বিশ্বাস।

খ্রীষ্টানরা প্রত্যেক রবিবারে গীর্জায় সমবেত হয়ে তাদের এই সব বিশ্বাস ঘোষণা করেন।

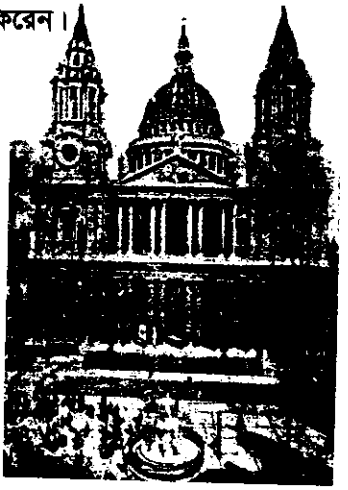

সেন্ট পলস গির্জা, লন্ডন

The Armenian Church of the Holy Resurrection in Armanitola, Old Dhaka

আমেরিকান চার্চ

ঢাকা

খ্রীষ্টধর্মের মূল করণীয় বিষয় ঃ

খ্রীষ্টধর্মের মূল করণীয় বিষয় হলো- একে অন্যকে ভালবাসা অর্থাৎ মানবতা। এই আদর্শ অনুসরণ করার চেতনা ও শক্তি লাভ করতে খ্রীষ্টানরা কতকগুলো ধর্মীয় কাজ করেন। যেমন- প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ, পবিত্র সংস্কার গ্রহণ, তপস্যাকালের উপবাস ও দয়ার কাজ।

(১) জনপ্রচলিত প্রার্থনা ঃ পবিত্র বাইবেল পাঠঃ খৃষ্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম বাইবেল। বাইবেল পাঠ করে খৃষ্টানরা জীবনের সঠিক পথে চলতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সমবেত ও আনুষ্ঠানিকভাবে যখন বাইবেল পাঠ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় প্রার্থনা সভা।

দৈনিক প্রার্থনা ঃ খৃষ্টানরা সাধারণতঃ দিনে কমপক্ষে তিন বার প্রার্থনা করেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে পরমেশ্বরের কাছে নবদিন উৎসর্গ করেন।

দুপুরে ঃ খাওয়ার আগে খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় উপাদানের জন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দেন।

রাত্রে ঃ ঘুমাবার আগে ঐ দিনের জীবনাচারণ মনে মনে পরীক্ষা করে পরমেশ্বরের কাছে ক্ষমা চান এবং তাকে ধন্যবাদ দিয়ে তার কথা মনে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন।

জপমালা ঃ এটা কাথলিক খ্রীষ্টানদের একটি বিশেষ প্রার্থনা। মা মারী-য়ার কাছে স্বর্গদূত যে কথা বলেছিলেন সেই কথাটা ১৫০ বার আবৃত্তিকরা হয় এবং প্রতি ১০ বার অন্তর যীশুর জীবনে একটি প্রধান ঘটনা স্মরণ করে ধ্যান করা হয়।

(২) মন্ডলী নিয়মসিদ্ধ প্রার্থনা ঃ এগুলো হলো

(ক) স্তোত্র সংহিতাঃ দিনে পাঁচবার সমবেত হয়ে প্রার্থনা করাকেই বলে স্তোত্র সংহিতা। যাজক ও ব্রতচারী-ব্রতচারিণীগণ এ নিয়ম পালন করতে বাধ্য। এই প্রার্থনার নির্দিষ্ট সময় হল ঃ ভোরকালীন প্রার্থনা, প্রাতঃকালীন প্রার্থনা, প্রাহরিক প্রার্থনা, সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা, নিদ্রাপূর্ব প্রার্থনা।

অনেকটা ইসলাম ধর্মের পাঁচওয়াক্ত নামাজ, যেমন ফজর, যোহর,

আছর, মাগরেব ও এশার নামাজের সময়ের মতো,

আসলে সব ধর্মের মূল সারই হলো ঈশ্বরের বা সৃষ্টিকর্তার আরাধনা, মানুষকে ভালবাসাও সৎভাবে চলা।

এরপর হলো (খ) পবিত্র সংস্কারবলী ঃ খ্রীষ্টিয় জীবনে প্রত্যেকটি পর্যায়ে পরমেশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ও তার আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য খ্রীষ্টভক্তগণ কয়েকটি সংস্কার মেনে চলে। যেমন-

দীক্ষাস্নান ঃ আনুষ্ঠানিকভাবে একজনকে জলে ডুবিয়ে বা তার মাথার উপর জল ঢেলে দেওয়া হয়। এই চিহ্নের মাধ্যমে খ্রীষ্টমন্ডলী এটাই বোঝান যে, এই নতুন ব্যক্তি খ্রীষ্টমন্ডলীতে ভক্ত হয়ে প্রবেশ করেছে। সে নবজীবন লাভ করল এবং পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বরের সন্তান ও তার স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠলো।

হস্তাপণ ঃ বিশপ বা মন্ডলীর পরিচালক খ্রীষ্টভক্তের উপর হাত রেখে ও কপালে তেল লেপন করে চিহ্ন দেন যে, এই খ্রীষ্টভক্ত পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে মন্ডলীর সদস্য হিসেবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম।

খ্রীষ্টপ্রসাদ ঃ একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খ্রীষ্টভক্তগণ যীশুর শেষ ভোজ স্মরণ করে তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হন এবং প্রসাদ খাদ্যরূপে আশীর্বাদিত রুটি ও দ্রাক্ষারস গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানকে খৃষ্টানরা বলেন 'খ্রীষ্টযাগ'। এর দ্বারা পরমেশ্বরের ও মানুষের মধ্যে এবং মানুষে মানুষে মিলন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক রবিবার সমবেতভাবে খ্রীষ্টযাগে যোগ দেয়া খ্রীষ্টমন্ডলীর একটা প্রধান নিয়ম।

এই খ্রীষ্টযাগের আরও কতোগুলো অংশ আছে।

উদ্বোধনী ও ক্ষমা প্রার্থনা; ঐশবাণী ঘোষণায় পবিত্র বাইবেল পাঠ; বিশ্বাসোক্তি অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ধর্মে বিশ্বাস ঘোষণা ও সার্বজনীন প্রার্থনা, যাগের উপকরণ প্রস্তুতি, প্রসাদীয় প্রার্থনা (যীশুর শেষ ভোজ স্মরণ) খ্রীষ্ট প্রসাদ গ্রহণ; সমাপনী প্রার্থনা ও বিদায়।

পুনর্মিলন সংস্কার ঃ খ্রীষ্টভক্তগণ মাঝে মাঝে ব্যক্তিগতভাবে বা সমবেত ও আনুষ্ঠানিকভাবে পুরোহিত দ্বারা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এর উদ্দেশ্য হলো, যাতে প্রাত্যহিক জীবনে যে সমস্ত পাপ করা হয়, সেগুলো ক্ষমা করা হয় এবং ঈশ্বর ও মন্ডলীর সাথে পুনর্মীলিত হওয়া যায়। এর জন্য পুরোহিত দ্বারা

তারা পরমেশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমা আশীর্বাদ লাভ করেন।

রোগীদের লেপন ঃ পুরোহিত মন্ডলীর সাথে প্রার্থনা করে রোগগ্রস্ত খ্রীষ্টভক্তদের দেহে তেল লেপন করেন। যাতে তারা খ্রীষ্টের যন্ত্রণার সহভাগী হয়ে পবিত্র আত্মার প্রভাবে পাপ থেকে মুক্ত হন এবং খ্রীষ্টেরই মত কষ্টকে বরণ করে নিজের ও বিশ্বমানবের জন্য পরিত্রাণ লাভ করতে পারেন।

বিবাহ ঃ খ্রীষ্টান দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবাহ হলো পরমেশ্বরের ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ। নর ও নারীর একটি পবিত্র বন্ধন যাতে আজীবন তারাপরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রী সমান অধিকার পাবে এবং কাথলিক মন্ডলী মোতাবেক বিবাহ হল অবিচ্ছেদ্য।

যাজকবরণ ঃ যারা সেবার কাজ ও পবিত্র সংস্কার প্রদানের মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় মন্ডলী গড়ে তুলতে নিজেদের উৎসর্গ করতে চান, তাদের মাথার উপর হাত রেখে বিশপ অর্থাৎ খ্রীষ্টিয় ধর্মপ্রদেশের পরিচালক যীশুখ্রীষ্টের নামে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের যাজকীয় ক্ষমতা দেন। যাজক সম্বন্ধে পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, 'প্রতিটি মহাযাজক মানুষের মধ্যে থেকেই মনোনীত হন। তিনি পরমেশ্বরের সেবাকার্যে মানুষের প্রতিনিধি রূপেই নিযুক্ত হয়ে থাকেন, যাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি অর্ঘ্য ও বলি নিবেদন করতে পারেন।'

খ্রীষ্টানদের মধ্যে কয়েকজন যীশু খ্রীষ্টের আদর্শ অনুসরণ করে কৌমার্য ব্রত পালন করেন। অর্থাৎ তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন না। তারা নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন পরমেশ্বরের কাছে এবং মানুষের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সেবার কাজে। এরা মন্ডলীতে ফাদার (যাজক) ব্রাদার (ব্রতচারী) সিস্টার (ব্রতচারিনী) নামে পরিচিত।

(৩) উপবাস অর্থাৎ রোজা ও দয়ার কাজ

সাধারণত ঃ খ্রীষ্টানরা তপস্যাকালে অর্থাৎ যীশুর পুনরুত্থান পার্বণের পূর্ব ৪০ দিন উপবাস করেন এবং গরীবদের ও তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের জন্য চাঁদা তোলেন। কাথলিক মন্ডলীর ভক্তেরা পূর্ণ উপবাস করেন বছরে মাত্র দু'দিন। যথা-
(ক) ভস্ম বুধবার অর্থাৎ তপস্যাকালের প্রথম দিন।

(খ) পুণ্য শুক্রবার (Good Friday) অর্থাৎ খ্রীষ্ট মরণের স্মরণ দিবস।

উপবাসের প্রধান উদ্দেশ্য হল পরমেশ্বরের পরিকল্পনা গভীরভাবে উপলব্ধি করা। উপবাস কালে তারা দুনিয়া থেকে মন ফিরিয়ে আধ্যাত্মিক

জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে পরমেশ্বরের কথা ভাবে। এছাড়া এতে না খেয়ে থাকা গরীবদের দুঃখ কষ্টের সহভাগী হয়ে তাদের সেবা করতে উৎসাহ পান। এই কারণে খৃষ্টানরা উপবাসকালে প্রার্থনা ও দয়ার কাজের উপর বেশী গুরুত্ব দেন এবং জগতের উন্নতি ও মানব কল্যাণের জন্য পরিশ্রম করতে অনুপ্রেরণা পান।

খ্রীষ্ট ধর্মের মূল উদ্দেশ্যঃ খ্রীষ্টধর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো ঐশরাজ্য স্থাপন করা। অর্থাৎ ইহকালে মানুষের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে পূর্ণতা লাভ করা এবং সমাজে ন্যায্যতা ও শান্তি স্থাপন করা। আর পরকালে ঃ পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বরের সঙ্গে চিরকাল সর্বাঙ্গীন জীবনের পূর্ণতা লাভ করা।

খ্রীষ্টিয় পর্বদিন।

অন্যান্য সব ধর্মের মত খৃষ্টানরা ও বছরে বিভিন্ন পর্ব বা ধর্মীয় দিন পালন করে থাকে। সেগুলো হলো ঃ

বড়দিনঃ যীশু খ্রীষ্টের জন্মের স্মরণ দিবস। - ২৫ শে ডিসেম্বর।

প্রভুর আত্মপ্রকাশঃ- পূর্বদেশের কয়েকজন পন্ডিত যীশুকে সম্মান দেখান, জানুয়ারী মাসের ১ম রবিবার -এ উৎসবের নাম এপিফ্যানি।

পূণ্য বৃহস্পতিবারঃ- যীশু খ্রীষ্টের শেষ ভোজের স্মরণ দিবস। বসন্ত কালের ২য় অমাবস্যার পর ১ম বৃহস্পতিবার।

পূণ্য শুক্রবারঃ- যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু স্মরণ দিবস। বসন্তকালের ২য় অমাবস্যার পর ১ম শুক্রবার।

পূণরুত্থান দিবসঃ- যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের স্মরণ দিবস। বসন্ত কালের ১ম অমাবস্যার পর ১ম রবিবার।

যীশুর স্বর্গারোহনঃ- যীশু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সুসমাচার প্রচার করতে আদেশ দিয়ে শেষবার তাদের থেকে মেঘের মধ্যে দিয়ে আকাশে অদৃশ্য হয়ে যান

ইসলাম ধর্মমতে মহান আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী হযরত ঈসা(আঃ) 'যীশু' কে দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) এর মাধ্যমে চতুর্থ আসমানে উঠিয়ে নেন। (সূরা নেসা-আয়াত ১৫৭,১৫৮ পারা-৬)

(৭) পঞ্চাশত্তমী পর্বঃ পবিত্র আত্মা যীশুর শিষ্যদের উপর নেমে এসে খৃষ্টমন্ডলী স্থাপন করেন পুণরুত্থান রবিবারের ৫০ দিন পর।

(৮) সমুদয় সাধু সাধ্বীর পর্বঃ কাথলিক মন্ডলী সকল সাধু সাধ্বীদের স্মরণ করেন- ১ লা নভেম্বর।

(৯) পরলোকগত ভক্তদের স্মরণঃ মৃত লোকদের জন্য খৃষ্টানরা প্রার্থনা করেন ও তাদের কবর পরিদর্শন করেন- ২রা নভেম্বর।

খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতীক ক্রুশ। প্রথম দিকে এ প্রতীক ছিল কষ্ট যন্ত্রণার অর্থে। পরবর্তীতে তা খ্রীষ্টভক্তদের জন্য হয় মহিমার প্রতীক। যে ক্রুশে খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন সেই ক্রুশ খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সম্মান ও আরাধনার বস্তু। খ্রীষ্টের পঞ্চক্ষত স্মরণ করে ৫ আঙুল দ্বারা ক্রুশচিহ্ন অঙ্কন করা হয়। যা মানব জাতির মুক্তির চিহ্ন এবং যীশুখ্রীষ্টের ভালবাসার চিহ্ন।

গৌতম বুদ্ধ

(খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৪ অব্দ- খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৬ অব্দ)

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক

হাজার হাজার বৎসর আগের কথা। এক দেশে ছিল এক রাজা। রাজার হাতিশালে হাতি। ঘোড়াশালে ঘোড়া। প্রচুর ঐশ্বর্য। প্রজারাও বেশ সুখে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু রাজার মনে কোন সুখ নেই। দেখতে দেখতে বুড়ো হতে চলছেন, বয়স ৫৬ বৎসর পার হতে চললো, অথচ কোন সন্তান নেই তার। তার মৃত্যুর পর কে চালাবে এই রাজ্য?

সে রাজার নাম হলো শুদ্ধোদন। আর রাজ্যের নাম কপিলাবস্তু। কপিলাবস্তু কোথায় ছিল ? হিমালয়ের নীচে, রোহিনী নদীর ধারে। আর তিনি যে বংশের রাজা ছিলেন, সেই বংশকে লোকে বলতো শাক্যবংশ।

শাক্যরা ক্ষত্রিয়। তারা কৃষিকাজ করতো, সেই সাথে করতো পশুপালন। সেদিন আষাঢ়ী পূর্ণিমা। রাত প্রায় শেষ। রাণী মহামায়া সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছেন। হঠাৎ তিনি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন স্বর্গ থেকে চারজন

দিব্যকান্তি দেবতা এসে মায়াদেবীর রত্ন পালঙ্ক তুলে নিয়ে চললেন হিমালয়ের দিকে। এক মনোরম স্থানে দেবতারা রাখলেন সে পালঙ্ক। এমন সময় এলো এক সাদা হাতি। কপালে তার সিদুঁরের মতো টিপ। বাঁকা বাঁকা কচি দুটি দাঁত, শুঁড়ে শ্বেতপদ্ম উঁচু করে ধরা। আস্তে আস্তে সেই পদ্মটি রাণীর কোলে এনে দিল পরম যত্নে। তারপর সেই শ্বেত হস্তী কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। উঠে বসলেন রাণী। খুলে বললেন রাজা শুদ্ধোদনকে স্বপ্নবৃত্তান্ত। রাজা সঙ্গে সঙ্গে রাজজ্যোতিষী ডেকে স্বপ্নের অর্থ জানতে চাইলেন। জ্যোতিষীরা বললেন, মহারাণী পুত্রবতী হতে চলেছেন। আপনার পুত্র কালে যশস্বী মহাপুরুষ হবেন। সূর্যস্বপ্নে রাজপুত্র মহাতেজস্বী হয়। শ্বেতহস্তীর স্বপ্নে শান্ত গম্ভীর জগৎদুর্বল এবং জীবের দুঃখহারী মহাধার্মিক ও মহাজ্ঞানী হয়। শাক্যবংশে জন্ম নেবে এক মহাপুরুষ। আপনারা আনন্দ করুন। আনন্দ করুন।

ছেলে হবে শুনে রাজা খুব খুশী হলেন। চারদিকে আনন্দের বাজনা বেজে উঠল। রাজা দু'হাতে প্রজাদের দান করতে লাগলেন। সারা রাজ্যজুড়ে বইছে আনন্দধারা।

দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েক মাস। তারপর এলো বহু আকাঙ্খিত মাস বৈশাখ। একদিন রাণী রাজাকে বললেন, তিনি দেবদহে তাঁর বাপের বাড়ী যাবেন। রাজা সানন্দে রাজী হলেন এবং রাণীর যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

রাণী চললেন দেবদহে, সোনার পালকীতে চড়ে। সঙ্গে গেলেন ছোটবোন গৌতমী আর পরিচারিকাবৃন্দ। রাজধানীর সীমান্তে ছিল রাজা শুদ্ধোদনের একটি প্রমোদ কানন- লুম্বিনী। ফুলে-ফলে, গাছপালায় ও ঝর্ণায় সাজানো ছিল সে বাগান। পথে যেতে যেতে রাণী সেই বাগানে একবার বিশ্রাম করতে চাইলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাণী নামলেন বাগানে। লুম্বিনীর বাগানে অজস্র শালগাছ। হাঁটতে হাঁটতে রাণী এসে দাঁড়ালেন একটা বড় শালগাছের নীচে। আর যেন তিনি চলতে পারছেন না। গাছের একটি শাখা ধরে তিনি দাঁড়ালেন, সেখানে পরিচারিকারা ও এসে দাঁড়াল। এগিয়ে এলেন গৌতমী।

আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ। বৈশাখী পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় ভরে গেছে লুম্বিনী বাগান। সেই শুভক্ষণে শালগাছ তলায় জন্ম নিলেন রাজকুমার, আজ থেকে অনেক অনেক বৎসর আগে খ্রীষ্ট-পূর্ব আনুমানিক ৫৬৪ অব্দে। লুম্বিনী কাননে বেজে উঠল মঙ্গল ঘন্টা। বাঁশি, শাখ, করতাল আর ঢাক-ঢোল। খবর গেল রাজার কাছে। ছুটে এলেন রাজা পুত্রকে দেখার জন্য।

বর্তমানে নেপালের তরাই অঞ্চলের রুম্মিনদেই হলো সেই লুম্বিনী কানন। তোমরা যদি কোনদিন নেপাল যাও, দেখে এসো সেই স্থানটি। দেখবে সেখানে একটি স্তম্ভ দিয়ে নির্দিষ্ট করা আছে স্থানটি। স্তম্ভটি দিয়েছিলেন সম্রাট অশোক।

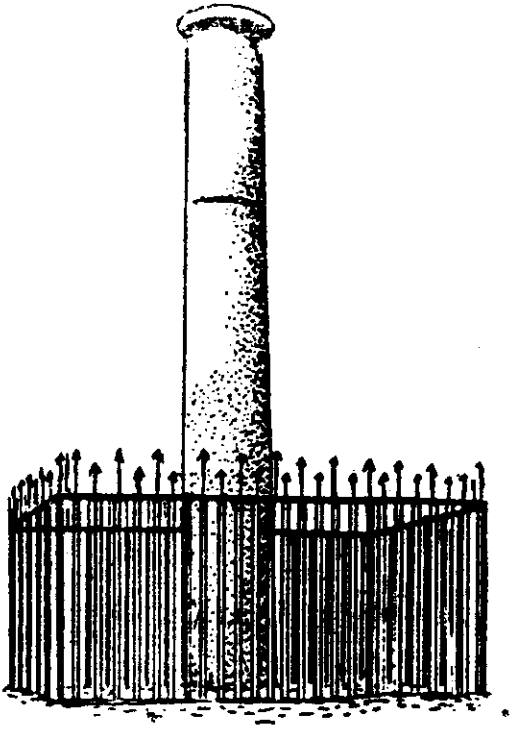

বুদ্ধদেবের জন্মস্থানে অশোকস্তম্ভ (লুম্বিনী)

এত বৎসর পর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র হয়েছে। দেশে আনন্দের বান ডেকে উঠলো। প্রজারা সকলেই মহারাজ ও নবজাত রাজকুমারের জয়ধ্বনি করে আনন্দ করতে লাগল।

সেই সময়ে কপিলাবস্তু নগরের একটু দূরে পাহাড়ের ঢালে ছোট্ট একটি

আশ্রমে বাস করতেন এক ঋষি। ধার্মিক ও পন্ডিত বলে তার খুব নাম ছিল। তিনি ধ্যানে জানতে পারলেন যে, রাজা শুদ্ধোদনের বংশে ভগবান গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁর পুত্ররূপে। মুনি তক্ষুণি চললেন রাজধানীতে রাজপুত্রকে দেখতে।

প্রাসাদে আসা মাত্রই মহারাজ শুদ্ধোদন এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন ঋষিকে। ঋষি রাজপুত্রকে দেখতে চান শুনে রাজা যেমন বিস্মিত হলেন, তেমন আনন্দিত ও হলেন। রাজঅন্তঃপুরে সংবাদ গেল। রাণী মহামায়া কোলে করে নিয়ে এলেন রাজকুমারকে। ঋষি আসন থেকে উঠে অপলক চোখে দেখতে লাগলেন রাজকুমারকে। তাঁর দুই চোখ দিয়ে ঝরছে আনন্দের অশ্রুধারা। তিনি রাজা শুদ্ধোদনকে বলে-ন- মহারাজ, বহু ভাগ্যবলে আপনি এই পুত্রলাভ করেছেন। আপনার এই পুত্র শুধু শাক্যবংশেরই মুখ উজ্জ্বল করবে না, সমস্ত পৃথিবীর দুঃখ ও ইনি হরণ করবেন। বহু যুগ পরে তিনিই এসেছেন আপনার পুত্ররূপে- যার আর্বিভাবের জন্যে পৃথিবী এতদিন অপেক্ষা করছিল। দেখছেন না, শীর সর্বাঙ্গে কত সুলক্ষণ। তবে আপনি বলেছেন কেন ?

রাজা জিজ্ঞেস করলেন। ঋষি বললেন- আমি কাঁদছি এই জন্য যে, আমার আয়ূ শেষ হয়ে এসেছে। আমি বঞ্চিত হলাম সেই কল্যাণের স্পর্শ থেকে- যা ইনি বহন করে নিয়ে এসেছেন।

এই বলে ঋষি চলে গেলেন। সাত দিন পর হঠাৎ মায়াদেবীর মৃত্যুহয়। রাজপুত্রের লালন- পালনের ভার নেন গৌতমী, ছোটরাণী।

রাজকুমারের নাম রাখা হবে, রাজা বসে আছেন সিংহাসনে। তাঁর দুই পাশে বসেছেন গণৎকারের দল। গৌতমীর কোলে রাজকুমার। ধূপদানীতে জ্বলছে ধূপ-ধুনো। সোনার থালায় ধান-দূর্বা, ফুল-চন্দন-শাঁখ-ঘন্টা।

রাজা ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করলেন- রাজকুমারের কি নাম হলো?

ব্রাহ্মণ- গণৎকারেরা বললো- এই রাজকুমার যদি সংসারে থেকে রাজত্ব করেন, তবে ইনি হবেন রাজচক্রবর্তী। আর তা যদি না করেন, তবে ইনি হবেন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী হয়েও পৃথিবীকে কৃতার্থ করবেন। পৃথিবীর লোক সিদ্ধি লাভ করবে, সেই জন্য কুমারের নাম রাখা হলো সিদ্ধার্থ।

রাণী গৌতমীর প্রতিপালিত বলে সিদ্ধার্থের আর এক নাম গৌতম।

দিনে দিনে সিদ্ধার্থ বড় হতে লাগলেন। বিমাতা গৌতমী মায়ের স্নেহ দিয়ে সিদ্ধার্থকে মানুষ করতে লাগলেন। আট বছর বয়সে সিদ্ধার্থের পড়াশুনা শুরু

হয়। পন্ডিত বিশ্বমিত্রের কাছে সিদ্ধার্থের লেখাপড়ার ব্যবস্থা হলো। সিদ্ধার্থ একবার যা শোনেন তা মুখস্ত হয়ে যায়। তাঁর বুদ্ধি দেখে পন্ডিত ত অবাক। সকল ছাত্রের মধ্যে সিদ্ধার্থই শ্রেষ্ঠ। শুধু পড়াশুনাতেই নয়, তীরধনুক ছোঁড়া, তরবারী চালানো এসব বিদ্যাতেও সে সকলকে ছাড়িয়ে গেল।

কিছুদিন পর সিদ্ধার্থকে শিখানো হলো ঘোড়ায় চড়া, শিকার করা। এ সময় সিদ্ধার্থের একটি গুণ খুব বেশী প্রকাশ পেল- তা'হলো মায়া মমতা। কারো দুঃখ তিনি সইতে পারতেন না। কোনো জীবজন্তু যদি সামান্য আঘাত পেত, অমনি সিদ্ধার্থের কোমল হৃদয় বেদনায় কাতর হয়ে উঠতো। তেমন একটি ঘটনা শোন। একদিন সিদ্ধার্থ বাগানে একটি গাছের নীচে বসে আছেন। এমন সময় কোথা থেকে একটি তীরবিদ্ধ হাঁস এসে পড়লো তাঁর পায়ের কাছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে পাখীটা। সিদ্ধার্থ আর স্থির থাকতে পারলেন না। হাঁসটাকে তুলে নিলেন নিজের কোলের ওপর। আস্তে আস্তে তীরটা টেনে বের করলেন। তারপর নিজের পরনের কাপড় ছিড়ে সেটা জলে ভিজিয়ে হাঁসের পালক থেকে সমস্ত রক্তের দাগ মুছে দিলেন আর গভীর মমতায় হাঁসের ডানায় হাত বুলোতে লাগলেন।

এমন সময় সেখানে হাজির হলো দেবদত্ত। দেবদত্ত সিদ্ধার্থের মামাতো ভাই। হাতে তার তীরধনুক। সিদ্ধার্থ বুঝলেন এ দেবদত্তেরই কাজ। দেবদত্ত বললো- ও হাঁস আমার। আমি মেরেছি। আমাকে দাও।

সিদ্ধার্থ বললেন- কিন্তু আমি একে বাঁচিয়েছি। এ হাঁস আমি তোমাকে দেব না। প্রাণঘাতীর চেয়ে প্রাণদানকারীর দাবী বেশী।

দু'জনে বেশ তর্কাতর্কি হলো। সিদ্ধার্থ কিছুতেই হাঁসটাকে দিলেন না। দেবদত্ত ক্ষুণ্ন মনে ফিরে গেল। সিদ্ধার্থ এবার সেবাযত্ন করে হাঁসটাকে ছেড়ে দিলেন।

সিদ্ধার্থকে সুখে রাখার জন্য রাজা শুদ্ধোদনের চেষ্টার শেষ ছিল না। বিলাসের সমস্ত উপকরণ দিয়ে তিনি ভরিয়ে দিতে চাইলেন ছেলের জীবন, পাছে ভয়, ছেলে যদি সন্ন্যাসী হয়ে যায়!

কুমারকে সুখে রাখার জন্য রাজা একটা আলাদা প্রাসাদ তৈরী করিয়ে দিলেন। সেখানে নানা রকমের উৎসব হতো। রূপসী নর্তকীরা নাচে-গানে কুমারকে সুখে রাখার চেষ্টা করতো।

কিন্তু এত ভোগসুখের মধ্যে থেকেও রাজকুমারের মন কিছুতেই তৃপ্তি পেতনা। মাঝে মাঝেই আনমনা হয়ে যেত। এক দুঃখ দুঃখ অনুভূতিতে ভরে থাকতো সমস্ত অন্তর। রাজা জানতে পারলেন এ খবর। মন্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন- কি করা যায় বলুন তো? কি করলে কুমারকে সুখে রাখা যায়?

মন্ত্রী বললেন- মহারাজ, কুমারের বয়স হয়েছে। এখন তার বিয়ের ব্যবস্থা করুন। রাজার আদেশে রাজধানীতে একটা আনন্দ মেলার আয়োজন হলো। রাজ্যের সব সুন্দরী কুমারীদের নিমন্ত্রণ করা হলো সেই অনুষ্ঠানে। ঠিক হলো, সিদ্ধার্থ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নিজ হাতে কুমারীদের পুরস্কার দেবেন।

সেই আনন্দ মেলায় এল অনেক সুন্দরী কুমারী, হরেক রকম সাজ সজ্জা করে। কুমার বসে আছেন একটা উঁচু মঞ্চের ওপর। এক একটি মেয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ায়। কুমার তাদের কারো মুখের দিকে না তাকিয়েই পুরস্কার দিয়ে চলেছেন। একে একে সব পুরস্কার শেষ হয়ে গেল। এমন সময় রাজ কুমারের সামনে এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে, নাম তার যশোধরা। কুমার মুখ তুলে চাইলেন তার দিকে। মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো- কই, আমায় কিছু পুরস্কার দিলেন না কুমার?

পুরস্কার যে আর একটিও অবশিষ্ট নেই। সিদ্ধার্থ লজ্জায় পড়লেন। অগত্যা হাত থেকে একটি আংটি খুলে যশোধরার আঙুলে পড়িয়ে দিলেন। অদূরে পাত্র-মিত্র নিয়ে বসেছিলেন রাজা শুদ্ধোদন। রাণী গৌতমী। তাঁরা বুঝলেন, এই মেয়েটিকেই পছন্দ হয়েছে কুমারের। অমনি বাদ্য বেজে উঠলো, উৎসব শুরু হলো। তারপর একদিন এক শুভলগ্নে যশোধরার সঙ্গে বিয়ে হলো রাজকুমার সিদ্ধার্থের। বিয়ের পর স্ত্রীর নাম দেন তিনি গোপাদেবী। এ সময় সিদ্ধার্থের বয়স ছিল উনিশ বৎসর। রাজা শুদ্ধোদন এবার চিন্তামুক্ত হলেন।

বিয়ের পর রাজকুমারের জন্য আর একটি নতুন প্রাসাদ তৈরী করিয়ে দিলেন রাজা শুদ্ধোদন। আগের মত এই প্রাসাদেও রাখলেন বিলাসের নানা উপকরণ, আর আদেশ দিলেন কুমারের দৃষ্টিপথে যেন কোন বাসি ফুল, ঝরা পাতা বা কোন রুগ্ন বা ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ না পড়ে। রাজার এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হতো।

বেশ কয়েক বৎসর কেটে গেল। রাজকুমার সিদ্ধার্থের একটি ছেলে

হলো। সোনার টুকরো ছেলের নাম রাখা হলো রাহুল।

রাজা ভাবলেন, যাক, এবার পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া গেল। ছেলের মায়া নিশ্চয়ই কুমার কাটাতে পারবে না।

একদিন সিদ্ধার্থ নগর ভ্রমণে বেরুবেন বলে রাজার আদেশ চাইলেন। রাজা তক্ষুণি নগর ভ্রমনের আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ আদেশও দিলেন যে, কুমার যখন ভ্রমণে বেরুবে, তখন পথঘাট ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে থাকে। কোথাও কোন আবর্জনা যেন না দেখা যায়। কোন রুগ্ন, পীড়িত, এমনকি বৃদ্ধলোক পর্যন্ত যেন কুমারের দৃষ্টিপথে না পড়ে।

রাজধানী সাজানো হলো নতুন ভাবে। রাজকুমার সিদ্ধার্থ তাঁর সারথি ছন্দককে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন নগর ভ্রমণে। সবাই জয়ধ্বনি করলো কুমারের। চলতে চলতে হঠাৎ কুমারের চোখে পড়ে একটি জ্বরাগ্রস্ত লোক। শীর্ণ চেহারা, মাথার চুলগুলো সব সাদা, শরীর গেছে বেঁকে। লাঠিতে ভর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটছে সে। সারথিকে অর্থাৎ ঘোড়া চালককে জিজ্ঞেস করলেন কুমার, ছন্দক এ কে?

ছন্দক বললো- এ একজন বুড়ো লোক। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। সকলেরই একদিন এই অবস্থা হবে কুমার। সিদ্ধার্থের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বেড়াতে আর ভালো লাগলো না। প্রাসাদে ফিরে এলেন। চোখের সামনে তার ভাসতে লাগলো সেই পক্ককেশ বৃদ্ধের জ্বরাজীর্ণ শরীর।

এইভাবে পরপর আরো তিনদিন বেড়াতে বেরুলেন সিদ্ধার্থ। একদিন দেখলেন ব্যাধিগ্রস্ত একটা মানুষ। পরদিন একটা মৃতদেহ। তারপরদিন একজন সন্ন্যাসী।

সৌম্যমূর্তি সন্ন্যাসীকে দেখে সিদ্ধার্থ খুব শান্তি পেলেন। ভাবলেন, এর মতো সুখী পৃথিবীতে আর কেউ নেই। তিনি মনে মনে গৃহত্যাগের সংকল্প নিলেন।

প্রাসাদে ফিরে সিদ্ধার্থের মনে শুধু একটিই প্রশ্ন- এই সংসারে এত দুঃখ। এই দুঃখের শেষ কোথায়? এই যে ভোগবিলাস- এতো দু-দণ্ডের জিনিস, এর জন্য মানুষ এত লালায়িত হয় কেন?

সেদিন রাতেই সিদ্ধার্থ মহারাজার সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে বললেন- বাবা, আমি সংসার ছেড়ে চলে যাব ঠিক করেছি। আপনি আমাকে অনুমতি দিন।

রাজার তো মাথায় হাত। এ ভয়, এ আশংকাই তো তিনি পুত্রের জন্মের পর থেকেই করে আসছিলেন। যা গণৎকাররাও বলেছিলো। তবু ছেলেকে সংসারে ধরে রাখবার জন্যে তিনি বললেন- সংসার ধর্ম আগে পালন কর। তারপর তুমি সংসার ত্যাগ করো। আমি তো ঠিক করেছি, তোমার হাতে রাজ্য তুলে দিয়ে আমি অবসর নেব। সিদ্ধার্থ বললেনঃ- বেশ, আপনি আমাকে আশ্বাস দিন যে, আমি কখনো বুড়ো হব না, আমার কোনদিন অসুখ করবে না। আমি কোনদিন মরব না। রাজা বললেনঃ- এ যে অসম্ভব! এমন অসম্ভব জিনিসের আশ্বাস আমি কেমন করে তোমাকে দেব?

সিদ্ধার্থ বললেন- তাহলে আমাকে অনুমতি দিন, আমি সংসার ত্যাগ করি। রাজা অগত্যা বললেন- কিসের জন্যে তুমি সংসার ত্যাগ করবে? কি অভাব তোমার?

পৃথিবীতে এত দুঃখ, এই দুঃখের কারণ কি, কোন্ পথে এই দুঃখের শেষ, আমি তাই জানতে চাই।

এই বলে কুমার তার প্রাসাদে ফিরে এলেন।

তখন গভীর রাত। শিশুপুত্র রাহুলকে বুকে নিয়ে যশোধরা ঘুমিয়ে আছেন। মনের সব মায়া মমতাকে বিসর্জন দিয়ে রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সিদ্ধার্থ। তারপর সারথি ছন্দককে সঙ্গে নিয়ে সিদ্ধার্থ কপিলাবস্তু ত্যাগ করে চলে গেলেন।

যেতে যেতে রাজধানীর সীমানা ছাড়িয়ে একটা নদীর ধারে এসে দাঁড়ালেন সিদ্ধার্থ। রাত্রিও শেষ হয়ে এসেছে। ঘোড়া থেকে নেমে সিদ্ধার্থ একে একে তাঁর রাজবেশ খুলে ছন্দকের হাতে দিয়ে বললেন- ছন্দক, তুমি এইসব নিয়ে কপিলাবস্তু ফিরে যাও। আমার সঙ্গে আর আসতে হবে না। আমি এখন সন্ন্যাসী।

এই বলে সিদ্ধার্থ বনের পথ ধরে চলে গেলেন। এ সময় সিদ্ধার্থের বয়স ছিল উনত্রিশ।

নদী পার হয়ে সিদ্ধার্থ এলেন বৈশালী গ্রামে। এখানে তিনি এলেন এক ঋষির আশ্রমে। তাঁর কাছে কিছুদিন শাস্ত্র পড়লেন। ধ্যান-আসন শিখলেন। কিন্তু যে জন্যে তিনি সংসার ত্যাগ করেছেন, সেই দুঃখ জয়ের হদিস তিনি এখানে পেলেন না। তাই ঋষির আশ্রম ছেড়ে তিনি আবার হাঁটতে শুরু করলেন। হাঁটতে

হাঁটতে এলেন রাজগৃহ। রাজগৃহ কিন্তু কোন রাজার ঘর নয়। এটা একটা জায়গার নাম। রাজা বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহ। বিম্বিসার কে ছিলেন জানো? মগধের (বর্তমান বিহার প্রদেশের) রাজা। সিদ্ধার্থ রাজগৃহের গৃধ্রকূট পাহাড়ের একটা গুহায় আশ্রয় নিলেন। সেই পাহাড়ের ওপর ছোট বড় আরো অনেক গুহায় বাস করতো অনেক সাধু সন্ন্যাসী।

সকাল হলে সিদ্ধার্থ ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে নগরে এলেন ভিক্ষা করতে। পথ দিয়ে যখন তিনি চলতেন তখন তাঁর রূপ দেখে রাজগৃহের সব মানুষই অবাক! সবাই বলাবলি করতে থাকে কী শান্তি, কী সৌম্য চেহারা, এই সন্ন্যাসীর। গৃহস্তের দরজায় নীরবে এসে দাঁড়াতেই শ্রদ্ধার দানে পূর্ণ হয়ে যায় নবীন সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থের ভিক্ষাপাত্র।

রাজা বিম্বিসরও একদিন শুনলেন এই সন্যাসীর কথা। শুনে অবাক হয়ে গেলেন- এত বড় রাজ্যের রাজপুত্র এই বয়সে সন্যাসী হয়েছে।

বিম্বিসার একদিন দেখা করতে এলেন সিদ্ধার্থের কাছে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি তাঁকে তার অর্ধেক রাজত্ব দিতে চাইলেন। সিদ্ধার্থ তা নিতে রাজী হলেন না। বললেন- রাজ্য ছেড়ে আমি চলে এসেছি। আমাকে রাজ্যের প্রলোভন দেখাবেন না। আমি সত্যের সন্ধানে বেরিয়েছি। সেই সত্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত আমি নিবৃত্ত হব না।

রাজগৃহের কাছে উদ্রক নামে একজন নামকরা মুনি থাকতেন। সিদ্ধার্থ তার কাছে এলেন এবং অনেক কিছু শিখলেন। তারপর একদিন গুরুকে জিজ্ঞেস করলেন- দুঃখের শেষ কোথায়? গুরু কোন জবাব দিতে পারলো না। সিদ্ধার্থ তখন তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। সঙ্গে পাঁচ জন শিষ্য।

হাঁটতে হাঁটতে তারা অঞ্জনা (কেউ বলে নিরঞ্জনা) নদীর তীরে এলেন। নদীর তীরে ছোট্ট গ্রাম উরুবিল্ব। এই স্থানটি ছিল ভারতের বিহার প্রদেশের গয়া জেলায়। গয়া শহর থেকে আরো উত্তরে উরুবিল্ব। সিদ্ধার্থ তার শিষ্যদের নিয়ে এই উরুবিল্বে তপস্যা আরম্ভ করলেন। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে একাসনে বসে একাগ্রমনে শুধু তপস্যা করতে লাগলেন।

এই ভাবে কেটে গেল ছয়টি বছর। সিদ্ধার্থের শরীর হয়ে গেল শীর্ণ, কংকালসার। কিন্তু এত কঠিন তপস্যা করেও তিনি তার প্রশ্নের উত্তর পেলেন না। জানতে পারলেন না জগতে লোক কেন এত দুঃখ পায়। কোন্ পথেই বা দুঃখের

শেষ।

একদিন তপস্যার আসন থেকে উঠে সিদ্ধার্থ চললেন নদীর দিকে। কিন্তু একটু হাঁটতেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। শিষ্যেরা তাকে তুলে নিয়ে এলো। অনেক যত্নে তিনি সুস্থ্য হলেন। তখন সিদ্ধার্থ বুঝতে পারলেন যে, নিস্তেজ মন, আর দুর্বল শরীর নিয়ে কোন কাজ সম্ভব নয়। এই ভেবে সেই থেকে তিনি প্রয়োজনমত আহার গ্রহণ করতে লাগলেন। কিছুদিন পরই তিনি শরীরে শক্তি ফিরে পেলেন। শরীর আবার আগের মতোই হয়ে উঠলো। কিন্তু শিষ্যদের এটা পছন্দ হলো না। তাঁরা পাঁচ শিষ্য কৌন্ডিন্য, বপ্প, ভদ্দিয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ রাগ করে তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। সিদ্ধার্থ তখন একলাই সেখানে তপস্যা করতে লাগলেন। সকালে গ্রামে গিয়ে ভিক্ষা করেন। এইভাবে কেটে গেল একটি বছর। সে গ্রামে বাস করত সুজাতা নামে এক গৃহবধু। সুজাতার অনেক দিন কোন সন্তান হয়নি। বনদেবতার মানত করার ফলে তার একটি পুত্র সন্তান হয়। একদিন বনদেবতার পূজোর জন্যে সে পায়েস রান্না করে নিয়ে এল সেই বনের মধ্যে। এসে দেখে বন আলো করে বসে আছেন এক সন্ন্যাসী। সিদ্ধার্থ তখন ধ্যান করছিলেন। সুজাতার মনে হলো ইনিই সেই দেবতা। তিনি পরম ভক্তিভরে পায়েসের থালা তাঁকে নিবেদন করলেন। সিদ্ধার্থ সুজাতার দেওয়া সেই পায়েস খেলেন। তোমরা যদি কোনদিন ভারতের আহমেদাবাদ রাজ্যে যাও, তা'হলে দেখবে সুজাতার এই অন্নদান চিত্রটি সেখানকার অজন্তার গুহাচিত্রে এখনো অম্-ান। বৌদ্ধ সাহিত্যে ও শিল্প কলায় এই অন্নদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

সিদ্ধার্থ সুজাতার দেওয়া সেই পায়েস খেয়ে হাত-মুখ ধুলেন অঞ্জনা নদীর জলে। তারপর সেই অশ্বত্থ গাছের নীচে বসে প্রতিজ্ঞা করলেন, এ আসনে আমার শরীর যাক, আর থাক, ত্বক, অস্থি মাংস সব বিনাশ হয়ে যাক, যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্লভ বোধিজ্ঞান না পাই, দুঃখের কারণ না জানি, এ আসন ছেড়ে উঠব না।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। বৈশাখী পূর্ণিমা। সারাদিন রাত গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে রইলেন সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থের সেই তপস্যা ভাঙাবার জন্য 'মার' এলো যার মার' হলো ভয়ে পৃথিবী কম্পমান। মানব জাতির কল্যাণে কোনো মহাপুরুষ অগ্রসর হলে তাঁকে 'মার' বা ভয়-ভীতি লোভ-লালসা- প্রলোভন' ইত্যাদি জয় করতে হয়। সিদ্ধার্থের তপস্যা ভাঙবার জন্যে ও মারেরা অনেক ভয় দেখাল, প্রলোভন দেখাল। মারের পার হলে তিনি দিব্যচক্ষু কিছুতেই কিছু হলো না।

তখন 'মার' তুমুল ঝড়ের সৃষ্টি করলো। কখনো আগুনের বৃষ্টি, কখনো বরফের বৃষ্টি, কখনো তপ্ত বালির বৃষ্টি, কখনো ঘন অন্ধকার, কখনো বজ্র-বিদ্যুৎ। কিন্তু এত সব উৎপাতেও সিদ্ধার্থের তপস্যা একটুও ভাংলো না। একাগ্র মনে তিনি ধ্যানে ডুবে আছেন। নিরুপায় হয়ে মার ফিরে গেল। রাতের প্রথম প্রহর থেকে সিদ্ধার্থের জ্ঞান লাভ শুরু হয়। রাতের দ্বিতীয় প্রহর পার হলে তিনি দিব্যচক্ষু থেকে সিদ্ধার্থের জ্ঞান লাভ করলেন। রাতের তৃতীয় প্রহরে তিনি মানুষের জন্ম, জ্বরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর অর্থ বুঝতে পারলেন। এভাবে তিনি 'চার আর্যসত্য' নামে নতুন এক সত্য ও দর্শন লাভ করলেন।

সিদ্ধার্থ যে অশ্বত্থ গাছের নিচে বসে জ্ঞান লাভ করেন সেই বৃক্ষের নাম হলো বোধিদ্রুম বা বোধিবৃক্ষ। এটি ভারতের বিহার প্রদেশের গয়ায় অবস্থিত। এলাকাটি বুদ্ধগয়া নামে বিখ্যাত। জ্ঞান লাভের পর তার নাম হয় 'বুদ্ধ' বা 'গৌতম বুদ্ধ'। তখন তাঁর বয়স ৩৫ বৎসর।

বুদ্ধ বলেছেন, মানবজীবন দুঃখময়। এই দুঃখের প্রকৃত কারণ তৃষ্ণা। এর নাম আর্যসত্য।

পৃথিবীতে দুঃখই সত্য। দুঃখ পার হলে তিনি দিব্যচক্ষু কন্যারা নানা অলংকারে ভূমিতা হয়ে তাকে মুখ সম্পদ দেওয়ার কথা বললো। কিন্তু যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপন্ন হবে। এর নাম দ্বিতীয় আর্যসত্য। তৃষ্ণার বিনাশ করে মানুষ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়। এর নাম তৃতীয় আর্যসত্য। তৃষ্ণা নাশের উপায় হচ্ছে 'মধ্যম পথ' অবলম্বন করা। মধ্যম পথ মানে কি জানো? অর্থাৎ কঠোর সাধনা করে শরীরকে কষ্ট দেওয়াও নয়, আবার ভোগের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়াও নয়, সংসারে থেকে সুন্দর জীবন যাপন করা। সৎ কাজ করে জীবন নির্বাহ করা। এর নাম চতুর্থ আর্যসত্য। বৌদ্ধ ধর্মের এই চারটি হলো মূল স্তম্ভ।

দুঃখসত্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুদ্ধ বলেছেন, দুঃখকে নিরোধ করতে হলে আটটি পথ বা নীতি মেনে চলতে হবে, এগুলোকে বলে অষ্টাঙ্গিক সোনালী পথ।

(১) সৎ জ্ঞান বা সৎ দৃষ্টি। সৎ দৃষ্টি মানুষকে জীবনে উন্নতি লাভে সহায়তা করে।

(২) সৎ সংকল্প বা ইচ্ছা। ভালো ও মন্দের তফাৎ বুঝে নিয়ে সৎ সংকল্প বা সং ইচ্ছে থাকলে তবেই বড় হওয়া যায়। দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা

যায়।

(৩) সৎ বাক্য। প্রতিদিনের কাজে মানুষকে হতে হবে সত্যবাদী। সৎ বাক্য মানুষকে বড় ও মহৎ করে।

(৪) সৎ কর্ম। হিংসা, চুরি, ব্যাভিচার এসব না করাই হলো সৎ কর্ম।

(৫) সৎ জীবিকা। সৎ জীবিকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা দরকার। প্রাণী হত্যা অন্যায়।

(৬) সৎ মানসিকতা। মন্দ চিন্তা বর্জন করে সুচিন্তা করা উচিত।

(৭) সৎ স্মৃতি। আমি ভাল কাজ করবো। আমি ভাল কাজ করেছি এই ভাবনা মানুষকে ভাল পথে নিয়ে যায়। মনের মাঝে সংশয় বা কুচিন্তা এলে সৎ চিন্তা মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধারে সাহায্য করে।

(৮) সম্যক সমাধি। চিত্তের একাগ্রতাকে বলে সমাধি। মনের চঞ্চলতা দূর করার জন্য এই ধ্যান ও সমাধি। পাপকর্ম থেকে দূরে থাকা, চিত্তকে সংযত করা ও পরিশুদ্ধ রাখা - অর্থাৎ কোন রকম কালিমা ছাড়া মুক্ত চিত্তই শ্রেষ্ঠ চিত্ত।

এই অষ্টাঙ্গিক সোনালী পথ পরিক্রমার জন্য চাই মনের প্রশান্তি। এর জন্য চারটি ভাব থাকা দরকার। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা।

মিত্র বা বন্ধুর প্রতি যে ভাব তার নাম মৈত্রী। মনের যে অবস্থায় অন্যের দুঃখে দুঃখী হয় এবং তা দূর করবার ইচ্ছা হয়, তার নাম করুণা। মনের যে অবস্থায় অপরের সুখে সুখী হয়, তাকে বলে মুদিতা। আর এই তিন অবস্থাকে পেরিয়ে মানুষ যখন দুঃখে কাতর হয় না, বা সুখে মোহগ্রস্থ হয়ে পড়ে না, সব সময় মনের শান্তভাব বজায় রাখে, সে অবস্থাকে বলে উপেক্ষা।

এ বিষয়ে বুদ্ধ তার ছেলে রাহুলকে উপদেশ দিয়েছিলেন- 'হে রাহুল, মৈত্রী ভাব সাধন করতে হবে, এতে বিদ্বেষবুদ্ধি দূর হবে। করুণাভাব সাধন করতে হবে, এতে হিংসাবুদ্ধি কেটে যাবে। মুদিতাভাব সাধন করতে হবে, এতে ভালোবাসা জন্ম নেবে। আর উপেক্ষাভাব সাধন করতে হবে, এতে লোভ ও আসক্তি দূর হবে।

সংক্ষেপে তাঁর মূল বিষয়গুলো হলো-

পঞ্চশীল। শীল মানে চলার সম্বল। পঞ্চশীল হলো প্রথম সম্বল। এই পাঁচটি শীল বা মূল নীতি হলো-

(১) প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা।

(২) কাজ করার সময় স্বার্থকে মনে স্থান না দেওয়া।

(৩) মিথ্যা না বলা। চুরি না করা।

(৪) বুদ্ধি লোপ পাওয়ার মত কিছু না খাওয়া এবং

(৫) মন ও শরীর উভয়কেই পবিত্র রাখা।

নাক, কান, জিভ, চোখ, ত্বক এই পাঁচ ইন্দ্রিয়কে বিবেক ও বুদ্ধি দিয়ে সংযতভাবে ব্যবহার করতে হবে।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক। পালিতে পিটক মানে সংগ্রহ। এখানে তিন ভাগে বুদ্ধের মূল নীতিগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। এই তিনটি অংশ হচ্ছে-

(১) বিনয় পিটক (অনুশাসন শিক্ষা)

(২) সূত্র পিটক (ধর্ম উপদেশ ও আলোচনা)।

(৩) অভিধর্ম পিটক (তত্ত্ব বিদ্যা)।

প্রতিটি পিটক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। এভাবে অনেকগুলো খণ্ডের সমন্বয়ে সুবৃহৎ ত্রিপিটক গ্রন্থ প্রস্তুত হয়েছে। শুধু বৌদ্ধধর্ম নয়, সমকালীন প্রধান ধর্মগুলো সম্পর্কেও এ গ্রন্থে আলোচনা আছে। বুদ্ধ নানা সময়ে, নানা উক্তিতে ও বিশে-ষণে তাঁর ধর্মমত ব্যাখ্যা করেছেন। ত্রিপিটক পালি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বুদ্ধ বলেছেন- 'কর্মের মধ্যেই মানুষের পরিচয়। কর্মই বড়।' বুদ্ধ তাঁর এই নবধর্ম প্রচার করলেন সেই পঞ্চ শিষ্যদের, একদিন যারা বিমুখ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। সেই পাঁচজন শিষ্য আবার তাঁর ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। এই পাঁচজন শিষ্য হলেন- কৌন্ডিন্য, বপ্প, ভদ্দিয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ।

এরা পাঁচজনেই তিন বার এইভাবে শপথ নিলেন- "আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। আমি ধর্মের শরণ নিলাম। আমি সংঘের শরণ নিলাম।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

ধর্মং শরণং গচ্ছামি।

সংঘং শরণং গচ্ছামি।

দেখতে দেখতে বুদ্ধের নাম ছড়িয়ে পড়ল কাশীতে। দলে দলে লোক আসতে লাগলো। এমনি করে অল্পদিনের মধ্যে বুদ্ধের শিষ্যের সংখ্যা অনেক

বেড়ে গেল। এরপর বুদ্ধের নির্দেশে শিষ্যরা বেরুলেন ধর্ম প্রচার করতে। বুদ্ধদেব নিজেও বেরুলেন। উরুবিল্বের পথ দিয়ে তিনি এলেন রাজগৃহে। রাজা বিম্বিসার শুনলেন সন্যাসী গৌতম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বুদ্ধ হয়েছেন। তিনি তখন তাঁর শিষ্য হলেন। তিনি 'বেনুবন' নামে একটা বাগান বুদ্ধকে দান করলেন এবং এখানে ভিক্ষুদের থাকার জন্যে একটা বিহার তৈরী করিয়ে দিলেন। এর নাম রাখা হলো বেনুবন আরাম। এরপর বুদ্ধদেব যখনই রাজগৃহে আসতেন, ভিক্ষুদের নিয়ে তিনি বিম্বিসারের বেনুবন আরামেই থাকতেন। রাজগৃহ থেকে বুদ্ধ কপিলাবস্তু অভিমুখে রওনা হন। কপিলাবস্তুতে পিতা রাজা শুদ্ধোদনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং স্ত্রী গোপাদেবীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়। বুদ্ধ গোপাদেবীকে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন এবং রাহুলকে অল্প বয়সে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা দেন। রাহুল শ্রমণ হন।

কপিলাবস্তুতে কিছুদিন থেকে বুদ্ধ শ্রাবস্তী অভিমুখে অগ্রসর হন। সেখানে অনাথ পিন্ড নামে শ্রেষ্ঠীর দেওয়া জেতবন বিহারে অবস্থান করে ধর্ম প্রচার করেন। কপিলাবস্তু থেকে ফিরে রাজগৃহ ও শ্রাবস্তী ঘুরে বুদ্ধ যখন বৈশালী পৌঁছেন তখন খবর আসে তাঁর বাবার অসুখের। এর মধ্যে কয়েক বৎসর পার হয়ে গেছে। বুদ্ধ ফিরে আসেন কপিলাবস্তু। এ সময় তার বাবা মারা যান। মৃত্যুকালে পিতা শুদ্ধোদনের বয়স ছিল ৯৭ বৎসর।

বুদ্ধ পিতার মরদেহ সৎকার শেষে আবার মহাবনের কূটাগার বিহারে ফিরে আসেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা রাণী গৌতমী সন্ন্যাসিনী হবেন ঠিক করেন। তিনি গোপাদেবী ও অন্যান্য মহিলাসহ সন্ন্যাসিনীর বেশে বুদ্ধের কাছে আসেন। বুদ্ধ তাদের জন্য ভিক্ষুণী সংঘ স্থাপন করেন।

বুদ্ধত্ব লাভের পরের বছরগুলোয় বর্ষা ঋতুর তিন মাস ছাড়া বুদ্ধ বছরের বাকী সময়ে নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে ধর্মোপদশে দিতেন। এই তিন মাস ভিক্ষুরা একটি বিহারে অবস্থান করেন। সারাদিন কাজ উপলক্ষ্যে অন্য কোথাও গেলেও রাতে তারা বিহারে ফিরে আসতেন। এখনো এই নিয়ম মেনে চলা হয়।

বুদ্ধ প্রতিদিন খুব ভোরে সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে উঠতেন। নিজের কাজ সেরে ধ্যানে বসতেন। তারপর নিজ আবাসস্থলের আশেপাশে ভ্রমণ করতেন। ফিরে এসে শিষ্যদের উপদেশ দিতেন। এরপর ভিক্ষাপাত্র হাতে কাছাকাছি লোকালয়ে উপস্থিত হতেন। সাধারণতঃ দৃষ্টি তাঁর মাটির দিকে

থাকত। মাঝে মাঝে একা আবার কখনও শিষ্য নিয়ে বেরুতেন। একা থাকলে গৃহস্তরা ঘরে ডেকে তাঁকে খেতে দিতেন। আর যখন দলে চলতেন তখন সবার ভিক্ষা ভাগ করে খেতেন। সূর্য মাঝ আকাশে পৌছার আগেই আহার সারতে হত।

যে বাড়ীতে বুদ্ধ খেতেন সেখানে অনেকেই এসে ভীড় করতেন। বুদ্ধ এই সব গৃহীমানুষদের বিভিন্ন কথার জবাব দিতেন, এবং তাদের উপদেশ দিতেন।

এই খাওয়াই দিনের শেষ খাওয়া। এরপর মাঝে- মধ্যে ফলমূল সরবত ইত্যাদি খেতেন। বুদ্ধ বরাবর অল্প খাবার এবং সাধারণ খাবার খেতেন। খাওয়ার পরে ঘরে কিংবা গাছতলায় তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। এর মধ্যে শিষ্যরা এসে জমায়েত হত। বুদ্ধ বিশ্রাম শেষে এদের সাথে ধর্মের নানা দিক নিয়ে আলাপ করতেন। ব্যক্তিগত খোঁজখবর ও নিতেন।

বুদ্ধ সব সময় নিজের কাজ নিজে করেছেন। কাপড় কেঁচেছেন, বাসন ধুয়েছেন। তবে ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর শিষ্য আনন্দ তাঁর কিছু কাজ করে দিতেন।

সারাদিনের কাজ শেষে বুদ্ধ প্রায়ই সন্ধ্যায় আরেকবার স্নান করতেন। তারপর চলত ধর্মবিষয়ে সঙ্গীদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া। এভাবে ধর্ম নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে কেটে যেত রাত্রির প্রথম প্রহর। তারপর একাকী পায়চারী করতে করতে নয়ত ধ্যানে বসে কাটত রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর। এরপর কিছুক্ষণ নিদ্রা। তারপর আবার ভোর হতেই একই নিয়মে চলতো সব কিছু।

বুদ্ধত্ব লাভের পর তাঁর নিজের ঘর বলতে কিছুই ছিল না। সব সময় খালি পায়ে হেঁটেছেন তিনি। এক একদিন ১০ থেকে ১৫ মাইল পর্যন্ত হাঁটতেন। কখনও ঘোড়া বা অন্যকোনো যানবাহন ব্যবহার করেননি। বছরে শুধু বর্ষার চার মাস নির্দিষ্ট জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাঁর বাণী শুনিয়েছেন। সংঘ বড় করেছেন এবং মানুষকে নতুন এক ধর্মে দীক্ষিত করেছেন।

প্রথম দিকে বিম্বিসার, অশোক, প্রসেনজিতের মত শক্তিধর সম্রাটদের সমর্থন পাওয়ায় বুদ্ধের পক্ষে তার শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া সহজ হয়।

মথুরার বুদ্ধ মুর্ত্তি

সম্রাট অশোক এর সময়ে মগধ ও কোশলকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে বৌদ্ধ মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর- পশ্চিম ভারতে তখন বেশ কিছু ছোট বড় গ্রীক নৃপতির বাস ছিল। রাজা মিনান্দার সহ বেশ কিছু গ্রীক এ সময় বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নেন এবং এর প্রসারের কাজে সাহায্য করেন। ১ম শতাব্দী নাগাদ সম্রাট কনিস্কের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম আফগানিস্তান ব্যাকট্রিয়া (ইরানের কাছে), কাশগড়, খোটান ও কাশ্মীর পর্যন্ত প্রসার লাভ করে। এই ধর্ম ক্রমশঃ মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং ১ম ও ২য় শতাব্দী নাগাদ চীনে পৌছে যায়। সম্রাট অশোকের সময় শ্রীলংকা ও দক্ষিণ পূর্ব- এশিয়ায় প্রচারক পাঠানো হয়। এদের কাছে বর্মা কাম্পুচিয়া লাওস ও থাইল্যাণ্ডবাসীরা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেয়। তৃতীয় ও ষষ্ঠ শতকে জাভা ও সুমাত্রা পর্যন্ত বুদ্ধের শিক্ষা ছড়িয়ে যায়। ৭ম শতকের মধ্যে কোরিয়া, জাপান, মঙ্গোলিয়া ও তিব্বতে এই ধর্ম পৌছে যায়। এবার তোমাদের গৌতম বুদ্ধের কয়েকটি গল্প বলি। তবে এগুলো কিন্তু শুধু গল্প নয়। সত্য ঘটনা। শোনো তা হলে-

বৈশালীতে এক ধনী বাস করতেন। তার স্ত্রীর নাম কৃশা গৌতমী। তাদের একটি মাত্র ছেলে ছিল। একদিন ছেলেটি মারা যায়। ছেলের মৃত্যুতে তার মা- তো পাগলের মতো হয়ে গেলেন। মরা ছেলেকে বুকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। তার কেবলি মনে হলো ছেলে মরেনি। ঘুমিয়ে আছে। তাই যাকেই দেখে, তার কাছেই ঔষুধ চায়। সবার এক কথা- "ছেলেটি তো মারা গেছে। ঔষুধে কি হবে?"

অবশেষে এক ভিক্ষু কৃশার এ কাতর অনুরোধ শুনে বললেন, "তোমার ছেলের জন্যে আমি কোনো ওষুধ দিতে পারব না। তবে আমি একজনকে জানি, যিনি ওষুধ দিতে পারেন।" এই বলে ভিক্ষুটি কৃপাকে সঙ্গে করে বুদ্ধের কাছে নিয়ে এল। বুদ্ধদেব বুঝলেন। পুত্রশোকে মেয়েটি তার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। এখন তাকে কোনো উপদেশ দিলে ফল হবে না। তিনি তখন কৃশা বললেন- তুমি এক মুঠো সরষে এনে দাও। তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দেব। কৃশা বললো এ আর এমন কঠিন কি কাজ। আমি এক্ষুণি আনছি। বুদ্ধ তখন বললেন, দেখ, এমন বাড়ি থেকে সরষে আনবে, যে বাড়িতে কখনো কেউ মরেনি। কৃশা তখন বললো- এইবা এমন কঠিন কি কাজ। আমি এক্ষুণি আনছি।

এই বলে মরা ছেলেকে বুকে নিয়ে কৃশা আবার নগরে গেল। যে বাড়িতে সরষে চায়, তারা দেয়। কিন্তু যেই কৃশা জিজ্ঞাসা করে তাদের বাড়িতে কেউ কখনো মরেছে কিনা, অমনি তারা উত্তর দেয়, কত লোক মরেছে, তার হিসেবে আছে? এ দুঃখের কথা আর বলো না। সরষে আর নেওয়া হয় না। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে দিন শেষ হয়ে গেল। কৃশা এমন একটা বাড়িও পেল না, যেখানে কোনো দিন কেউ মরেনি। নগরীর ঘরে ঘরে জ্বলে উঠলো সন্ধ্যা প্রদীপ। কৃশার মনেও জ্বলে উঠল জ্ঞানের আলো। এতক্ষণে সে বুঝতে পারলো যে, পৃথিবীতে জন্মের মত মৃত্যু ও সত্য। শুধু মানুষ কেন, সকল প্রাণীকেই একদিন না একদিন মৃত্যুবরণ করতেই হবে।

ধীর শান্ত মনে কৃশা নদীর ধারে গেল। মৃত পুত্রের সৎকার করলো। তারপর ফিরে এল বুদ্ধের কাছে। বুদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন- "সরষে এনেছো মা?

কৃশার মুখে কোন কথা নেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

বুদ্ধ দেখলেন, কৃশার কোলে তার মৃত ছেলেটি আর নেই। তিনি সব বুঝতে পারলেন। তারপর বললেন- "সংসারে দুঃখই সত্য। এ পৃথিবী দু'দন্ডের খেলাঘর। জন্মালেই মৃত্যু আছে। এই - ই পৃথিবীর নিয়ম।"

বুদ্ধের এই কথাশুনে কৃশার মন শান্ত হলো। সে তখন বুদ্ধের শরণ নিলো। ভিক্ষুণীদের মধ্যে এই কৃশা গৌতমী খুব খ্যাতি লাভ করেছিল।

আর একটি কাহিনী শোন। কোশল রাজ্যের গভীর বনে অঙ্গুলী মাল নামে এক দুধর্ষ ডাকাত ছিল। তার নাম শুনলেই সবাই ভয়ে কাঁপতো। সে এমনই নৃশংস ছিল যে, যত লোককে সে মারত, তাদের প্রত্যেকের হাত থেকে

সে আঙ্গুলগুলো কেটে ফেলতো। আর সেই কাটা আঙ্গুল দিয়ে মালা করে সে গলায় পরত। তাই লোকে তার নাম দিয়েছিল অঙ্গুলী মাল।

কোশেলের রাজা প্রসেনজিৎ শত চেষ্টা করেও দস্যু অঙ্গুলীমালকে ধরতে পারেননি।

একদিন বুদ্ধ একাকী চলছেন সেই গভীর বনের মধ্য দিয়ে। হঠাৎ দূর থেকে হুংকার দিয়ে উঠলো অঙ্গুলীমাল- 'থামো!' বুদ্ধ থামলেন না। বললেন- 'আমি তো থেমেই আছি। তুমিই বরং থামো।'

অঙ্গুলীমাল তো এই কথা শুনে অবাক। তার ভাঁটার মত চোখ দুটো যেন আগুনের মত জ্বলছে। গলায় দুলছে মানুষের হাতের আঙ্গুলের তৈরী মালা। তার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ যে কথা বলতে পারে, তা সে ভাবতেই পারেনি। সে হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলো- এর মানে কি?

বুদ্ধ বললেন, মানে হচ্ছে আমি আমার অহিংসাধর্মে স্থির আছি। তুমিই বরং তোমার হিংসায় অস্থির রয়েছ। তাই তোমাকে থামতে বলছি।

অঙ্গুলিমাল বুদ্ধের জ্যোর্তিময় প্রশান্ত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বিহবল হয়ে পড়লো। হাত কাঁপতে লাগলো। কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল হাতের তরবারি। সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে লুটিয়ে পড়লো বুদ্ধের পদতলে।

বুদ্ধ তাকে আশীর্বাদ করলেন। অঙ্গুলীমাল দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে হয়ে গেল বুদ্ধের শিষ্য।

বুদ্ধদেবের পুত্র রাহুল ও ভিক্ষু হয়েছে। কিন্তু সে ঠিক ভিক্ষুর মতো জীবন- যাপন করত না। তখন বুদ্ধ তার ছেলেকে এই গল্পটা বললেন-

এক দেশে এক রাজা ছিল। তাঁর ছিল একটা হাতী। যেমন বিরাট ছিল হাতিটা, তেমনি অগাধ শক্তি ছিল। রাজা যখন যুদ্ধে যেতেন, তখন ঐ হাতিটাকে নানারকম অস্ত্রে সাজিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কিন্তু হাতীর সবচেয়ে দুর্বল স্থান হলো তার শুঁড়। শুঁড়ে যদি সে কোন রকম আঘাত পায় তা'হলে তার মৃত্যু অবধারিত। তাই হাতীর মাহুত তাকে সব সময়ে শুঁড় গুটিয়ে থাকতে শিখিয়েছিল। একদিন হাতীটা মাহুতের শিক্ষা ভুলে গিয়ে তরবারী ধরবার জন্যে তাঁর শুঁড়টা বাড়িয়ে দিল। সেই থেকে রাজা হাতীটাকে আর যুদ্ধে নিয়ে যেতেন না। গল্পটি বলে বুদ্ধ বললেন, বুঝলে রাহুল যুদ্ধের হাতীর মত তুমি সব সময়ে নিজেকে বাঁচিয়ে চলবে। ধর্মে ও সত্যে সবসময় দৃঢ় ও একনিষ্ঠ থাকবে।

তা'হলেই তোমার ভিক্ষু হওয়া সার্থক।

বুদ্ধদেব শুধু যে ধর্ম প্রচার করতেন, তা নয়। কোথাও কোন অশান্তির সম্ভাবনা দেখলে তা মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। একবার একটি বাঁধকে নিয়ে দুই রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বাধবার উপক্রম হলো। এক রাজা দাবী করলো বাঁধটা তার রাজ্যের এলাকার মধ্যে। অন্যজন বললো, না বাঁধটা তার এলাকার মধ্যে।

দুই রাজা তখন সৈন্য সামন্ত সাজিয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলো। ভিক্ষুরা এই খবর নিয়ে বুদ্ধের কাছে গেল। বুদ্ধ তখন দুই রাজাকেই ডেকে পাঠালেন। দু'জনেরই অভিযোগ শুনলেন। তারপর বলে-ন- "আচ্ছা বল তো বাঁধটা কি জন্যে দরকার?"

দুই রাজাই উত্তর দিল- প্রজাদের মঙ্গলের জন্য।

বুদ্ধ বললেন- কোন্ রাজ্যের প্রজা? একজন বললো- আমার রাজ্যের, আরেকজন বললো- আমার রাজ্যের। বুদ্ধদেব বললেন- 'তাহলে প্রজাদের মঙ্গল ছাড়া বাঁধের আর কোনো দাম নেই।

দু'জনেই বললেন- না তা নেই। তখন বুদ্ধদেব বললেন- 'তোমরা যুদ্ধ করলে নিশ্চয়ই তোমাদের অনেক প্রজা মারা যাবে, এমনকি তোমরাও মারা যেতে পার। দুই রাজাই বললো, হ্যাঁ, আমাদের অনেক প্রজা মারা যাবে এবং আমরাও মারা যেতে পারি।

বুদ্ধদেব বললেন, তা'হলে ভেবে দেখ মানুষের দাম কি মাটির দামের চেয়েও কম?

দুই রাজাই বললো- না, মানুষের জীবনের অনেক দাম। এটা অমূল্য।

বুদ্ধদেব বললেন- তা'হলে যার কোন দাম নেই, সেই বাঁধের জন্যে তোমরা তোমাদের অমূল্য জীবন বিপন্ন করতে চাও?

দুই রাজার কারও মুখেই কোন কথা নেই। তাদের সব রাগ দূর হয়ে গেল। তারা পরস্পর শান্তি স্থাপন করলো এবং ভগবান বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর ধর্মের আশ্রয় নিলো।

এইভাবে বুদ্ধের হৃদয়ের কল্যাণধারা দেশে দেশে ছড়িয়ে গেল। দেখতে দেখতে তার বয়স হয়ে গেল আশী। প্রায় পঁয়তালি-শ বছর ধরে তিনি দেশে দেশে ধর্ম প্রচার করে বেড়িয়েছেন। সে সময় বুদ্ধদেব বৈশালীতে ছিলেন। বর্ষাকাল শুরু

হতেই তিনি বৈশালীর কাছে বেলুব গ্রামে এক বিহারে চলে গেলেন। এখানে থাকার সময় তাঁর খুব অসুখ হলো। আনন্দ তাঁর সেবা করছিলেন। বুদ্ধের অবস্থা দেখে সবার মনে আশংকা জাগে। তাই এক সময় আনন্দ তার কাছে জানতে চান, তাঁর পরে কে হবেন সংঘনায়ক।

বুদ্ধ বললেনঃ- প্রত্যেকে নিজের কাছে নিজে প্রদীপ হয়ে ওঠো। নিজের উপর নির্ভর করো। নিজেকে আশ্রয় করো ও ধর্মকেই শরণ লও।

এ সময় বুদ্ধ আরো অনেক উপদেশ দেন। তিনি বলেন- মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা। শুধু প্রার্থনা দ্বারা কিছু হয় না। মানুষের যা দরকার, তার নাম উদ্যম। উদয়াস্ত পরিশ্রম মানুষের জীবন। বেঁচে থাকতে হলে সৎকর্মই প্রধান সম্বল। তাঁর আসন্ন মৃত্যুকে সহজভাবে নেওয়ার জন্য তিনি বলে-ন- যে জিনিসের উৎপত্তি আছে, তার বিনাশ ও আছে। কাজেই আর শোক কেন?

রোগের প্রাথমিক ধকল কাটিয়ে ওঠেন তিনি। একটু ভালো হতেই তিনি আবার বেরিয়ে পড়েন পথে। কিছুদূর হেঁটে পৌঁছেন পাবায়। এখানে কামার চন্দের বাড়িতে অতিথি হন তিনি। এখানে থেকে তিনি কপিলাবস্তুর দিকে রওনা হন। পথে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তখন আনন্দকে তিনি বলে-ন, 'কুশীনগর চলো।'

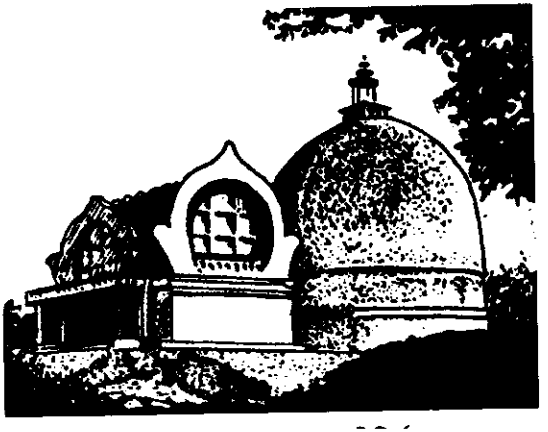

কুশীনগরের মন্দির ঃ বুদ্ধের মহাপরিবির্বাসের স্থান

বুদ্ধ যেন তাঁর মৃত্যুর সময় বুঝতে পারছিলেন। কুশীনগরে লুম্বিনীর শালবনে এসে দুটো শালগাছের মাঝখানে তিনি তাঁর শয্যা পাততে বলে-ন। আশি বৎসর আগে লুম্বিনীর এই শালবনে শালগাছের নীচে বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে তাঁর জন্ম হয়। ডান কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। শিয়র ছিল উত্তরে। সুভদ্র নামের এক সন্ন্যাসী শেষ মূহুর্তে এসে তাঁর কাছে দীক্ষা নেন! তিনিই বুদ্ধের শেষ শিষ্য।

ধীরে ধীরে রাত নামলো। বুদ্ধের মরণাপন্ন অবস্থার খবর ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। সবাই ছুটে এল শালবনের দিকে।

সবার উদ্দেশ্যে বুদ্ধ জীবনের শেষ বাণী দেনঃ-যা কিছু জন্মায়, তারই মৃত্যু আছে। নিজের মুক্তির জন্যে কাজ কর। জীবন- সংগ্রামে কখনও থেমে যেও না।

পূর্ণিমা রাত। বৈশাখী পূর্ণিমা। গাছে গাছে ফুটে আছে ফুল। বাতাসে তারই সুবাস। কিসের যেন জৌলুস, মহাকাশের যেন কার জন্যে প্রতীক্ষা। রাত আরও গভীর হলো, চোখ মুদলেন বুদ্ধ। পাড়ি জমালেন পরকালের পথে, খ্রীস্টপূর্ব ৪৮৬ অব্দে।

বুদ্ধের মৃত্যুর বছর থেকে তাঁর নামে যে সালের গণনা প্রচলিত, তার নাম বুদ্ধাব্দ। বৈশাখী পূর্ণিমা থেকে বুদ্ধাব্দ গণনা করা হয়।

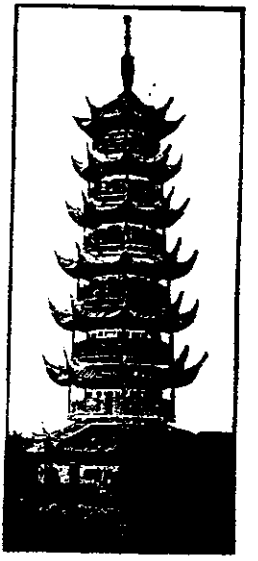

গাং হুয়া প্যাগোডা- সাংহাই

বৌদ্ধদের কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

(১) বৈশাখী পূর্ণিমা- সিদ্ধার্থের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও পরলোক গমণ।

(২) জ্যৈষ্ট পূর্ণিমা ঃ শ্রাবস্তীতে বুদ্ধ কর্তৃক ধর্ম প্রচার, মহিন্দ্র স্থবিরের সিংহল দ্বীপে প্রথম ধর্ম প্রচার।

(৩) আষাঢ়ী পূর্ণিমা ঃ মাতৃ জঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ, গৃহত্যাগ ও ধর্মচক্র প্রবর্তন এবং ভিক্ষুগণের বর্ষাব্রত আরম্ভ।

(৪) ভাদ্র পূর্ণিমা বা মধু পূর্ণিমাঃ বানর কর্তৃক বুদ্ধকে মধু দান।

(৫) আশ্বিনি পূর্ণিমা ঃ ভিক্ষুগণের ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত সমাপ্ত ও কঠিনচীবর (রং বস্ত্র বা পোষাক) দান আরম্ভ।

(৬) কাত্তিকী পূর্ণিমা ঃ কঠিন চীবের (বস্ত্র বা পোষাক) দানোৎসব সমাপ্ত।

(৭) মঘী পূর্ণিমা ঃ বুদ্ধের আয়ু সংস্কার বর্জন ও মহা পরিনির্বান দিন ঘোষণা।

(৮) ফাল্গুনী পূর্ণিমা ঃ কপিলা বস্তুতে জ্ঞাতি দর্শন। তাই এই পূর্ণিমাকে মিলন পূর্ণিমা বলা হয়।

হিন্দু ধর্ম

হিন্দু ধর্মের এক মহাপুরুষ

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

, প্রত্যেক ধর্মের মূলে থাকে একজন মহাপুরুষ। যেমন ইসলাম ধর্মে হযরত মুহম্মদ (দঃ), খ্রীষ্টধর্মে যীশু খ্রীষ্ট, বৌদ্ধ ধর্মে গৌতম বুদ্ধ, শিখ ধর্মে গুরু নানক ইত্যাদি। কিন্তু হিন্দু এবং ইহুদী ধর্মের কোন প্রবর্তক নেই। হিন্দুরা বলেন, এটার প্রবর্তন কোনও ব্যক্তিবিশেষ করেন নাই। এটা চিরকালের। এজন্যে হিন্দুধর্মকে বলা হয় 'সনাতন ধর্ম'। সনাতন কথাটার অর্থ হলো চিরকালের।

তবে হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, যখনই জগতে ধর্মের গ-ানি ও অধর্মের প্রসার হয় তখন সাধুদের পরিত্রান আর দূরাত্মাদের শাসন করার জন্য স্বয়ং ভগবান দেহধারন করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

তাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋষি, মুনি যা যা বলে গেছেন তা সব নিয়েই হিন্দুধর্ম। অর্থাৎ হিন্দুধর্ম কোন একটা ধর্ম নয়, অনেকগুলো ধর্মের সমষ্টি। এর কোন একজন বিশেষ প্রবক্তা নেই। এককালে এটা ছিল একটা দেশের ধর্ম। যে বহু দেবতা মানে সেও হিন্দু। যে এক ঈশ্বর মানে সেও হিন্দু। আর যে মানে না সেও হিন্দু হয়ে থাকতে পারে জন্ম সূত্রে হিন্দু হলে। তবে সবচেয়ে মজার কথা 'হিন্দু' নামটা কিন্তু এসেছে ভীনদেশীদের কাছ থেকে।

মধ্য এশিয়ায় এক সময়ে বাস করত এক জাতের মানুষ। তারা নানা কারণে নানা সময়ে দলে দলে সে দেশটা ছেড়ে আসতে থাকে। তার মধ্যে কতকগুলি দল চলে এল এ দেশে। নিজেদের তারা বলত 'আর্য'। আর এদেশের যে সব জায়গায় তারা বাস করত সে সব জায়গার নাম দিল 'আর্যাবর্ত'। ভারতবর্ষ নামটা কিন্তু হয়েছে আরো পরে। আর্যাবর্ত হল সিন্ধু নদের পূর্বের দেশ। আর ওপারের দেশের নাম হল পারস্য। সিন্ধু পার হয়ে সে দেশে যেতে হয়। এদিকে সেখানেও অনেক দল এসেছিল মধ্য এশিয়া থেকে। তারা 'স' কে বলত 'হ'। 'সিন্ধু' কে ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারতো

না। 'সিন্ধু'কে বলতো' হিন্দু'। আর তারাই এই আর্যদের নাম দিল হিন্দু। এভাবেই হলো 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি। কাজেই বুঝতে পারছো, হিন্দু শব্দ এদেশীয় শব্দ নয়। এই হিন্দুরা যে ধর্ম মানে তাকেই বলা হয় হিন্দুধর্ম। এক এক মহাপুরুষ এক এক রকম ব্যবস্থা করে গিয়েছেন হিন্দুধর্মে। তারা কে কি বলে গেছেন সে সব পাওয়া যায় তাঁদের বিভিন্ন বই থেকে। আর সে সব বইকেই বলে ধর্মশাস্ত্র বা শাস্ত্র।

হিন্দুদের প্রথম শাস্ত্র হলো 'বেদ'। এটা হিন্দুদের প্রাচীনতম ও সবচেয়ে প্রমাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থ। বেদকে পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য ও বলা হয়। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। বেদ বলতে অনেকগুলো বইকে একসঙ্গে বোঝায়। বই গুলি বিভিন্ন সময়ের। হিন্দুদের মতে, সেগুলি মানুষের লেখা নয়- দেবতাদের কাছ থেকে পাওয়া কথা। যারা পেয়েছিলেন তাদের বলা হয় 'ঋষি'। ঋষিরা তাদের শিষ্যদের সে সব কথা মুখে মুখে বলতেন। শিষ্যরা আবার তাঁদের শিষ্যদের ও ঐ ভাবে বলে যেতেন। মুখে মুখে কেন বলে যেতেন জানো? তখন ও লেখার চল হয়নি যে!

এইভাবে গুরুর কাছ থেকে শুনে শুনে শিখতে হত বলে বেদের আর এক নাম 'শ্রুতি'।

এ-ভাবে চলে গেল অনেক অনেক দিন। এরপর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ সমস্ত কথাগুলো সংগ্রহ করে সেগুলিকে ভাগ করে সাজিয়ে দেন। এই জন্যে তাঁর নাম হয় দেবব্যাস বা ব্যাস। ভাগটা তিনি করেছিলেন এই ভাবে- সব পদ্য ঋগ্‌বেদ। সব গান সামবেদ। সব গদ্য যজুর্বেদ।

এরপর অর্থবা ঋষি আরও কিছু বেদ সংগ্রহ করেন। সেগুলোর নাম হলো অর্থববেদ। তা'হলে বেদের সংখ্যা কতোগুলো হলো বলোতো?- হ্যাঁ, চারটি।

(১) ঋগ্‌বেদ, (২) সামবেদ, (৩) যজুর্বেদ আর (৪) অথর্ববেদ।

প্রত্যেক বেদের আবার চারটি বিভাগ (১) সংহিতা (২) ব্রাহ্মণ, (৩) আরন্যক ও (৪) উপনিষদ। সংহিতা পদ্যবন্ধ দেবতার শ্রুতি রূপ মন্ত্র। ব্রাহ্মণ ভাগে আছে এগুলি যজ্ঞের প্রয়োগবিধির কথা। তা'হলে সংহিতা আর ব্রাহ্মণ ভাগ হলো বেদের কর্মকান্ড, অর্থাৎ যাগযজ্ঞ বিষয়ক। যজ্ঞ কাকে বলে জানো তো?

বৈদিক যুগে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে এক একটি দেবতা ভেবে নিয়ে

তাদের পূজা করা হতো। বেদে তাই ইন্দ, অগ্নি, বায়ু, সূর্য, ইত্যাদি ৩৩টি দেবতার কথা পাওয়া যায়। এঁদের পূজার যা ব্যবস্থা আছে, তাকে বলে যজ্ঞ। যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মন্ত্র পড়ে ঘি ইত্যাদি আগুনে দেওয়া।

তোমরা হয়তো ভাবছো, আগুনে কেন? হ্যা অগ্নি হচ্ছে সমস্ত দেবতার প্রতিনিধি। তাঁকে কিছু দিলে তিনি তা বহন করে নিয়ে যাবে দেবতাদের কাছে। তাই অগ্নির আর এক নাম বহ্নি। ঋগ্‌বেদের প্রথম মন্ত্রটিই অগ্নিকে নিয়ে- "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্। যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতম্।

দেবতাদের পূজার নানা রকম খুঁটিনাটি ব্যবস্থা আছে বেদের বিভিন্ন অংশে। সেই অংশগুলোকে বলা হয় 'ব্রাহ্মণ'। এ- ছাড়াও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আছে নানা উপাখ্যান, মহাপ্রলয়, রাজনীতি প্রভৃতি।

তবে দেবতাদের ছাড়া অন্য পূজার ব্যবস্থা ও আছে বেদের মধ্যে। এটা হলো পিতৃপুরুষদের পূজা- যাকে বলা হয় শ্রাদ্ধ।

বেদের কতকগুলো অংশকে বলে 'আরণ্যক'। অরণ্যে এর উৎপত্তি বলে এই নামকরণ। সময়বহুল, ব্যয়বহুল কষ্টসাধ্য যাগযজ্ঞের বদলে মানুষ অরণ্যে গিয়ে ধ্যান ধারনায় মন দিল।

ইতিহাসের অগ্রগতির সাথে সাথে বৈদিক যুগের লোকেদের চিন্তাজগতে এল এক নতুন ধর্মভাবনা। বহু দেবভাবনা পরিবর্তিত হল একেশ্বরবাদে। ভগবান এক ও তিনি নিরাকার, যদিও বহুরূপে তাঁর প্রকাশ। বেদের যে অংশে এই নিরাকার ও একমাত্র ভগবানের কথা আছে সেগুলোকে বলে উপনিষ্যৎ।

উপনিষদের আর এক নাম 'বেদান্ত' অর্থাৎ বেদের শেষ কথা। বেদের সার। আর সেই একমাত্র ভগবানকে উপনিষদে বলেছে 'ব্রহ্ম' যিনি বিরাট সর্বব্যাপী। সব শক্তির আধার। ব্রহ্মই সব। তিনি ছাড়া আর কিছু নেই।

ইসলাম ধর্মে ও আছে, এক আল্লাহ্ - অসংখ্য ফেরেস্তা। এক এক ফেরেস্তার এক এক কাজ। তারা আল্লাহর নির্দেশ - হুকুম পালন করেন। আল্লাহর এবাদত করেন।

আসলে সকলের ওপরে আছেন শুধু একজন। তিনিই ব্রহ্ম। সব শক্তিই তাঁর। সেই শক্তি তিনি নানা আকারে প্রকাশ করেন। তাদের বলা হয় দেবতা। কিন্তু তাদের নিজস্ব কিছু নেই। সবই ব্রহ্মের।

এই কথাটি উপনিষদে একটি গল্পের মাধ্যমে সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুনবে গল্পটি?

সুর আর অসুরদের মধ্যে অর্থাৎ দেবতা আর দৈত্যদের মধ্যে চিরকালের শত্রুতা। একবার যুদ্ধে অসুরদের হারিয়ে দিয়ে দেবতাদের মনে বেশ অহংকার হলো। কিন্তু তাঁরা বুঝলেন না যে, সবই হয়েছে ব্রহ্মের শক্তিতে। তাদের সেই অহংকার দূর করার জন্যে ব্রহ্ম তাঁদের সামনে এলেন। ব্রহ্মকে দেখা যায় না। দেবতারাও তাঁকে দেখতে পেলেন না। তাঁরা ভাবতে লাগলেন 'ইনি- কে?'

নিজেদের মধ্যে ঠিক করতে না পেরে শেষে তারা অগ্নিকে বললেন- যাও তো। জেনে এস- ইনি কে।

অগ্নি ব্রহ্মের কাছে এল। ব্রহ্ম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কি? তুমি কি করতে পার?'

অগ্নি বললেন, আমি অগ্নি। আমি সব কিছু পোড়াতে পারি।

অগ্নির সামনে এক টুকরো ঘাস রেখে ব্রহ্ম বললেন, 'এটাকে পোড়াও তো!'

অগ্নি এবার আর পোড়াতে পারলোনা। কেননা ব্রহ্ম তাঁকে পোড়াবার শক্তি দিলেন না। অগ্নি অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে গেলেন।

এবার এলেন বায়ূ। ব্রহ্ম তাঁকে কিছু ঘাস দিয়ে বললেন, এটাকে উড়িয়ে নাও তো। কিন্তু বায়ূর ও ঐ দশা হলো। ঘাসটিকে তিনি নাড়াতেও পারলেন না।

বায়ূও ফিরে গেল। এবার এলেন ইন্দ্র। ইন্দ্র আসতেই ব্রহ্ম অদৃশ্য হলেন। তখন এক দেবী এসে ইন্দ্রকে বললেন, 'যাকে জানতে এসেছ, তিনিই ব্রহ্ম। তারই শক্তিতে তোমরা যুদ্ধে জিতেছো।'

এইভাবে দেবতারা জানলেন যে, সব শক্তিই সেই ব্রহ্মের। তাঁদের ভিতর দিয়ে তা প্রকাশিত হয় মাত্র।

এইভাবে উপনিষদে গল্পের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এক ব্রহ্ম থাকলেও সেই সঙ্গে আবার অনেক দেবতা থাকে কি করে। এই গল্পটি আছে 'কেন উপনিষদে'।

এ- রকম আরও বিভিন্ন গল্প আছে অন্যান্য উপনিষদে। উপনিষদের যুগ পর্যন্তই বৈদিক যুগের সীমা। উপনিষদ অনেকগুলি। কেউ কেউ বলেন ১০৮টি।

তবে বেদের মধ্যে পাওয়া যায় মাত্র সাতটি উপনিষদ, ঈশাত কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়, কৌষীতকি, ছান্দোগ্য আর বৃহদারন্যক। এইগুলিই মূল বলে স্বীকৃত। এমনকি 'আলে-াপনিষৎ' বলে একটি উপনিষদ আছে। তাতে মুসলমান ধর্ম থেকে ভগবানের 'আল-া' নামটি নিয়ে তাঁর বিষয়ে লেখা হয়েছে। হিন্দুধর্ম এভাবে বাইরের অনেক কিছুকে আপন করে নিয়েছে। যেমন বুদ্ধকে ভগবানের দশ অবতারের মধ্যে টেনে নেওয়া হয়েছে।

কাজেই হিন্দুধর্ম কোন একটা ধর্ম নয়। অনেকগুলি ধর্মের সমষ্টি। হিন্দুদের সবচেয়ে পুরনো ও আদি ধর্ম বলতে বোঝায় বৈদিক আর্যধর্ম।

বেদোত্তর পৌরনিক যুগের ধর্ম যা থেকে দেব- দেবীর মূর্ত্তি পুজো ও আরাধনা শুরু হল সেটাই এখনকার হিন্দুধর্ম।

বস্তুত ঃ বৈদিক হিন্দু ধর্মের উপাসনা পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটল পৌরানিক হিন্দু ধর্মে, অবশ্য মূল ভাবধারাটা অক্ষুন্নই রইলো। তোমাদের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগছে, তা'হলে পৌরানিক যুগের শুরু কখন থেকে? হ্যাঁ সাধারনতঃ রামায়ন-মহাভারতের যুগ থেকেই পৌরানিক যুগের শুরু বলে মনে করা হয়। পুরান বলতে রামায়ণ, মহাভারত ছাড়াও অষ্টাদশ মহাপুরান ও উপপুরাণ আছে। যেমন মহাপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, ব্রহ্মাওবৈর্ব পুরাণ। ভাগবতপুরান প্রভৃতি। এ-ছাড়া কতকগুলো শাস্ত্র আছে। সেগুলিকে স্মৃতি শাস্ত্র বলে। এর মধ্যে মনুর লেখা সংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্যের লেখা সংহিতার নামই বেশী। এগুলি মধ্যে লেখা আছে ধর্ম ব্যাপারে সামাজিক রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, কর্তব্য ও অকর্তব্য, গার্হস্থ ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে। পুরাণগুলির মধ্যে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য অনেক বেশী।

তা'হলে তোমরা জেনেছো হিন্দু ধর্মানুযায়ী ঈশ্বর এক হলেও হিন্দুদের মধ্যে সাধারনতঃ অনেক দেব-দেবীর পূজাই প্রচলিত। হিন্দুদের প্রধান দেবতা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু- আর মহেশ্বর, অর্থাৎ মহাদেব বা শিব। আর দেবীদের মধ্যে কালী, দুর্গা, লক্ষী, সরস্বতী। হিন্দুরা মনে করেন ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন। বিষ্ণু তাকে পালন করেন। আর মহেশ্বর সব কিছুকে ধ্বংস করেন। হিন্দুধর্মে বলে যে, জগৎটা বার বার তৈরী হচ্ছে, আর ধ্বংস হচ্ছে। যেহেতু হিন্দু ধর্ম কোন একজন মহাপুরুষের কথার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সেহেতু এমন শাস্ত্রও হিন্দুধর্মে আছে যাতে ভগবানের কথা নেই। যেমন কপিলমুনির লেখা 'সাংখ্যসূত্র'। অথচ 'বেদান্তসূত্রে' বলে- ভগবান একনজই। 'গীতায়' ও তাই বলে। গীতার নাম তো তোমরা শুনেছো। এটা হিন্দুদের প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। এর পুরো নাম হচ্ছে 'শ্রীমদ্-

ভগবদগীতা'। এটা মূলতঃ মহাভারতের একটা অংশ। এতে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাই লেখা রয়েছে।

এদিকে 'পুরাণ' নামে যে সব শাস্ত্র আছে, তাতে অনেক দেবদেবীর কথা আছে। কোন কোন ও পুরানো এক এক জন দেবতাকে বড় করা হয়েছে। যেমন ভাগবত পুরাণে যার পুরো নাম 'শ্রীমদ্‌ভগবত' এ বিষ্ণুকে আর বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ দেবতা বলা হয়েছে। শিবপুরানে শিবকে শ্রেষ্ঠ দেবতা বলা হয়েছে। এইভাবে হিন্দুধর্মে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনার সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে পঞ্চ দেবোপাসনা প্রধান এবং উপাসকরা শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও সৌর বলে অভিহিত। তাই বুঝতেই পারছো, হিন্দুধর্মে সবারই উপাস্য দেবতা এক নয়। তবে মোটামুটি ভাবে এই পাঁচ দেবতাপ্রধান।

হিন্দুর দেবদেবী ঃ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র

বৈদিক হিন্দুধর্মের মূল ভাবধারা অক্ষুন্ন রেখে, উপাসনা পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটল পৌরানিক হিন্দুধর্মে। পৌরানিক দেবতারা বৈদিক দেবতার নামান্তর। যেমন বেদের রুদ্র পুরাণে হলেন শিব, মিত্র হলেন পুরাণে সূর্য (বেদেও সূর্য), পুরুষ সূক্তের পুরুষ হলেন পুরাণে বিষ্ণু, বেদের শ্রীসূক্তের শ্রী হলেন পুরাণে লক্ষী। হেমবতী উমা হলেন পুরানে চন্ডী। আরও বলি তোমাদের, শৈব উপাসনা

থেকে সৃষ্টি হল যোগী সম্প্রদায়ের, ভাগবত পুরান থেকে প্রসার লাভ করল ভগবত ধর্মের। তবে ভাগবত ধর্ম ও বৈষব ধর্মে কোন ভেদ নেই। বৈষ্ণব বলতে সাধারণত কৃষ্ণের উপাসকদের বোঝালেও যারা নারায়ন বা বিষ্ণুর উপাসক তাদেরকেও বোঝায়। যেমন বৈষ্ণবদের শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব লক্ষী নারায়ণের উপাসক। এটাই হলো মোটামুটি ভাবে হিন্দু ধর্মের বিবর্তিত রূপ এবং এইভাবে বৈদিক হিন্দুধর্মের মূল ভাবধারা বজায় রেখে লৌকিক হিন্দুধর্মের নতুন বিবর্তন ঘটল। সহজ কথায়, প্রাচীন বৈদিক ধর্ম সহজ সরল রূপে লৌকিক হিন্দুধর্মে রূপান্তর লাভ করেছে। বৈদিক ধর্ম দেখা যায় এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত ছিল, লৌকিক হিন্দুধর্ম সব গণ্ডি অতিক্রম করে সার্বজনীনতা লাভ করল। বহু সাধকের সাধনায় গৌরবোজ্জ্বল হলো হিন্দুধর্ম।

হিন্দুদের সব শাস্ত্রই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। হিন্দুধর্মে কপিল মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিঋষি ও পন্ডিতদের নাম বেশ প্রসিদ্ধ। তবে সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ ব্যাসদেব বা বেদব্যাসের। তিনি বেদগুলিকে চারটি ভাগে সাজান এবং মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরান রচনা করেন।

হিন্দুধর্মে মত ও পথ অনেক হলেও লক্ষ্য সবার এক। তাই কোন ও হিন্দু মহাপুরুষ ধর্ম সম্বন্ধে যা বলে গেছেন, শুধু তা মেনে চললেও হিন্দু হবে।

এসো, আজ আমরা হিন্দুধর্মের এক মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে কিছু জেনে নেই।

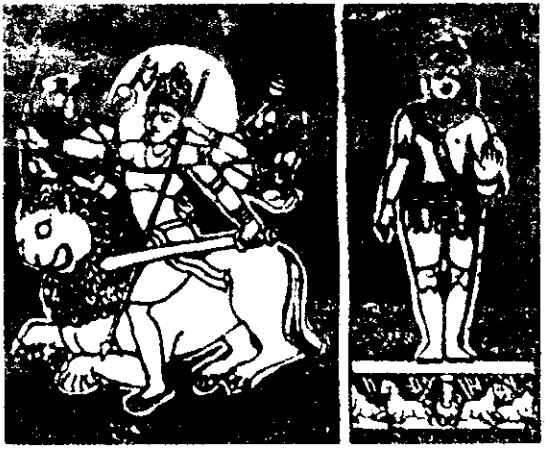

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

(১৮৩৬-১৮৮৬ খ্রীঃ)

কলকাতার অনতিদূরে হুগলী জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম কামারপুকুর। এই গ্রামে ১৮৩৬ খ্রীষ্টার ফেব্রুয়ারি মাসে, বাংলা ১২৪২ সালের ৬ই ফাগুন, বুধবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম।

রামকৃষ্ণের বাবা- মা দু'জনেই খুব ধার্মিক ছিলেন। রামকৃষ্ণের বাবার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মায়ের নাম চন্দ্রমনি। রামকৃষ্ণরা ছিলেন পাঁচ ভাইবোন। সবার বড় রামকুমার, তারপর বোন কাত্যায়নী, ভাই রামেশ্বর। তারপর রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের পর তার ছোট বোন, নাম সর্বমঙ্গলা।

রামকৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে একটি ছোট্ট কাহিনী আছে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে গয়াধামে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে পিন্ডদান করতে যেয়ে রামকৃষ্ণের বাবা ক্ষুদিরাম এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখলেন যে, গয়াধামের তীর্থ দেবতা গদাধর তাকে বলছেন, 'আমি শ্রীঘ্রই তোর ঘরে জন্ম নেব।'

এই ঘটনার পরেই রামকৃষ্ণেনর জন্ম। পিতা ক্ষুদিরাম তাই স্বপ্নের কথা মনে করে ছেলের নাম রাখলেন গদাধর চট্টোপাধ্যায়।

গদাধর পরম যত্নে লালিত- পালিত হতে লাগলেন। যেমন পিতা-মাতা তেমনি পাড়া- প্রতিবেশী, সবারই তিনি আদরের দুলাল। গদাধরের বয়স যখন

তিন বৎসর তখন তার একটি বোন জন্মগ্রহন করে। নাম সর্বমঙ্গলা।

গদাধর সবে মাত্র আধ আধ কথা বলতে শিখেছে। বাবা ক্ষুদিরাম তাকে কোলে করে নিজ পূর্ব পুরুষদের নামাবলী, দেব দেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তব, প্রণামাদি শুনাতেন। শিশু গদাধরের মেধা ও স্মরনশক্তি ছিল অদ্ভুত। বাবার মুখে মুখে শুনে খুব অল্প বয়সেই সেগুলি কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। তিনি যা একবার শিখতেন, তা আর ভুলতেন না। এইভাবে গদাই মুখে মুখে ছোটবেলাতেই অনেক কিছু শিখলেন বাবার কাছ থেকে। পাঁচ বৎসর বয়সে গদাধরকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করিয়ে দেওয়া হলো। বাড়ীর কাছে গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বিস্তৃত মন্ডপে পাঠশালা বসে। গদাধর পাঠশালায় আসা-যাওয়া করে। এ-সময় একটু দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। তিনি লেখাপড়ায় তার তেমন মন বসতো না। বিশেষ করে অংক তার একটুও ভাল লাগত না। তার ভাল লাগত যাত্রা, কথকতা, দেবদেবীর মুর্তি বানানো ও চিত্রাঙ্কনে। গ্রামে প্রায়ই কথকতা ও যাত্রাগান হত। বালক গদাই তা শুনে শুনে অনেক ভজনগান, শাস্ত্রোপাখ্যান ও যাত্রার পালা শিখে ফেলল। খুব মনোযোগ দিয়ে তিনি রামায়ন ও মহাভারত পড়তেন। অল্প দিনের মধ্যে গদাধর বুঝতে পারলেন যে, ছেলেরা পাঠশালায় যে সমস্ত কথা বইয়ে পড়ে তাতে সারবস্তু কিছুই নেই। সত্য বস্তুর সন্ধান বইয়ের মধ্যে নেই। ফলে লেখাপড়ার দিকে তাঁর তেমন টান দেখা যেত না।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে গদাধরের চরিত্রের অন্যান্য গুণাবলী প্রকাশ পেতে লাগল। এর মধ্যে প্রধানতঃ হলো ভয়শূন্যতা, আকর্ষনী শক্তি এবং তন্ময়তা। নির্জনে থাকতে তিনি খুব ভালবাসতেন। কোনরূপ ভয় ভীতি তার মনে ছিল না। যে বিষয়ে তিনি গো ধরতেন, ভয় দেখিয়ে তা থেকে তাঁকে নিরস্ত করা যেত না। গ্রামের ভিতরে এবং আশে পাশে যে সব জায়গা ভূতের জায়গা বলে পরিচিত ছিল, যেখানে বয়স্ক ব্যক্তিরাও যেতে সাহস পেতেন না সে সব জায়গায় গদাধর নিঃশঙ্কচিত্তে ঘুরে বেড়াতেন। শিশু অবস্থা থেকেই তার অপূর্ব মোহিনী শক্তিতে সকলেই তার প্রতি আকৃষ্ট হত। তাকে ভালবাসত। তিনি যখনই যে বিষয়ে আকৃষ্ট হতেন তাতে একবারে লীন হয়ে যেতেন। ফলে মাঝে মাঝে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন।

তাঁর শৈশবের তেমনি একটি ঘটনার কথা শোন। তখন তার বয়স ছয় কি সাত বৎসর। জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাস। কয়েকজন খেলার সাথীর সাথে কোঁচ থেকে মুড়ি খেতে খেতে তিনি ধানক্ষেতের আল দিয়ে যাচ্ছিলেন। আকাশের গায়

নিবিড় কালো মেঘ। রামকৃষ্ণ তাই দেখছেন ও মুড়ি খাচ্ছেন। দেখতে দেখতে মেঘখানা আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেললো। এমন সময় এক ঝাঁক দুধের মত সাদা বক ঐ কালমেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগল। এ-রকম দৃশ্য দেখে বালক গদাধর এমনি তন্ময় হয়ে গেলেন যে, তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে-ন এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সাথীরা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি গদাধরের বাড়ীতে খবর দিল। মূর্ছিত গদাধরকে কোলে করে বাড়িতে আনা হলো।

এই ঘটনা ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রমনিকে খুবই ভাবিয়ে তুলল। তারা পূজা-মানত করে দেবতার কাছে আকুল প্রার্থনা জানালেন, যাতে পুত্রের কোন অমঙ্গল না ঘটে।

ক্ষুদিরাম লক্ষ্য করলেন, বালক গদাধর যেমন অকপট তেমনি নির্ভীক। নিজের দোষত্রুটি কখনো গোপন করে না। মিথ্যে কথা বলেনা। সর্বোপরি বালকের স্বভাবজাত দেবভক্তি ক্ষুদিরামকে স্মরণ করিয়ে দিত বালকের জন্ম সম্বন্ধে গয়াধামে দেখা স্বপ্নকথা----। তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো, এই শিশু সাধারন মানব নহে। তাই গদাধর কথার অবাধ্য হলে বা দুরন্তপনা করলেও তিনি তাকে বকতেন না।

গদাধরের বয়স যখন সাত পেরিয়েছে, তখন হঠাৎ একদিন তার পিতা ক্ষুদিরামের মৃত্যু হয়। পিতার এ অকাল মৃত্যুতে গদাধর মনে খুব আঘাত পেলেন।

পিতার মৃত্যুর পর গদাধর আরো উদাস হয়ে গেলেন। দিন রাত পড়ে থাকেন শশ্মানে, নির্জন স্থানে আর সাধু- সন্ন্যাসীদের কাছে। তার জীবনে ছোটবেলা থেকেই সকল ভাবের উন্মেষ, সমাবেশ, বিকাশ ও চরম প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

ক্রমে তের-চৌদ্দ বৎসর বয়সে পদার্পন করেন গদাধর। এ-সময় তার পরিবারে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে। রামেশ্বর ও সর্বমঙ্গলার বিয়ে হয়ে যায়। রামকুমারের প্রথম পুত্র রামঅক্ষয়ের জন্ম হয় এবং সূতিকাগৃহেই রামকুমারের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। রামকুমার যজন-যাজন ইত্যাদি করে যা আয় করতেন, তাতে সংসার তেমন চলতোনা, তাই আরো টাকা-পয়সা আয় করার জন্য রামকৃষ্ণের বড় ভাই রামকুমার কলকাতায় গেলেন এবং ঝামাপুকুরে টোল খুলে ছাত্রদের পড়াতে লাগলেন। সাংসারিক প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে কলকাতা থেকে বাড়ীতে

আসতেন। তিনি দেখলেন গদাই -এর লেখা পড়ার দিকে এতটুকুও মন নেই। তাই তিনি মা ও ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করে গদাধরকে কলকাতায় নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। তখন গদাধরের বয়স ছিল সতেরো বৎসর। সময় ১৮৫৩ সাল।

মনমত কাজ পেয়ে গেলেন গদাধর। রামকুমার যে যে বাড়িতে পূজা করতেন গদাধর ক্রমে সব কাজই আয়ত্ব করলেন। এ-ভাবে বৎসর দুই কাটলো। এদিকে টোলের অবস্থাও দিন দিন খারাপ হয়ে এল। একদিন রামকুমার তাকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে নিয়ে গেলেন। দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর মন্দির। এটা ছিল কলকাতা থেকে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে গঙ্গাতীরে। রানী রাসমণি এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে গদাধর বড় ভাইয়ের সাথে থাকতে লাগলেন এবং পৌরহিত্যের কাজ করতে লাগলেন।

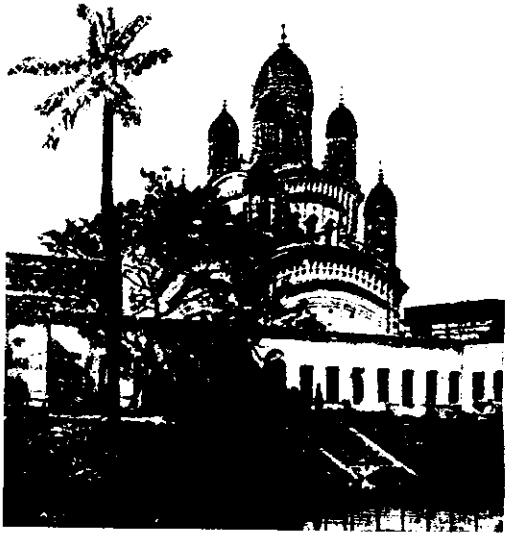

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি

কিশোর গদাধর একান্ত নিষ্ঠা ও ভক্তি দিয়ে মায়ের আরাধনা করতে লাগলেন। তার অসাধারণ ভক্তিতে মা স্থির থাকতে পারেন না। তাঁকে দর্শন

দিলেন। আমরা যেমন আমাদের মাকে সবসময় দেখি, মায়ের সংগে কথা বলি, মায়ের কথানুযায়ী চলি, রামকৃষ্ণও তেমনি মা কালীকে সব সময় দেখতেন, মার সংগে কথা বলতেন, মায়ের কথানুযায়ী চলতেন।

ইতিমধ্যে একদিন রামকৃষ্ণের বড় ভাই রামকুমার হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। পিতৃতুল্য বড় ভাইয়ের মৃত্যুতে রামকৃষ্ণের মন ভেঙ্গে গেল। তিনি ভাবতেন মিথ্যা এ সংসার, ক্ষণস্থায়ী জীবন, মানযশ পার্থিব সম্পদ। তিনি সারাক্ষণ ধ্যানে পড়ে থাকতেন অপার্থিব বস্তুর সন্ধানে। পূজা শেষে মন্দিরে বসে জগন্মাতার কাছে তিনি প্রাণের তীব্র আকুতি প্রকাশ করতেন, প্রার্থনা ও ভজন সঙ্গীতে। গাইতেন-

"ঘুম ভেঙ্গেছে আরকি ঘুমাই, যোগে-যাগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে (মা), ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।"

গভীর রাত। সবাই ঘুমে। রামকষ্ণের চোখে ঘুম নেই। তিনি বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। সারারাত পঞ্চবটীর জঙ্গলে এক আমলকী গাছের তলে বসে ধ্যান করেন। সকাল বেলায় যখন ফেরেন, তখন তার উদভ্রান্ত দৃষ্টি। চোখ লাল।

ছেলের এই বিবাগী হয়ে যাওয়ার কথা শুনে রামকৃষ্ণের মা রামকৃষ্ণকে বাড়িতে ডেকে আনলেন এবং ছেলেকে সংসারী করার উদ্দেশ্যে সারদামণি নামে এক সুন্দরী বালিকার সাথে বিয়ে দিলেন রামকৃষ্ণকে। তখন সময় বাংলা ১২৬৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস। ইংরেজি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ। বিয়ের সময় রামকৃষ্ণের বয়স ছিল ২৩ বৎসর, আর সারদামণির ৬ বৎসর।

বিয়ের পর প্রায় দেড় বৎসরকাল রামকৃষ্ণ নিজগ্রাম কামারপুকুরেই ছিলেন। কিন্তু পারিবারিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় বেশীদিন ঘরে বসে থাকা সম্ভব হোল না। ১২৬৭ বঙ্গাব্দের শেষভাগে ইংরেজি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গেলেন। সেখানে যাওয়ার অল্প কিছুদিন পরই আবার তার "ভাবোন্মাদ" অবস্থা দেখা দিল। সব কিছু ভুলে আবার তিনি 'মা' 'মা' বলে পাগল।

১৮৬১ সালে সিদ্ধা ভৈরবী যোগেশ্বরী এলেন দক্ষিণেশ্বরে। তিনি গদাধরকে দেখে তাঁকে অসামান্য যোগী এবং অবতার বলে ঘোষণা করেন। এ সময় গদাধর অর্থাৎ রামকৃষ্ণের বয়স ছিল ২৫ বৎসর।

হিন্দুদের মধ্যে অনেক ভাগ আছে, অনেক মত আছে।

যারা মা কালীর পূজো করে তারা হলো শাক্ত, যারা বিষ্ণুকে পূজো করে তারা বৈষ্ণব। যারা শিবের পূজো করে তারা শৈব। যারা ব্রহ্মের উপাসনা করে তারা ব্রাহ্ম। এমনি আরও কতোকি। রামকৃষ্ণের মনে সাধ হলো, তিনি সব মতে ভগবানের সাধনা করবেন। মা তার ইচ্ছা পূরণ করলেন। রামকৃষ্ণ এক এক করে প্রত্যেকটি মতে সাধনা আরম্ভ করলেন। তিনি প্রখ্যাত সাধক তোতাপুরীর কাছে সাধনার পথ, শক্তি, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক ও বেদান্ত বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি সমস্ত রকম ধর্মীয় মতেই উপাসনা করে প্রমাণ করেন যে, যে কোন মতেই সাধনা করা যাক না কেন, শেষ পর্যন্ত সেই এক ভগবানকেই পাওয়া যাবে। তিনি বুঝতে পারলেন যে, মনের অহংকার দূর করতে না পারলে কখনও সত্যকার আনন্দ লাভ করা যায় না। কোন মানুষকে ঘৃণা করা উচিত নয়। তাই তিনি নীচ ও অস্পৃশ্য জাতীয় লোকদের কাজ নিজের হাতে করতে লাগলেন। ভোর হবার আগেই নর্দমা, উঠান, বাড়ির জঞ্জাল পরিস্কার করতেন। কালীমন্দিরের উঠানে ছত্রিশ জাতির লোকে প্রসাদ খেতো। রামকৃষ্ণ কারও বারণ না শুনে নিজে সেই সব লোকের উচ্ছিষ্ট পরিস্কার করতেন। তাদের পাতে যা কিছু থাকত, তা গুছিয়ে আনতেন, ও নিজে তা খেতেন। এইরূপে মানুষের উপর ঘৃণা তিনি মন থেকে একেবারে দূর করলেন।

ক্রমে তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলেন। তিনি উপলব্দি করলেন যে, ঈশ্বরের ভাব অনন্ত। তিনি সকার এবং নিরাকারও। এই সর্বধর্ম সমন্বয়ই শ্রীরামকষ্ণের একটি বড় অবদান। এখন হতেই তাঁর নাম হলো 'রামকৃষ্ণ।' এসময় রামকৃষ্ণের বয়স ছিল চলি-শ বৎসর। সময় ১৮৭৫ সাল। এখন তিনি আর আত্মসমাহিত সাধক নন। হলেন লোক গুরু। তার বানী শোনার জন্যে দলে দলে লোক এসে ভিড় করে তার কাছে।

তিনি বলতেন, সব ধর্মই সত্য। সব ধর্মই এক ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। ঈশ্বর এক, কিন্তু তাঁর কাছে যাবার নানা পথ। আর ধর্মগুলো ঈশ্বরের কাছে যাবার পথ মাত্র। যত মত তত পথ।

এই উদার ধর্মভাবনাই হিন্দুধর্মের নবজাগরণ ঘটালো। ধর্মের কঠিন কঠিন তত্ত্বের যুক্তিনিষ্ঠ সমাধান তিনি অতি সহজ সরলভাবে দিতেন।

ক্রমে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো দেশ- বিদেশে। বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে আসতে আরম্ভ করলো। তিনি সহজ কথায় ছোট ছোট গল্পে এমন সুন্দর ভাবে উপদেশ দিতেন যে, সবাই তা শুনে মুগ্ধ হয়ে যেত।

পন্ডিতেরা ভুলে যেতেন তাদের পন্ডিত্য বিদ্যার বড়াই। ধনীরা ভুলে যেতেন তাঁদের ধনের অহংকার। শোকাতুররা ভুলে যেতেন শোক-দুঃখ, আর ধর্মপিপাসুরা তাঁর উপদেশ শুনে হৃদয়ে পেতেন শান্তি। পাপী- তাপী তাঁর কাছে গিয়ে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াত।

ধর্মের যত বড় কঠিন প্রশ্নই হোক না কেন তিনি জলের মত সবাইকে বুঝিয়ে দিতেন। কারো মনে তিনি দুঃখ দিতেন না বা কাউকে নিরাশও করতেন না। যে যেমন, তাকে তেমন উপদেশ দিতেন। একদিন কেশব সেন রামকৃষ্ণকে বললেন, ঠাকুর বলে দিন আমার কেন ঈশ্বর দর্শন হয়না। উত্তরে রামকৃষ্ণ বললেন - 'সংসারের সম্মান, প্রতিপত্তি আর বিদ্যার মোহ নিয়ে আছ, তাই হয় না। ছেলে চুষণী নিয়ে যতক্ষণ চোষে ততক্ষণ মা আসে না। কিন্তু চুষনী ফেলে দিয়ে ছেলে যখন মা মা বলে চিৎকার শুরু করে তখনই মা সব কাজ ফেলে ছুটে আসে। তাই ঈশ্বরকে যে আন্তরিক ভাবে জানতে চাইবে, তারই হবে।

তিনি বলেছেন, বিষয়ের প্রতি যেমন বিষয়ীর টান, পতির প্রতি যেমন সতীর টান এবং সন্তানের প্রতি যেমন মায়ের টান এইরকম আন্তরিক তিনটি টান একসঙ্গে হলেই ঈশ্বর লাভ হয়।

তাঁকে সবাই বলতো রামকৃষ্ণ পরমহংস। পরমহংস অর্থ কি জানো? যারা সংসারের ভাল-মন্দ হতে শুধু ভালোটুকুই বেছে নেন আর মন্দটা ত্যাগ করেন তাদেরকে বলা হয় পরমহংস।

তোমরা দেখেছো দুধে জলে একত্র করলে তা একেবারে মিশে যায়। দুধ ও জল আর পৃথক করতে পারা যায় না। কিন্তু একরকম হাঁস আছে, দুধে-জলে মিশিয়ে খেতে দিলে তারা অনায়াসে শুধু দুধটুকুই খেয়ে ফেলে। যেমন জল তেমনি পড়ে থাকে। তেমনি এই দুধ- জলের মত এ সংসারেও ভাল-মন্দ মিশানো আছে। মন্দটা ত্যাগ করে সংসার থেকে যারা ভালটুকুই বেছে নেন, তাদেরই নাম পরমহংস।

রামকৃষ্ণ ছিলেন মাতৃ-অন্ত প্রান। তিনি তার বৃদ্ধা মাকেও দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে এসেছিলেন এবং যতদিন মা বেঁচে ছিলেন, মায়ের সেবার কোন ত্রুটি করেন নাই।

রামকৃষ্ণের সংসারের দিকে কোন টান ছিল না। তিনি সংসার সুখকে বিষের মত মনে করতেন। তিনি মাঝে মাঝে আনন্দে এত বিভোর হয়ে পড়তেন

যে, তাঁর বাহিরের কোন জ্ঞান থাকত না। রামকৃষ্ণ বলতেন, মানুষের আত্মাই আনন্দের খনি। শরীর সেই আত্মার খাঁচা। শরীরের দিকে মন বেশী দিলে আত্মার আনন্দ উপভোগ করা যায় না।

রামকৃষ্ণের বহু শিষ্য ছিল। তাঁর সঙ্গে থেকে অনেকেই সংসার ত্যাগ করে ভগবানকে পাওয়ার জন্য সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। এদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁর সন্যাসী-শিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অবশেষে ১৮৮৬ সালের ১৫ই আগষ্ট রোববার, শ্রাবন-সংক্রান্তি, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ, রাত্রি একটায় কাশীপুরের বাগানবাড়িতে শ্রী-রামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১ বৎসর।

শবদেহ বেলা দ্বি-প্রহর পর্যন্ত গরম ছিল। তাই সেটা নাড়াচাড়া করা হলোনা। দেহ সম্পূর্ণ শীতল হবার পর স্নানাদি সম্পন্ন করে বরাহনগরের শ্মশান ঘাটে নিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হলো। দাহকার্য শেষ হলে রামকৃষ্ণের চিতাভস্ম ও পূতাস্থি সংগ্রহ করে ভক্তরা একটি কলসীতে রাখলেন এবং সেই কলসী মাথায় নিয়ে কাশীপুরের বাগান বাটিতে ফিরে গেলেন। রামকৃষ্ণের চিতাভস্মের কিছুটা নিয়ে গিয়ে রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে ভূপ্রোথিত করেন। বাকী অংশ ভক্তেরা প্রথমতঃ কিছুদিন বলরাম বসু মহাশয়ের ভবনে রেখে পরে বরাহনগর মঠে স্থানান্তরিত করেন। ক্রমে বরাহনগর মঠের প্রতিষ্ঠা হলো। যুবক ভক্তবৃন্দের ত্যাগ বৈরাগ্য, সুরেন্দ্রের ভালবাসা ও অর্থসাহায্য এবং নরেন্দ্রনাথের অসীম উৎসাহই ছিল এর মূলে। বরাহনগরে মঠ স্থাপনের ফলে রামকৃষ্ণের গৃহীভক্তেরাও উৎসাহ পেলেন। পেলেন নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তুলবার এবং সাধুসেবার সুযোগ। এইরূপে গড়ে উঠলো শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সুদৃঢ় কাঠামো। নরেন্দ্রনাথ হলেন এই সংঘের নেতাও প্রান । কিছু দিন পর সন্ন্যাসী শিষ্যরা ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানে ভ্রমন করতে লাগলেন। এবং রামকৃষ্ণের বানী প্রচার করতে লাগলেন।

সাধারণতঃ মহাপুরুষরা চলে যাবার অনেক পর তাদের জীবনী ও উপদেশ লেখা হয়ে থাকে। কিন্তু রামকৃষ্ণের বেলায় তেমনটি হয় নাই। তিনি বেঁচে থাকতেই তাঁর সম্বন্ধে অনেক বই বের হয়েছিল। অধিকাংশ পুস্তকই তার শিষ্যদের লেখা। তার জীবনী ও উপদেশ পৃথিবীর সব ভাষাতেই ছাপা হয়েছে। রামকৃষ্ণের শিষ্য যুবক নরেন্দ্রনাথ, যিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে খ্যাত, তিনি তাঁর গুরুদেব রামকৃষ্ণের নামে মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন। গঙ্গার পশ্চিম তীরে বেলুড় মঠ।

এছাড়াও তিনি স্থাপন করলেন 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামে সমিতি। রামকৃষ্ণের সঙ্গলাভে বিবেকানন্দ যেমন ধর্মজগতে অতি উচ্চস্থান লাভ করেছিলেন, তেমনি তার হৃদয়ও হয়েছিল মহান।

আজ রামকৃষ্ণ মিশনের যে সেবার কথা তোমরা শুনছো তা বিবেকানন্দের-ই কীর্তি।

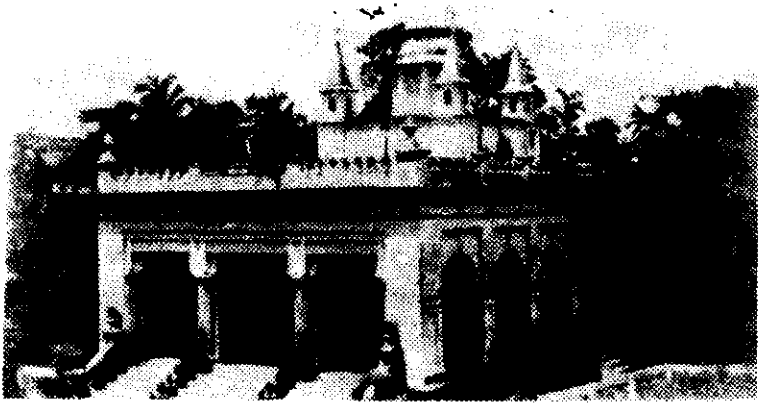

রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা।

রামকৃষ্ণ তোমাদের জন্যে রেখে গেছেন অতুল ধন সম্পত্তি, যা কোনদিনই ফুরোবার নয়, এটা কি জানো? তার অমূল্য ভাবরাশি ও অমৃতবানী।

এসো, আমরা রামকৃষ্ণের সেই বানীর একটি গল্প শুনি।

সিংহের বাচ্চা

পাহাড়ের ধারে এক মেষপালক মেষ চরাচ্ছিল। মেষপালক গাছতলায় বসে তামাক খাচ্ছে আর মেষগুলো এদিক ওদিক চরে বেড়াচ্ছে। পাশেই একটি ছোট পাহাড়ী নদী। তারপর পাহাড়।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। মেষপালক বাড়ি ফেরার জন্য উঠে দাঁড়াল। এমন সময় নদীর ওপারে একটা বিরাট সিংহী এসে দাঁড়াল। তার চোখ দিয়ে যেন

আগুন বেরুচ্ছে। ভয়ের মেষগুলো চীৎকার করতে লাগল আর মেষপালক কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। এমন সময় সিংহীটা এক লাফে একেবারে নদীর এপারে এসে পড়ল সিংহীটা ছিল পূর্ণ গর্ভবতী। হটাৎ জোরে লাফ দেওয়ায় সিংহীর একটা বাচ্চা হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সিংহীটাও সেখানে পড়ে মরে গেল।

সিংহীর এই অবস্থা দেখে মেষপালক তার বাচ্চাটাকে কোলে করে মেষপাল নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। সিংহের বাচ্চা মেষপালের সঙ্গে বড় হতে লাগল। সে মেষের দুধ খায়। মেষশাবকদের সাথে খেলাধূলা করে। দিন যায়, সিংহের বাচ্চা ঘাস খায় আর মেষপালের সঙ্গে মাঠে চরে বেড়ায়।

একদিন পাহাড় থেকে আর একটা সিংহ সেই মেষপালে এসে পড়ল। মেষগুলো সিংহকে দেখে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে পালিয়ে গেল। সিংহের বাচ্চাটাও ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে তাদের সাথে পালাতে লাগলো। বাচ্চার কান্ড দেখে সিংহ তো অবাক। সে করলো কি, আর কাউকে ধরলো না। শুধু সেই সিংহের বাচ্চাটাকে ধরে টানতে টানতে বনের ভিতর নিয়ে গেল। বাচ্চাটা তখন ও মেষের মত ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে ডাকছিল।

বনের মাঝে গিয়ে সিংহ বাচ্চাটাকে বলল, দেখ, তুই ও আমার মত একটা সিংহ। মেষের সঙ্গে থেকে থেকে তুই একেবারে মেষ হয়ে গেছিস। নিজেকে মেষ মনে করছিস।

বাচ্চাটা তখন ও সিংহের কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাই সিংহ বাচ্চাটাকে জলের ধারে নিয়ে গেল, আর বললো, দেখ্ জলে আমাদের ছায়া পড়েছে। আমি ও যা, তুই ও তা। আমার যেমন মুখ তোর ও তেমনি। কেন শুধু শুধু ভয় করছিস? আজ থেকে মনে রাখিস মেষ নয়, তুই পশুরাজ সিংহ। সমস্ত পশুগুলো তোকে ভয় করবে। আর মেষপালে যাসনে। বনে যা। তুই বনের রাজা।

সিংহের কথায় বাচ্চা জলের দিকে তাকিয়ে দেখলো, তাইতো। তার চেহারা আর সিংহের চেহারা তো একই মনে হচ্ছে।

সিংহ তখন খানিকটা মাংস এনে নিজে খেল, আর বাচ্চাটাকেও জোর করে খাইয়ে দিল।

ধীরে ধীরে বাচ্চার মনে সিংহের ভাব জেগে উঠলো। সে মাথা তুলো

দাঁড়াল। আর সিংহের মতো হুংকার ছেড়ে গভীর বনে চলে গেল।

এই গল্পের মূল অর্থ কি জানো? নিজেদের দুর্বল, অক্ষম ও ছোট ভেবেই আমরা আমাদের যত দুঃখ ডেকে এনেছি। নিজের প্রতি বিশ্বাস রেখে যে উন্নতি করতে চেষ্টা করে, সেই উন্নতি করতে পারে। যার আত্মবিশ্বাস নেই, সে কখনও উন্নতি করতে পারে না। মানুষের অন্তরে ভগবান অনন্তশক্তি দিয়েছেন। তাকে জাগাতে হবে। তার অসীম শক্তির কাছে পৃথিবীর সকল শক্তির তুচ্ছ।

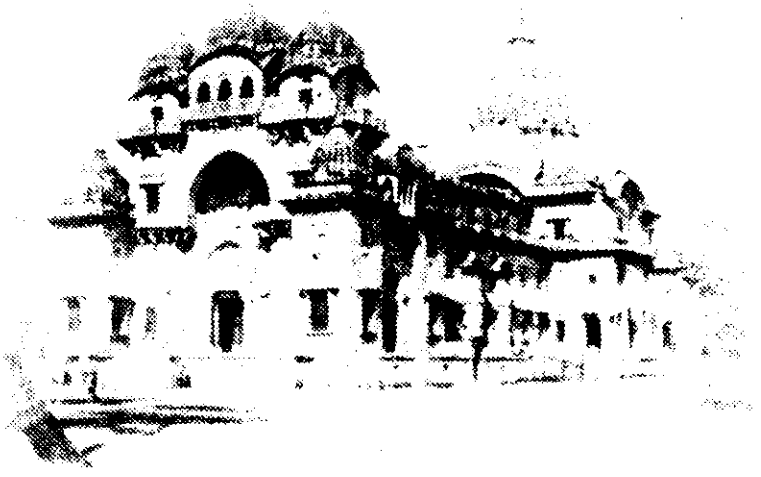

বেলুড় মঠ, কলকাতা।

মোশী

ইহুদী ধর্মের মহাপুরুষ

পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মই কোন না কোন মহাপুরুষ প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু শুধু ইহুদী আর হিন্দু ধর্মের বেলায় এ কথা খাটে না। এই দুই ধর্মের কোনো প্রবর্তক নেই, আছে মহাপুরুষ। এখন শোন তাহলে ইহুদী ধর্মের কথা। এই ধর্মের প্রধান উৎপত্তিস্থল হলো পশ্চিম এশিয়া। ইহুদী ধর্মকে হিব্রু ধর্মও বলা হয়। আব্রাহামের বংশধরগণই হিব্রু বা পরবর্তীকালীন ইস্রায়েল জাতি, আর এ ধর্মের ইতিহাস যে গ্রন্থে পাওয়া যায় তার নাম হলো 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'।

ওল্ড টেস্টামেন্ট কাকে বলে জানো? বইবেলের প্রথম খন্ডকে। বাইবেল কাকে বলে তাতো জানোই। খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ। এই বাইবেল দুই খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ড ও দ্বিতীয় খন্ড। প্রথম খন্ড ওল্ড টেস্টামেন্ট, হিব্রু ভাষায় লেখা আর দ্বিতীয় খন্ড 'নিউ টেষ্টামেন্ট' গ্রীক ভাষায় লেখা। বাইবেলই পৃথিবীতে সবচাইতে বেশী প্রচলিত বই। শুধু ধর্মগ্রন্থ হিসেবেই নয়, সাহিত্য হিসেবেও এটা বেশ মূল্যবান।

ওল্ড টেষ্টামেন্ট তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে পুরোনো পৃথিবীর বিবরণ। দ্বিতীয় ভাগে মহাপুরুষদের জীবনী আর তৃতীয় ভাগে আছে স্তে

াত্র। মন্ত্র ও কবিতার সংকলন। এই তিনটি খন্ড আবার ভাগ করা আছে সর্বমোট ৪৬ টি বই-এ। তার মধ্যে তালমুদ বইয়ে আছে ইহুদীদের ধর্মের কথা।

বর্তমানে ইহুদীদের নিজস্ব দেশ ইস্রায়েল। যাকোব (হযরত ইয়াকুব) এর আর এক নাম ইস্রায়েল এবং এই কারণেই তার বংশধরদের ইস্রায়েলীয় বলা হয়। এদের আবার হিব্রু বা ইহুদী জাতিও বলা হয়। আব্রাহাম ও বিবি সারার একমাত্র ছেলে ইসহাক। ইসহাকের দ্বিতীয় ছেলে যাকোব (ইয়াকুব)। তাই আব্রাহাম (হযরত ইব্রাহিম) ইসহাক ও যাকোবকে (ইয়াকুব) কে সমস্ত ইহুদী জাতির আদিপিতা বলা হয়।

আগে ইহুদীরা এক জায়গায় ছিল না। বিভিন্ন দেশে তারা ছড়িয়ে থাকত। কখনও ব্যাবিলনে, কখনও মিশরে। যখন যেখানে থাকত, সেখানকার ধর্ম মেনে চলত। দেব-দেবীর পূজা করত। তখন অর্থাৎ প্রায় চার হাজার বৎসর আগে সুমের দেশের উর শহরে আব্রাম নামে একজন ইহুদী ছিলেন।

তোমরা হয়তো ভাবছো সুমের দেশ আবার কোনটা? হ্যাঁ, আজ যাকে ইরাক দেশ বলে, পাঁচ হাজার বছর আগে তার দক্ষিণ অংশকে সুমের দেশ বলতো। এটা এশিয়ার উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত, একসময় যার নাম ছিল 'মোসোপটেমিয়া'। একদিন আব্রাম ঈশ্বরের আদেশ পেলেন যে, একমাত্র ঈশ্বরকে মেনে চললে তিনি আব্রামকে সুন্দর একটি দেশে নিয়ে যাবেন। সেখানে ইহুদীরা সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে। সেটাই হবে তাদের নিজেদের দেশ।

ঈশ্বরেকে আব্রাম বলতেন 'যিহোবা'। তিনিই প্রথম ইহুদী, যিনি বলেন, ঈশ্বর এক। কাজেই আমাদের এক ঈশ্বরের আরাধনা করা উচিত।

তার এ কথা শুনে দেশের অধিকাংশ লোক ক্ষেপে গেল। তার উপর অথ্যাচার শুরু করলো এবং তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। অবশেষে আব্রাম করলেন কি, যারা তার কথা মেনে নিল, তাদের নিয়ে তিনি ঈশ্বরের দয়ায় সেই সুন্দর দেশটিতে চলে গেলেন। সে দেশের নাম কি জানো? কানান। যাকে আজ বলা হয় প্যালেস্টাইন। ইঞ্জিল শরীফের প্রথম চারটি খন্ডে যে সমস্ত ঘটনার উলে-খ রয়েছে, তার প্রায় সমস্তই ঘটেছিল প্যলেস্টইন দেশে। প্রালেস্টাইন অনেক দিনের পুরাতন দেশ। এর উত্তরে সিরিয়া, পূর্বে আরব এবং পশ্চিমে মিসর ও ভূমধ্যসাগর। এটা একটি ছোট দেশ। নামটি নিশ্চিয়ই তোমাদের খুব পরিচিত। আর আব্রাম নিজের নাম সামান্য পরিবর্তন করে রাখেন 'আব্রাহাম'।

প্যালেস্টাইন দেশের বেশীর ভাগ লোক ছিল ইহুদী। সেই সময়ে দুনিয়ার অন্যান্য যে সমস্ত জাতি প্রতিমা পূজা করত, তাদের চেয়ে ইহুদীরা আলাদা রকমের ছিল। তখন একমাত্র ইহুদীরাই সত্য খোদার এবাদত করত এবং তারা ছিল কিতাবী লোক। যে সমস্ত পাক কিতাব তারা পেয়েছিল, সেগুলোর নাম হলো পবিত্র তৌরাত-মোশী (হযরত মূসা আঃ)- এর উপর। পবিত্র যাবুর ডেভিড (হযরত দাউদ (আঃ) এর উপর। এছাড়া অন্যান্য নবীদের লেখা কয়েকটি পবিত্র সহীফা। পবিত্র সহীফাগুলোর মধ্যে ছিল ইশায়া, আরমিয়া ইত্যাদি।

প্যালেস্টাইনে গিয়ে বসতি স্থাপন করবার পর আব্রাহামের একটি ছেলে হল। তার নাম ইসহাক। ইসহাকের দুই ছেলে, ইসু (এষৌ) ও যাকোব (জোকব)। ঘটনাক্রমে ছোট ছেলে যাকোব পিতার কাছ থেকে বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করেন। এই যাকবেরই আর এক নাম ইস্রায়েল। যাকোবের ছিল বারটি ছেলে। কনিষ্ঠ যোসেফ কে যাকোব খুব বেশী ভালবাসতেন। এতে যোসেফের আর সব ভাইরা তাকে খুব হিংসা করত। তারা তাকে সরিয়ে ফেলার জন্য এক জঘন্য পথ অবলম্বন করল। একদিন তারা যোসেফকে ধরে নিয়ে গিয়ে মিশর দেশের বণিকদের কাছে বিক্রি করে দিল। কিন্তু যোসেফ নিজের বুদ্ধিতে ও গুণে সেখানে রাজসম্মান রঅভ করলেন এবং রাজ্যের মধ্যে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলেন।

কয়েক বছর কেটে গেল। প্যালেস্টাইনে দেখা দিল ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। খাদ্যের সন্ধানে যোসেফের ভাইরা মিশরে গেল। সেখানে যোসেফে সঙ্গে তাদের দেখা হল। যোসেফ তখন উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী। ভাইদের অপরাধ যেসেফ ক্ষমা করলেন এবং বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে এসে তাদের সবাইকে মিশরে বসবাস করতে বললেন। তারা তাই করল। যাকোব অর্থাৎ ইস্রায়েল পরিবার শিরে এসে বেশ সুখে- স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে লাগল। মৃত্যুর আগে যাকোব এক ভবিষ্যদ্বাণী করে বলে-ন যে, তার সন্তানদের মধ্যে জুডা নামক সন্তানের বংশে মানব জাতির 'মুক্তিদাতা' জন্মগ্রহণ করবেন।

ক্রমে ইস্রায়েলদের বংশবৃদ্ধি হতে থাকল। তারা মিশরের নানা স্থানে বসতি স্থাপন করল। প্রথম প্রথম মিশরের রাজারা ইস্রায়েলদের অনেক সুযোগ সুবিধা দিতেন। এমন কি ভূমি সম্পত্তি পর্যন্ত দিতেন। হিব্রুরাও ছিল অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমি। ফলে তারা অত্যন্ত ধনবান হয়ে উঠে, আর তাদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলে।

ইহুদী ধর্মে ঈশ্বর এক। তাকে তারা বলে যিহোবা। তার কোন মূর্তি বা চেহারা নেই। তাই তার ছবি বা মূর্তি তৈরী করে তার পূজো হতে পারে না। ইহুদীরা তাই মন্দির তৈরী করে। কিন্তু সেখানে কোনও মূর্তির পূজো হয় না। শুধু যিহোবার উপাসনা হয়। কিন্তু কিছুকাল পরই হিব্রুরা অর্থাৎ ইহুদীরা ঈশ্বরের অর্থাৎ যিহোবার কথা ভুলে গিয়ে বেল, মার্ডুক (সূর্য দেবতা) ইত্যাদির মূর্তি পূজো করত। ঈশ্বর রেগে গিয়ে তাদের আবার শাস্তি দিতেন। ফলে ইহুদীদের দুঃখ কষ্ট আরো বেড়ে যেতো।

তারপর এক এক সময়ে এক একজন করে মহাপুরুষ এসে আবার তাদের ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখতে বলতেন। তারা আবার সুখ- শান্তি ফিরে পেত।

এইরকম মহাপুরুষদের একজন ছিলেন মোশী। ইংরেজিতে বলে মোজেস, আর আরবীতে অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে বলে মুসা (আঃ)।

এ সময়ে ইহুদীরা মিশরে থাকত। মিশরীয়রা তাদের ক্রীতদাসের মত খাটাত। আর ভীষণ মারধর করত। তারা যিহোবার কথা ভুলে গিয়েছিল।

এমনি এক ক্রীতদাসের ঘরে জন্মেছিলেন মোশী। কিন্তু আশ্চর্যভাবে তিনি মিশরের রাজবাড়িতে মানুষ হন। সে এক গল্পের মতো ঘটনা। শোন তা'হলে-

সে সময়ে মিশরের লোকদের সাথে ইহুদীদের একেবারেই বনতো না। একদল চাইত অপর দলকে জব্দ করতে। মিশরের রাজা ফ্যারাও দেখলেন যে, মিশরীয়দের চাইতে ইহুদীরা যে শুধু শক্তিশালী, তাই নয়, তারা সংখ্যায়ও অনেক বেশী। তাই তিনি ভাবলেন, ইহুদীদের আর বাড়তে দেয়া ঠিক হবে না। তিনি তখন সারা দেশময় হুকুম জারি করলেন যে, ইহুদীদের ঘরে কোন ছেলে সন্তান জন্মালে তাকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। এটা শুনে ইহুদীদের ঘরে ঘরে তো কান্নার রোল উঠলো। কিন্তু রাজার হুকুম। না মেনে উপায় নেই। লেভি নামে একজন ইহুদী ছিলেন। বহুদিন যাবৎ তার বাড়িতে কোন বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি। অনেক দিন পর তার একটি সন্তান হলো। মেয়ে নয়, ছেলে। এটা দেখে তো বাড়ির সবাইর মাথায় হাত। কি করা যায়। রাজার হুকুম। রাজার লোক সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিষেধ অমান্য করলেই রাজার লোকেরা ধরে নিয়ে যাবে। নির্ঘাৎ মৃত্যুদন্ড। কিন্তু ছেলেটি দেখতে যা সুন্দর। শরীরে সুলক্ষণের চিহ্ন দেখা যায়।

এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে নদীতে ডুবিয়ে মারতে মন চাইলো না বাবা-মার। তবুও তারা কিছুদিন ঘরে লুকিয়ে রাখলো ছেলেকে। কিন্তু তারপর যখন তা আর সম্ভব হলো না তখন একটি ঝুড়ির মধ্যে বাচ্চাটিকে শুইয়ে ঝুড়িটি নদীর ধারে এক ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে রাখলো। আর বাচ্চাটির বড় বোন মিরিয়াম কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আড়াল থেকে নজর রাখতে লাগল ঝুড়িটির দিকে। রাজার মেয়ে সেদিন নদীতে গেছে গোছল করতে। হঠাৎ ঝোঁপের মধ্যে থেকে শিশুর কান্না শুনতে পেয়ে চমকে উঠলো সে। দাসীকে বললো- যাও তো দেখে এসো ব্যাপারটা কি।

দাসী ঝোপের ভিতর গেল। ফিরে এসে বললো- ঝোঁপের মধ্যে একটি ঝুড়ির ভেতর খুব সুন্দর একটি বাচ্চা ছেলেকে কে বা কারা ফেলে রেখে গেছে।

এটা শুনে রাজকন্যা নিজেই গেল ছেলেটিকে দেখতে। সুন্দর নিষ্পাপ, কচি মুখটি দেখে তার ভারী মায়া হলো। রাজকন্যা বুঝতে পারলো এ নিশ্চয়ই কোন হিব্রুর ছেলে। তক্ষুণি রাজকন্যা ঠিক করে ফেললো এমন সুন্দর ছেলেকে মারতে দেবেন না। নিজেই ওকে মানুষ করবেন নিজ পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে। দাসীকে বললেন- ছেলেটিকে আমি নিজের কাছে রাখবো। ওকে লালন- পালন করার জন্যে একটা হিব্রু ধাই এর খোঁজ করো তো ? ঠিক এই সময় ছেলেটির বড় বোন মিরিয়াম, যে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে সব দেখছিল সে ছুটে এসে রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করল, শিশুটিকে যত্ন করে বড় করার জন্য আপনি কি কোন ধাত্রী চান?

রাজকন্যা বলল- হ্যাঁ।

মিরিয়াম তক্ষুণি ছুটে বাড়ি গিয়ে মাকে সব ঘটনা খুলে বলল, আর তার মাকে রাজকন্যার কাছে নিয়ে গেল।

রাজকন্যা তখন তার মাকে বলল, 'শিশুটিকে নিয়ে যাও, আর আমার হয়ে একে ভালভাবে সেবাযত্ন কর। এর জন্য আমি তোমাকে পয়সা দেব।'

মা আপন সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি গেল। বড় হওয়া পর্যন্ত সে তার যত্ন নিল। ছেলেটিকে জল থেকে বাঁচান হয়েছিল- এজন্য তাকে ডাকা হত মোশী বলে।

মোশী বড় হয়ে উঠলে রাজকন্যা তাকে নিজ প্রসাদে নিয়ে গেল এবং তাকে নিজের ছেলের মত লালন পালন করতে লাগল। তাকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার জন্য ওস্তাদ রাখা হলো।

ইহুদীরা এ সময়ে মিশরে থেকে বড় কষ্ট পাচ্ছিল। তাদের জোর করে পশুর মত খাটান হত। তাদের দিয়ে অত্যন্ত কঠিনস কাজ করান হত। যন্ত্রচালানোর জন্য তাদের লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা হত, ঠিক বেগে না চালালে পরিচালক চাবুক দিয়ে তাদের মারধর করত। বহু জনকে প্রাসাদ ও গৃহনির্মাণের কাজে লাগান হয়েছিল। তাদের ভারী বোঝা বইতে হত। বোঝার ওজনে সময় সময় তারা ভারী জিনিসের নিচে চাপা পড়ত। তাদের এ কষ্ট দেখে মোশী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠতেন। একদিন পথ চলার সময় মোশী দেখলেন এক ইহুদী ক্রীতদাস বোঝার ভারে মাটিতে পড়ে গেছে। আর তার মিশরীয় মনিব তাকে চাবুক দিয়ে মারছে। এই করুণ দৃশ্য দেখে মোশী আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। ইহুদীটিকে বাঁচানোর জন্য সেই মিশরীয় লোকটিকে সাজোরে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিলেন, আর লোকটি মারা গেল। মোশী মৃতদেহটাকে বালির নিচে চাপা দিয়ে রাখলেন। ভাবলেন কথাটা রাজার কানে যাবে না। কিন্তু কথাটি রাজার কানে গেল। তিনি মোশীকে হত্যা করার জন্য রক্ষী পাঠালেন।

মোশী এটা টের পেলেন এবং প্রাদাস ছেড়ে পালিয়ে গেলেন বহু দূরে মেদিয়ান নামক দেশে।

একদিন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একটা কূপের কাছে বসে জিরিয়ে নিচ্ছেন মোশী। এমন সময় জেথরো নামক এক ব্যকিতর সাত কন্যা তাদের মেশপালকে জল খাওয়ানের জন্য সেখানে উপস্থিত হল।

একটু পরেই কয়েকজন অভদ্র মেষ পালক সেখানে উপস্থিত হয়ে মেয়েগুলোকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের মেষপালকে জল দিতে আরম্ভ করল। এটা দেখে মোশীর খুব খারাপ লাগল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ঐ মেষপালকদের তাড়িয়ে দিলেন আর সেই মেয়েগুলোকে সাহায্য করলেন, যাতে করে তারা তাদের মেষগুলোকে ভালভাবে জল খাওয়াতে পারে। বাড়ি ফিরে জেথরোর সাত কন্যা কূপের কাছে যা কিছু ঘটেছিল তা তাদের বাবাকে জানাল। ফলে জেথরো মোশীর উপর খুব খুশী হলেন এবং মোশীকে নিজের বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানালেন। মোশী জেথরোর বাড়িতে এলেন। সেখানে কিছুদিন থাকলেন। জেথরো মোশির সাথে নিজের কন্যা সিপে-রার বিবাহ দিলেন। মোশী জেথরোর মেষপাল দেখাশোনার কাজ করতে লাগলেন। একদিন মেষপালক চড়াতে যাবার সময় তিনি দেখলেন দূরে এক বিরাট অগ্নিশিখা। মোশী ছুটে গিয়ে সেখানে

উপস্থিত হলেন। দেখলেন এক অদ্ভুত ব্যাপার। সেখানে একটা ঝোঁপ আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে। অথচ পুরে ছাই হচ্ছে না। হঠাৎ সেই জ্বলন্ত ঝোঁপের মধ্য থেকে একটি কণ্ঠস্বর তিনি শুনতে পেলেন। কণ্ঠস্বরটি বলছে, 'তোমার পাদুকা খুলে ফেল। কারণ এ স্থান পবিত্র। আমি 'ইয়াভে' তোমার পিতৃপুরুষের ঈশ্বর। তোমার আপনজন হিব্রুদের প্রার্থনা আমি শুনেছি। মিশরীয়দের কবল থেকে আমি তাদের উদ্ধার করতে চাই। কাজেই তুমি তোমার ভাই হারোনের সাথে মিশর রাজের কাছে যাও। হিব্রুরা যাতে মরুভূমিতে গিয়ে আমার উদ্দেশ্যে বলি উৎসর্গ করতে পারে সেজন্য মিশররাজকে তাদের ছেড়ে দিতে বল। মোশী বললেন, "আমায় কেউ বিশ্বাস করবে না।' তখন আবার সেই অলৌকিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল- তোমার হাতের লাঠি মাটিতে ফেল।'

মোশী তা করার সাথে সাথে লাঠিটি একটি সাপে পরিণত হল।

এবার ঈশ্বর তাকে বললেন, 'ওটা আবার তুলে নাও।' মোশী তাতে হাত দিতেই সেটা আবার লাঠিতে পরিণত হল। ঈশ্বর বললেন, 'এই চিহ্ন দেখেই তারা বিশ্বাস করবে যে, আমিই তোমায় পাঠিয়েছি।'

মোশী এবার তার ভাই হারোনকে সাথে নিয়ে রাজার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'আমার ঈশ্বর চান যে, হিব্রুরা মরুভুমিতে গিয়ে তাঁর নামে এক বলি উৎসর্গ করুক। সুতরাং দয়া করে তাদের ছেড়ে দিন।'

মিশর রাজ বললেন, 'তোমার ঈশ্বর কে যে, তার আদেশ আমায় মানতে হবে। হিব্রুদের আমি কোনদিনই যেতে দেবো না। আমি তাদের আরও বেশী করে খাটাব, যাতে বলি উৎসর্গের কথা তারা ভাবতে না পারে।

মোশী তখন সে যে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন তা প্রমাণ করার জন্য হারোনকে লাঠি নিক্ষেপ করতে বললেন। হারোন রাজার সামনে তার লাঠি নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে সেটা সাপ হয়ে গেল।

এটা দেখে রাজা তার যাদুকরদের ডেকে পাঠালেন। তারা এসে নিজেদের লাঠি মাটিতে ফেললে সেগুলিও সাপে পরিণত হল, আর হারোনের লাঠি থেকে উৎপন্ন সাপটি সব সাপগুলোকে খেয়ে ফেললো।

রাজা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তবু হিব্রুদের ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। তিনি মোশী ও হারোনকে তার সামনে থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

মোশী নদীর তীরে চলে গেলেন এবং নিজ লাঠি জলে ছোঁয়ালেন।

মুহূর্তেই নদীর জল রক্তে পরিণত হলো। শুধু নদীর জলই নয়, মিশরের সমস্ত জায়গার জলও রক্তে পরিণত হল। লোকে পাতকূয়া খনন করলে সেখানেও রক্তজল পাওয়া গেল।

লোকেরা ভয় পেয়ে গেল। তবুও রাজা হিব্রুদের ছাড়লেন না। ফলে ঈশ্বর অন্য উপায়ে মিশর দেশকে শাস্তি দিলেন। নদী থেকে অসংখ্য ব্যাঙউঠে এল এবং সমস্ত মিশর দেশে ছড়িয়ে পরল। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, জলপাত্র, এমনকি ঘরের ভিতর বিছানাতেও ব্যাঙ ভরে গেল। লোকের বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠল। তারা ভীত ও আতংকগ্রস্ত হয়ে উঠল। রাজা ও অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি মোশিকে ডেকে কাকুতি মিনতি করে বললেন, তোমার ঈশ্বরকে অনুরোধ কর। তিনি যেন মিশর হতে সমস্ত ব্যাঙ দূর করে দেন। আমি তোমার আপনজনকে মরুভূমিতে গিয়ে বলি উৎসর্গ করতে দিব।

মোশী উত্তর দিলেন- আমার ঈশ্বর যে সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রভু, সে কথা আপনি যাতে বিশ্বাস করেন সেজন্য কালই সমস্ত ব্যাঙ দূর হয়ে যাবে।

মোশী ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। আর সমস্ত ব্যাঙ মরে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু রাজার মন আবারও শক্ত হয়ে উঠল। তিনি হিব্রুদের ছেড়ে দিতে অস্বীকার করলেন। ঈশ্বর তখন অন্য শাস্তি প্রেরণ করলেন। মোশী তার লাঠি ধূলায় আঘাত করতেই মাটির ধূলা এক প্রকার পতঙ্গে পরিণত হয়ে পশু, পাখী, মানুষ, সবাইকেই হুল ফুটিয়ে অস্থির করে তুলল।

মোশী রাজার কাছে গিয়ে বললেন, যদি আপনি এদের না ছাড়েন, তবে এক প্রকার ভয়ংকর মাছি দেশময় ছড়িয়ে পড়বে। এতে রাজা একটুও নরম হলেন না। তখন এক প্রকার ছোট মাছি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে দেশের সকল স্থানে সকল ঘরে প্রবেশ করে লোকদের অতিষ্ঠ করে তুললো। তারপর সেগুলো রাজপ্রাসাদে এসে ঢুকতেই রাজা খুব ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি তাড়াতাড়ি মোশীকে ডেকে প্রতিজ্ঞা করে বললেন, 'যদি তুমি এই সমস্ত মাছি তাড়িয়ে দাও, তবে আমি হিব্রুদের যেতে দেব। মোশী ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। সমস্ত মাছি অদৃশ্য হয়ে গেল।

মাছি আর নেই দেখে রাজা আবার তার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে ফেললেন। ঈশ্বর এবার আর একটা শাস্তি প্রেরণ করেলেন। পশুদের মধ্যে এক ভয়াবহ মহামারী দেখা দিল। আর দেশের সব জায়গায় একটার পর একটা পশু মরতে লাগল।

তবু রাজার মনে কোন পরিবর্তন এলো না। মোশী তাকে ভয় দেখিয়ে বললেন, 'ঈশ্বর, যিনি আমাদের মরুভূমিতে গিয়ে বলি উৎসর্গ করতে আদেশ দিয়েছেন, তিনি মহাশক্তিময় ও মহান। তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে শাস্তি দেবেন।' কিন্তু রাজা একটুও বিচলিত হলেন না। তখন মোশী চুলো থেকে কিছুটা ছাই হাতে নিয়ে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করলেন। সেই ছাই সূক্ষ্ম ধূলার আকারে সমস্ত মিশরের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল এবং এর সংস্পর্শে সকল মানুষ ও পশুর ভয়ঙ্কর ফোড়া হতে লাগল। তাদের শরীর ঘা আর ফোঁড়ায় ভরে গেল। অনেকে প্রাণ হারাল। রাজার পরামর্শদাতারা রাজাকে পরামর্শ দিলেন হিব্রুদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু সেই অহংকারী রাজা তাদেরও কথা শুনলো না। ঈশ্বর বজ্রবিদ্যুৎ সহ এক কঠিন শিলাবৃষ্টি মিশরের উপর বর্ষণ করলেন। এতে বহুলোক ও পশু মারা গেল। তখন রাজা মোশীকে বলল, তোমার ঈশ্বরই সত্য। তার কাছে প্রার্থনা কর। আমি তোমার লোকদের যেতে দেব। মোশীর প্রার্থনায় ঝড় থেমে গেল। কিন্তু শিলাবৃষ্টি থেমে গেলে রাজা হিব্রুদের ছাড়ল না। তখন ঈশ্বর রাশি রাশি পঙ্গপাল পাঠিয়ে দিলেন। তারা মিশরের সমস্ত শস্য চারা ও গাছের পাতা খেয়ে ধ্বংস করল। সমস্ত দেশ এক মরুভূমিতে পরিণত হল। এরপর ঈশ্বর সমস্ত দেশটাকে অন্ধকারে ঢেকে দিলেন। তিনদিন সূর্য উঠল না। ফলে মিশরীয়রা খুব ভয় পেয়ে গেল। রাজা মোশীকে ডেকে তার কাছে ক্ষমা চাইলেন। মোশীর প্রার্থনায় ঈশ্বর অন্ধকার সরিয়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজার অন্তর আরও কঠিন হয়ে উঠল। তিনি রেগে গিয়ে মোশীকে বললেন, 'তুমি আমার কাছে আবার এলে আমি তোমাকে হত্যা করার ব্যবস্থা করব।'

মোশী ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। ঈশ্বর তাকে বললেন, আমি আর একটা মহামারী মিশরে প্রেরণ করব। এবার রাজা নিশ্চয়ই তোমাদের ছেড়ে দেবেন।

ঈশ্বর হিব্রুদের কতকগুলো আদেশ পালনের কথাও মোশীকে জানালেন।

ঈশ্বর বললেন, প্রতিটি পরিবার যেন একটা ছোট মেষ বধ করে তার রক্ত দরজার চৌকাঠে লেপন করে। তারা যেন মেষটাকে আগুনে ঝলসে খামির বিনা তৈরী রুটির সঙ্গে খায়। কারণ মৃত্যুদূত মিশরের মধ্য দিয়ে গমন করে সকল মিশরীয়দের প্রথম সন্তানকে হত্যা করবে। কিন্তু সে যদি হিব্রুদের দরজায় রক্ত দেখতে পায়, তবে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি না করে চলে যাবে।

মোশী এ কথা হিব্রুদের জানালেন। হিব্রুরা তার কথামত কাজ করল। প্রতিটি পরিবার মেষের রক্ত দরজায় লেপন করে সেই মেষের মাংস খেল। এতে তাদের মনে হলো তারা যেন তখনই মিশর দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

সেই সময়ে মৃত্যুদূত নেমে এল। যে সমস্ত দরজায় মেষের রক্তের দাগ দেখতে পেল না সে সব ঘরে প্রবেশ করল। সে রাতে মিশরীয়দের প্রতিটি প্রথম সন্তান প্রাণ হারাল। রাজার প্রথম সন্তান থেকে আরম্ভ করে সামান্য ক্রীতদাসের প্রথম সন্তান পর্যন্ত কেউ বাদ গেল না। প্রতিটি মিশরীয়দের ঘরে ঘরে কান্নার শব্দ শোনা গেল। কিন্তু হিব্রুরা সবাই বেঁচে গেল।

অবশেষে রাজা ভীত, শংকিত হয়ে মোশীকে ডেকে বললেন- আমি আদেশ দিচ্ছি তুমি হিব্রুদের নিয়ে চলে যাও।

এ সংবাদে হিব্রুরা যেমন আনন্দিত হলো তেমন খুশী হলো মিশরীয়রাও। তারাও চাইল হিব্রুরা যেন শীঘ্রই চলে যায়। এমন কি তারা তাদের সোনা- গয়না দিয়ে সন্তুষ্টি করল হিব্রুদের।

মোশী হিব্রুদের সঙ্গে নিয়ে মিশর ছেড়ে চলে গেলেন। মেয়ে ও শিশুদের বাদ দিয়ে তাদের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ। তারা নিজেদের সমস্ত পশুপালও সঙ্গে নিল। এটাই ইহুদীদের নিস্তার পর্ব। মিশরীয় দাসত্বের কথা স্মরণ করে প্রতি বৎসর এই দিনে হিব্রুরা নিস্তার পর্ব পালন করে।

হিব্রুরা নূতন দেশ অভিমুখে যাত্রা শরু করলো। যাত্রাকালে ঈশ্বর তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। দিনের বেলা এক মেঘস্তম্ভ আর রাতের বেলা এক অগ্নিস্তম্ভ তাদের আগে আগে চলল। রাজা নিজ প্রাসাদে দাঁড়িয়ে হিব্রুদের চলে যেতে দেখলেন। আর মনে মনে আফসোস করতে লাগলেন, এত দক্ষ, কর্মঠ শ্রমিকের দল, সুন্দর পশুপাল, আর প্রচুর সম্পদ সঙ্গে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে হিব্রুরা। তক্ষুণি তিনি ঠিক করলেন যে, হিব্রুদের যেতে দেয়া হবে না। মুহূর্তের মধ্যে মিশর রাজ সৈন্য সমাবেশ করলেন। তারপর স্বয়ং সেনাবাহিনীর নায়ক হয়ে হিব্রুদের ধরার জন্য বেরিয়ে পড়লেন।

এদিকে লোহিত সাগরের তীরে পৌঁছে হিব্রুরা বিশ্রাম নিচ্ছিল। এমন সময় তারা দেখতে পেল স্বয়ং রাজা তার সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে। তারা ভয় পেয়ে মোশীকে দোষারোপ করে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। মোশী তাদের বললেন, 'ভয় নেই, ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করবেন।'

তখনই হিব্রুদের সামনের সেই মেঘ স্তম্ভ সরে গিয়ে তাদের দিকে গিয়ে দাঁড়াল। আর তাদের একেবারে ঢেকে ফেলল।

ঈশ্বর তখন মোশীকে তার লাঠি সমুদ্রের উপর তুলে ধরতে বললেন। মোশী তাই করলেন, আর তক্ষুণি সমুদ্রের জল দুই ভাগ হয়ে দু'দিকে সরে গেল। আর মাঝখানে শুকনো পথের সৃষ্টি হলো। হিব্রুরা জলের মাঝে সেই শুকনো পথের উপর দিয়ে হেঁটে চলল এবং নিরাপদে সমুদ্রের অপর পারে গিয়ে পৌঁছতে লাগল। মিশরীয়রা দেখল হিব্রুরা পালিয়ে যাচ্ছে, তারাও সঙ্গে সঙ্গে সেই সমুদ্র পথের উপর দিয়ে তাদের পিছু নিল। রাজা তার সমস্ত অশ্ব, সেনা ও রথসহ সমুদ্র পথে নেমে পড়লেন। এদিকে হিব্রুদের প্রতিটি প্রাণী নিরাপদে সমুদ্রের অপর পারে পৌঁছুতেই মোশী আবার তার লাঠি সমুদ্রের উপর তুলে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জল আবার এক হয়ে আগের মত বইতে থাকল আর রাজা তার সমস্ত সেনাবাহিনী অশ্ব ও রথ প্রভৃতির সঙ্গে সমুদ্রগর্ভে ডুবে মরলেন। তাদের আর কোন চিহ্ন রইল না। এটা দেখে হিব্রুরা আনন্দিত হয়ে ঈশ্বরের গুণকির্তন করতে লাগল।

লোহিত সাগর পার হয়ে হিব্রুরা এক মরুভূমিতে এসে পৌঁছল। তিনদিন ধরে তারা মরুভূমির মধ্য দিয়ে হেঁটে চলল। সেখানে কোথাও জল না পেয়ে তারা খুব তৃষ্ণা বোধ করল। শেষে 'মারা' নামক স্থানে এসে তারা উপস্থিত হল। সেখানে জল পাওয়া গেল কিন্তু তিক্ততার জন্য সে জল খাওয়া গেল না। ফলে তার মোশীকে অভিযোগ করে বলতে লাগল,- 'তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করতে কি আপনি আমাদের এই মরুভূমিতে নিয়ে এলেন?' মোশী ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। ঈশ্বর তাকে একটা গাছ দেখিয়ে দিয়ে সেই গাছের একটা ডাল ভেঙ্গে নিয়ে জলে নিক্ষেপ করতে বললেন। মোশী তাই করলেন। তখনই সেই জলের তিক্ততা দূর হয়ে গিয়ে খাওয়ার উপযোগী হল। কয়েকদিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে হিব্রুদের খাদ্যসামগ্রীও শেষ হয়ে গেল। আবার তারা মোশীকে অভিযোগ করে বলল, আপনি কেন মিশর থেকে আমাদের নিয়ে এলেন? সেখানে আমরা প্রচুর খাদ্য পেতাম আর আজ আজ আমাদের এখানে ক্ষুধায় মরতে হচ্ছে।

মোশী বুঝলেন, এদের এই অভিযোগ তার বিরুদ্ধে নয়, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। ঈশ্বরে এরা বিশ্বাস করে না। মোশী ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। ঈশ্বর তার প্রার্থনায় সাড়া দিলেন। বিকেলের দিকে এক প্রকার ছোট ছোট পাখীর

ঝাক উড়ে এসে হিব্রুদের তাঁবুগুলোর উপর ঘুরতে থাকল। তারা এত নিচে নেমে এল যে, সহজেই তাদের ধরে ফেলে হিব্রুরা খাবারের ব্যবস্থা করল। পরের দিন সকালে দেখা গেল যে, সমস্ত মাটি এক প্রকার সাদা বীজে ঢাকা। সেই বীজ মুখে নিয়ে স্বাদ গ্রহণ করতেই তারা অত্যন্ত আনন্দিত হল। কারণ তা ছিল সুস্বাদু খাদ্য। এই বীজকে হিব্রুরা বলে মান্না। মোশী তাদের বললেন, 'ঈশ্বর তোমাদের খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন। আজ তোমাদের যতটা প্রয়োজন ততটাই সংগ্রহ কর।

প্রতিদিন তারা মান্না সংগ্রহ করত। সপ্তাহের ষষ্ঠ দিনে তাদের দুদিনের জন্য সংগ্রহ করতে হত। কারণ সপ্তম দিনে মান্না পড়ত না। এভাবে ঈশ্বর তাদের শেখালেন যে, এদিন পবিত্র বলে তাদের পালন করতে হবে। মান্না হল খ্রীস্টপ্রসাদের প্রতীক।

আবার শুকনো ও পাথুরে মরুভূমির মধ্য দিয়ে তারা যাত্রা শুরু করল এবং দক্ষিণে সিনাই পর্বত অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগল। সেই মরুভূমিতে 'আমালকাইট' নামে এক দুধর্ষ জাতি বাস করত। এরা হিব্রুদের আগমন লক্ষ্য করে তাদের আক্রমণ করার জন্য তৈরী হল। এ সংবাদ পেয়ে মোশী যোশুয়া নামে এক সাহসী সৈনিককে ডেকে বললেন, তুমি সেনানায়ক হয়ে আমালকাইটদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আমি পর্বতের উপর গিয়ে প্রার্থনা করব।

যোশুয়া তখনই সৈন্যদল নিয়ে অগ্রসর হল। অনেকক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলল। আর মোশী পর্বতের ওপর থেকে যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রার্থনা করতে লাগলো। যখনই মোশী স্বর্গের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা করেন, তখনই যোশুয়ার জয় হতে দেখা যায়। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে হাত নামিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে শত্রুদল তাদের পাল্টা আক্রমণ করতে লাগল। তাই মোশী ক্লান্তি বোধ করতেই একটা পাথরের উপর বসে পড়লেন। আর দু'জন লোক, যারা বরাবরই তার সঙ্গে ছিল তারা তার হাত দুটো তুলে ধরতে লাগল। এইভাবে মোশী সারাদিন ধরে প্রার্থনা করলেন। সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে শত্রুবাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হল। মোশী পর্বত শিখর থেকে নেমে এসে জনতার আনন্দ উল-াসে যোগ দিলেন। তারপর হিব্রুরা আবার যাত্রা শুরু করল। মিশর ছেড়ে আসার তৃতীয় মাসে তারা সিনাই পর্বতে এসে পৌঁছলো। সেখানে পর্বতের পাদদেশে ছাউনি পাতল। ঈশ্বর মোশীকে বললেন, 'তুমি লোকদের প্রস্তুত থাকতে বল। তৃতীয় দিনে আমি হিব্রুদের সামনে উপস্থিত হয়ে তাদের কিছু বলব।'

মোশী সকলকে তৈরী হতে বললেন। তৃতীয় দিনে সকাল থেকেই এক

ঘন মেঘ পর্বতের উপর দেখা দিল। বিদ্যুত চমকানোর সাথে সাথে মেঘের গর্জন শোনা যেতে লাগল। পর্বত ভীষণ ভাবে কেঁপে উঠে অগ্নিকুন্ডের মত জ্বলতে থাকল। তুরীর আওয়াজ শোনা গেল। এসব শুনে হিব্রুরা ভয়ে কাঁপতে শুরু করল। মোশী তাদের সবাইকে পর্বতের গোড়ায় জড় করলেন। তখন ঈশ্বর মেঘের ভেতর থেকে বলতে লাগলেন। "আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর- যিনি তোমাদের মিশর থেকে উদ্ধার করে এনেছেন।" এবার ঈশ্বর তাদের কতকগুলো আজ্ঞা দিলেন। এগুলো দশ আজ্ঞা নামে পরিচিত। শোন তাহলে এগুলো।

(১) তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে মানবে। কেবল তারই সেবা ও আরাধনা করবে। তার নামের সম্মান করবে।

(২) পিতামাতার বাধ্য হবে। তাদের সম্মান করবে।

(৩) রবিবার দিন বিশ্রাম করবে এবং শুদ্ধভাবে পালন করবে।

(৪) নরহত্যা করবে না।

(৫) মনে, বাক্যে ও কর্মে সৎ, শুদ্ধ ও দয়ালু হবে।

(৬) ব্যাভিচার করবে না।

(৭) চুরি করবে না।

(৮) মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

(৯) পরস্ত্রীতে লোভ করবে না।

(১০) পরদ্রব্যে লোভ করবে না।

এই দশ আজ্ঞাগুলো অন্ধকারে চমকিত আলোর মত।

সিনাই পর্বতে ঈশ্বরের অবতরনের কথা স্মরণ করে তখন থেকে হিব্রুরা পবিত্র আত্মার পর্ব পালন করে।

ঈশ্বর এবার মোশীকে সিনাই পর্বতের ওপর যেতে বললেন। মোশী সেখানে গেলেন। ঈশ্বর মোশীকে আরও কতকগুলো আজ্ঞা দিলেন। মোশী চলি-শ দিন ও চলি-শ রাত্রি পর্বতের ওপর কাটান এবং ঈশ্বরের বাণী মনোযোগ দিয়ে শুনেন।

অবশেষে ঈশ্বর মোশীকে 'দশ আজ্ঞা' খোদাই করা দুটো প্রস্তর ফলক

দিলেন। মোশী প্রস্তর ফলক দুটো হাতে নিয়ে পর্বত শিখর থেকে নেমে আসতে লাগলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পর্বতের পাদদেশে অনেক কিছু ঘটে গেছে। মোশী ফিরে আসছেনা দেখে হিব্রুরা বললো, মোশী নিশ্চয় মারা গেছে। আর ঈশ্বরও আমাদের ভুলে গেছেন। এস, আমরা আর কোন ঈশ্বর তৈরী করে তার পূজা করি।'

এই বলে তারা নিজেদের সুন্দর সুন্দর স্বর্ণ-অলংকারগুলো জড়ো করল। তারপর অলংকারগুলো আগুনে গলিয়ে তা দিয়ে একটা সোনার বাছুর তৈরী করল। এবার তারা বলল, 'এটাই হল আমাদের ঈশ্বর। এই বলে বাছুরটার সামনে বলি উৎসর্গ করে তার পূজা করল। ঠিক এমনি সময়ে মোশী পর্বত থেকে নেমে এলেন। দেখলেন বাছুরটার চারপাশে হিব্রুরা নাচছে, গাইছে। তখন ঈশ্বরের কথা স্মরণ করে হিব্রুদের উপর তার খুব রাগ হল। ঈশ্বর শুধু তাকেই আরাধনা করতে বলেছেন, আর এরা কিনা এক মিথ্যা দেবের পূজা করছে। মোশী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন এবং যে পাথর দুটোর উপর দশ আজ্ঞা খোদাই করা ছিল, সে দুটো মাটিতে নিক্ষেপ করে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। তারপর পূজায় ব্যস্ত জনতার কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, 'তোমরা এ কি করছ ? মিথ্যা দেবের পূজা করছ।' এই বলে একটি হাতুড়ীর সাহায্যে মোশী সেই স্বর্ণনির্মিত বাছুরটা টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেললেন। তারপর ভাঙ্গা টুকরোগুলো আগুনে ফেলে দিয়ে জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা এক মহা পাপ করেছ। ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাদের শাস্তি দেবেন।'

এরপর আগুন নিভে গেলে সমস্ত ছাই তিনি তুলে নিলেন এবং সেই জলের সঙ্গে মিশিয়ে পূজায় অংশগ্রহণকারী নেতাদের পান করালেন। এইভাবে তিনি সবাইকে সে মিথ্যা দেবদেবী থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দিলেন।

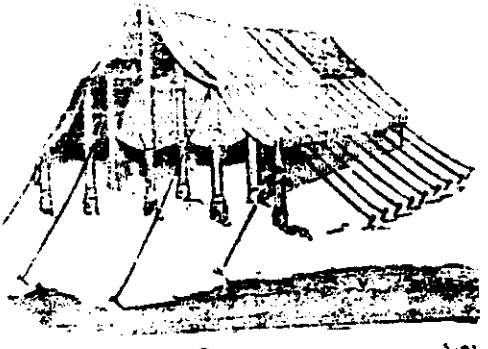

মোশী আবার তাদের ক্ষমার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে সিনাই পর্বতের উপর গেলেন। কিন্তু ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তরে বললেন, এরা আমার থেকে দূরে সরে গেছে। এই অকৃতজ্ঞতার জন্য আমি এদের ধ্বংস করব।

তবুও মোশী হিব্রুদের ক্ষমা করার জন্য ঈশ্বরের কাছে কাকুতি মিনতি করে প্রার্থনা জানালেন। তখন ঈশর মোশীকে আবার 'দশ আজ্ঞা' খোদিত দুটো প্রস্তর ফলক দিলেন। মোশী এটা নিয়ে নিচে নেমে এলেন। মোশীর মুখটা অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখাতে লাগল এবং তার মাথা থেকে আলোর রেখা বেরিয়ে আসতে লাগল। সবাই বুঝতে পারল যে, ঈশ্বরের সঙ্গে মোশীর কথা হয়েছে।

মোশী এবার একটি সুন্দর সোনার বাক্স তৈরী করলেন এবং 'দশ আজ্ঞার' প্রস্তর ফলক দুটো সেই বাক্সটার মধ্যে রাখলেন। সেই বাক্সটাকে কি বলা হয় জানো ? "পবিত্র মঞ্জুষা।"

'পবিত্র মঞ্জুষা' যত্ন সহকারে রাখার জন্য দামী ও মিহি কাপড়ের সুন্দর এক তাঁবু তৈরী করা হল। এটাই হলো তাদের ধ্যান আরাধনার মন্দির। তারপর হিব্রুরা আবার যাত্রা শুরু করল। সাদা কাপড় পরা পুরোহিতের দল 'পবিত্র মঞ্জুষা' বহন করে সবার আগে আগে চলল। কয়েকদিন চলার পর আবার খাদ্য সামগ্রিতে টান পড়ল। তারা ক্লান্তি ও ক্ষুধা বোধ করে আবার ঈশ্বরকে অভিযোগ করতে আরম্ভ করল। ঈশ্বর অল্প সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক পাখীর ঝাঁক পাঠিয়ে দিলেন। হিব্রুরা তাদের ধরে আহার করল। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা কষ্টের সময় ঈশ্বরকে দোষারোপ করেছেন তারা আহার শেষ করতেই মাটিতে ঢলে পরে মারা গেল। এইভাবে পরমেশ্বর তাদের শাস্তি দিলেন।

ঈশ্বর যে দেশটা হিব্রুদের দিতে চেয়েছিলেন সে দেশের শোভা ও উর্বরতা দেখে আসার জন্য ঈশ্বর মোশীকে বারজন লোক সেখানে পাঠাতে বললেন। মোশী বারজন লোক পাঠিয়ে দিলেন। চলি-শ দিন পরে তারা বড় বড় আঙ্গুরের থোকা আর সুস্বাদু ফল সঙ্গে করে ফিরে এসে বলল, দেশটা খুব উর্বর আর ধন সম্পদে পরিপূর্ণ।

ঐ বার জনের মধ্যে দশজনই অন্য কথা বলে লোকদের মনে বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলতে লাগল। তারা বলল, ঐ দেশে এক শক্তিশালী জাতি বাস করছে। তাদের জয় করা অসম্ভব।

কিন্তু যোশুয়া ও কালেব লোকদের সাহস দিয়ে বললেন "ওদের জয় করা কঠিন হবে না। ঈশ্বর আমাদের সাথে আছেন। চল, আমরা ওদেশে যাই।"

কিন্তু লোকেরা যোশুয়া ও কালেবের কথা শুনতে চাইল না। লোকদের অবিশ্বাস লক্ষ্য করে ঈশ্বর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য

ঈশ্বর বললেন, যাদের বয়স কুড়ি ও কুড়ির বেশী হয়েছে তাদের মধ্যে যোশুয়া ও কালেব ছাড়া আর সবাই প্রতিশ্রুত দেশে যাওয়ার আগে মারা যাবে। তাই সোজা প্যালেষ্টাইনে যাওয়ার বদলে ঈশ্বর তাদের চলি-শ বছর ধরে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর সাজা দিলেন।

একদিন মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর সময় আর খাওয়ার পানি রইল না। লোকেরা আবার মোশীকে দোষারোপ করতে লাগল ও বিভিন্ন অভিযোগ তুলতে লাগল। মোশী উপাসনাস্থলে গিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। তাঁর প্রার্থনা শুনে ঈশ্বর বললেন, তোমরা লাঠির সাহায্যে ঐ পাঁথরের উপর একবার আঘাত করে দেখ ওর মধ্যে থেকে জল দ্রুত বেগে বেরিয়ে আসবে।

কিন্তু হিব্রুরা কতবার যে অসৎ ব্যবহার করেছে তা মোশীর অজানা ছিল না। তাই ঈশ্বর তাদের জল দেবেন কি-না সে বিষয়ে মোশীর মনে একটু সন্দেহ দেখা দিল। তাই তিনি পাথরের উপর একবার আঘাত করার বদলে দু'বার আঘাত করলেন।

পাথরের উপর আঘাত করতেই তীব্র বেগে জল বেরিয়ে এল। আর সবাই সেই জল খেয়ে তৃষ্ণা মিটাল।

কিন্তু মোশীর মনে সন্দেহ জাগাতে ঈশ্বর তার উপর অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, 'তোমার এই সন্দেহের কারণে হিব্রুদের সাথে প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশে করতে আমি তোমায় দেব না।

ঈশ্বরের কাছ থেকে এত উপকার পাওয়া সত্ত্বেও হিব্রুরা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞভাব দেখাল। তারা তিক্ততার সাথে মোশীকে তিরস্কার করতে আরম্ভ করল এবং বলতে লাগল মোশী কেন এই জনশূণ্য স্থানে তাদের মরতে নিয়ে এসেছে ? এটা শুনে ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য বিষাক্ত সাপ পাঠিয়ে দিলেন। সাপের কামড়ে অনেকেই মারা গেল। তখন লোকেরা মোশীর কাছে গিয়ে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিল। বলল, এই সাপের উপদ্রপ থেকে তাদের বাঁচানোর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে।

মোশী প্রার্থনা করলেন। ঈশ্বর মোশীকে একটা পিতলের সাপ তৈরী করে সেটা এক ক্রুশকাষ্ঠের ওপর ঝুলিয়ে দিতে বললেন। কাউকে সাপে কাটার পর সে ঐ পিতলের সাপটার দিকে তাকালেই সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল।

এ প্রসংগে তোমাদের বলে রাখি, মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য যে

যীশুকে ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ করা হয়েছিল এই পিতলের সাপটা সেই যীশুরই প্রতীক।

যাক, এইভাবে হিব্রুদের সঙ্গে চলি-শ বছর মরুভূমিতে কাটানোর পর মোশী বুঝতে পারলেন যে, তার জীবনের শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে। তখন তিনি যোশুয়াকে ডেকে নিজ পদে তাকে নিযুক্ত করলেন, যাতে সে হিব্রুদের প্রতিশ্রুত দেশে নেতৃত্ব করে নিয়ে যেতে পারে।

মোশী এবার হিব্রুদের শেষ বিদায় জানিয়ে বললেন, "তোমরা সব সময় প্রভু পরমেশ্বরকে ভালবেসে চলবে। তাঁর দেওয়া "দশ আজ্ঞা" পালন করবে। ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করবেন।"

"নবো পর্বত" এখানে মোশী মৃত্যুবরণ করেন।

তারপর মোশী নবো পর্বতের ওপর গিয়ে উঠলেন। সেখান থেকে ঈশ্বর্ তাকে প্রতিশ্রুত দেশটা দেখালেন। বললেন, 'আমি যে দেশের বিষয়ে আব্রাহামকে ইস্হাককে ও যাকোবকে বলেছিলাম আমি তোমার বংশকে সেই দেশ দিব, এ সেই দেশ। আমি সেটা তোমাকে দেখালাম । কিন্তু তুমি পার হয়ে ঐ স্থানে যাবে না।'

তখন ঈশ্বরের কথানুযায়ী সেই স্থানে মোশী মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল একশ কুড়ি বৎসর।

মোশী ছিলেন এক জ্ঞানী শাসক, ও একমহাসাধুপুরুষ। বাইবেলের প্রথম পাঁচটা পুস্তক তিনি লিখে গেছেন। তাদের বলা হয় 'পঞ্চগ্রন্থ' আর যে "দশআজ্ঞা" ঈশ্বর মোশীকে দিয়েছিলেন সেগুলি ইহুদী ধর্মের আসল কথা। "তালমুদ" নামক শাস্ত্রে ইহুদীদের এ সব ধর্ম-কথা লেখা আছে।

ইহুদীদের মন্দিরে যিহোবার কোন মূর্তি থাকে না, শুধু একটি আধারের মধ্যে 'ওল্ড টেষ্টামেন্টের' একটু অংশ রাখা হয়। আর তার সামনে ধূপধুনো জ্বেলে তারা উপাসনা করে।

স্বদেশে ফিরে এসেও হিব্রুরা অর্থাৎ ইস্রায়েলগণ শান্তি পেল না। সুদীর্ঘ তিনশ বছর ধরে শত্রুদের সাথে তাদের যুদ্ধ করতে হল। অবশেষে তারা জয়ী হল এবং শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

যাকোবের বারজন পুত্রের নামে ইস্রায়েলগণ বারটি বংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে জুডা বংশই শ্রেষ্ঠ। এই বংশে ডেভিড, সালোমন প্রভৃতি ইতিহাস বিখ্যাত রাজা জন্ম গ্রহণ করেন।

ইস্রায়েল জাতির নায়কদের বলা হত 'বিচারক'। তারা দেশকে পরিচালনা করতেন। তাঁদের মধ্যে গেদেয়ন, সিমসন, জেফতে ও সামুয়েল এরা বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য। এদের পর তাদের পরিচালনা করেন রাজা। এই রাজাদের মধ্যে শৌল, ডেভিড ও তাঁর পুত্র সলোমন উলে-খযোগ্য। সলোমনের মৃত্যুর পর প্যালেষ্টাইন দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তর অঞ্চলকে বলা হত ইস্রায়েল ও দক্ষিণ অঞ্চলকে বলা হত জুডা।

এরপর এরা আবার ঈশ্বরের আদেশ ভুলে গেল। তারা "দশ আজ্ঞা" পালন করতো না এবং অর্ধমে ডুবে গেল। ফলে তারা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ল। এই সুযোগে আসিরিয়া তারপর ব্যাবিলনের রাজশক্তির আগমনে তারা পরাজিত হল। এরপর তারা হল পারস্য রাজের অধীন। এইভাবে পরাধীন অবস্থায় তারা নির্বাসিতের মত জীবন যাপন করতে থাকে। বিদেশী শক্তির অত্যাচারে জেরুসালেম শহর এবং ধর্ম মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। অবশ্য বহু বৎসর পরে ইহুদীরা আবার ঐ মন্দিরটি তৈরী করে এবং যীশুর সময় পর্যন্ত ঐ মন্দিরটি ছিল।

নির্বাসন দন্ড ভোগের পর দেশে ফিরে এসে ইস্রায়েলগণ দুটি রাজ্য এক

করে নেয়, এবং একই রাজা দ্বারা শাসিত হয়। এই রাজ্যটির নাম হয় জুডা আর এই জুডা থেকেই রাজ্যের অধিবাধীদের নাম হয় 'জু' বা ইহুদী।

মহাবীর আলেকজান্ডার এবং তার পরবর্তী রাজণ্যবর্গ ইহুদীদের প্রতি উদার মনোভাব দেখিয়েছিলেন। তারপর সুরিয়ার রাজা ৪র্থ এপিকানিয়াসের সময়ে ইহুদী ধর্মের প্রতি অত্যাচার এবং উৎপীড়ন শুরু হয়। ইহুদীরাজ মাকারিয়াস ও তাঁর পাঁচ ছেলে পরপর প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে অত্যাচারী রাজাকে তাড়িয়ে দেন ও নিজেরা যুদ্ধে প্রাণ হারান।

যদিও রোমানগণ প্যালেষ্টাইন অধিকার করেছিলেন তবুও তাঁদের অধীনে ইহুদী রাজারাই প্যালেষ্টাইন শাসন করতেন। কিন্তু প্যালেষ্টাইনবাসীরা প্রায়ই রোমানদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাত। ফলে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮ সালে রোমনগণ ইদুসিয়া প্রদেশের অধিবাসী হেরোডকে প্যালেষ্টাইনের রাজারূপে মনোনীত করেন। এই হেরোডের রাজত্বকালেই যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেন।

এরপর রোমান সেনাপতি তিতাসের আদেশে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে জেরুসালেম এবং সেখানকার মন্দির ধ্বংস হয়। তারপর দেশত্যাগী ইহুদীরা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র পৃথিবীতে।

ইহুদীদের উপাসনার স্থানগুলিকে বলে "সিনাগগ"। প্রতি শনিবার, উপবাসের দিন (সোম ও বৃহস্পতিবার) এবং বিশেষ পর্ব উপলক্ষে প্রার্থনা ও শাস্ত্র পাঠের জন্য ইহুদীরা এখানে সমাবেত হয়।

ইহুদীদের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসবগুলো হলো ১। নিস্তার বা 'পাস্কা' উৎসব। সুদীর্ঘ ৪৩০ বৎসর যাবৎ ইহুদী জাতি ক্রীতদাসরূপে মিশর দেশে বসবাস করেছিল। মোশী সর্বপ্রকার বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ইহুদীদের উদ্ধার

করে স্বদেশে নিয়ে আসেন। এই বিশেষ দিনটির স্মরণে জাতি নিস্তার বা 'পাস্কা' পার্বণ পালন করে। 'নিসান' মাসে বাংলা চৈত্র মাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

(২) পঞ্চাশত্তম বা পেন্টিকোষ্ট - পাস্কার সাত সপ্তাহ পর এই পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। ঈশ্বর কর্তৃক মোশীকে বিধি ব্যবস্থা এবং দশ আজ্ঞা দানের কথা স্মরণ করে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গাছের নূতন ফল এবং উৎপন্ন ফসলের কিছুটা অংশ মন্দিরে দান করা এই উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ।

(৩) শিবির (তাঁবু) উৎসবঃ মিশর দেশ থেকে উদ্ধার পেয়ে ইহুদীগণ ৪০ বৎসরকাল আরব মরুভূমিতে অবস্থান করে। এই সময়ের কথা স্মরণ করে ইহুদীরা এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি পালন করে। এই উপলক্ষে ইহুদীরা এক সপ্তাহ ব্যাপী তাঁবুতে অথবা গাছের ডাল দিয়ে তৈরী ছোট ছোট ঘরে বাস করে। এ সময় প্রতিদিন মন্দিরে বেশ আড়ম্বরের সাথে সঙ্গীত পরিবেশন হয় এবং সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়।

এছাড়া আছে (৪) মন্দিরের পুনঃ পবিত্র করণঃ এই দিনটির স্মরণে একটি বিশেষ ধর্মীয় উপাসনা প্রতি বৎসর হয়।

গুরু নানক

(১৪৬৯-১৫৩৯)

শিখ ধর্মের প্রবর্তক

এই পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, শিখ, পার্শী, জৈন, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, আরও কতো কি।

শিখ জাতির কথা তোমরা সবাই জানো। পাঞ্জাবের অমৃতসরের 'স্বর্ণ মন্দিরের' নাম শুনেছো না? এটা হলো শিখদের প্রধান মন্দির।

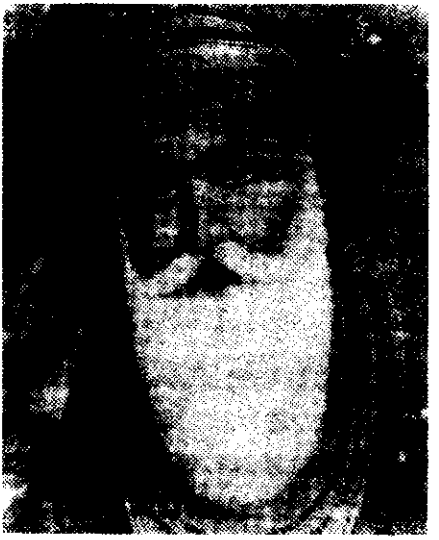

শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গুরু নানক। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লাহোরের নিকটবর্তী তালবন্দী গ্রামে এক শুভ পূর্ণিমা তিথিতে গুরু নানক জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে এই তালবন্দী গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে নানকানা সাহেব। নানকের পিতার নাম মাহতা কালুবেদী, আর মায়ের নাম মাতা ত্রিপতা। তাঁরা ছিলেন বেদী বংশীয় ক্ষত্রিয় এবং জাতিতে ছিলেন জাঠ। নানকের পিতা কৃষি ও ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করতেন।

সাধারণত ঃ যে বয়সে শিশুরা খেলাধূলায় মেতে থাকে সেই বয়সেই নানক ছিলেন চিন্তাশীল, মিতভাষী এবং ধর্মপ্রবন। ছেলেবেলাতেই তার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। অতোটুকুন বয়সেই নানক ঈশ্বর সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করে শিক্ষক মহাশয়কে হতবুদ্ধি করে ফেলতেন। পাঠশালার পড়া শেষ করে নানক বৈদ্যনাথ নামে একজন পন্ডিতের কাছে সংস্কৃত ও মৌলবী কুতবুদ্দীন মোল-া সাহেবের কাছে

পারসী শিখেন। এ সময় নানকের তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায় । তিনি সংস্কৃত ও পারসী উভয় ভাষার বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণ নিয়ে এক একটি ভাবপূর্ণ সুন্দর শে-াক রচনা করে শিক্ষক দুইজনকে অবাক করে দিয়েছিলেন। শৈশব থেকেই গুরু নানকের মন তখনকার কুসংস্কার, কুপ্রথা-অর্থহীন ধর্ম কেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি মেনে নিতে পারেনি।

এ-সম্বন্ধে একটি ঘটনা শোন। একদিন বালক নানক বিপাশা নদীতে গেলেন গোসল করতে। কয়েকজন ব্রাহ্মণকে জল নাড়া-চাড়া করেতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- আপনারা জল দিয়ে কি করছেন।

একজন ব্রাহ্মণ উত্তর দিল, "আমাদের পরলোকগত পূর্বপুরুষদের জলদান করিতেছি।"

তখন বালক নানক হাত দিয়ে তীরে জল সেচন করতে লাগলেন।

বিনা প্রয়োজনে নানককে এ-রকম জল-সেচন করতে দেখে ব্রাহ্মনেরা জিজ্ঞাসা করলো-বালক, তুমি জল নিয়ে কি করছো? নানক বললেন- "আমি আমার তালবন্দীর শাকের ক্ষেতে জল সেচন করছি।" একজন ব্রাহ্মণ বললেন, 'তুমি কি নর্বোধ, তোমার শাকের ক্ষেত রয়েছে তালবন্দীতে, আর এখানকার ভূমিতে তুমি জল ছড়াচ্ছো ? এই জল দিয়ে কি সেই ক্ষেত্র সিঞ্চিত হবে?" নানক বলে উঠলেন- 'কে বেশী নির্বোধ ? আপনি না আমি ? আপনিই বলছেন যে, আমার এই জল কয়েক ক্রোশ দূরে তালবন্দীতে পৌঁছুবেনা, তা'হলে আপনারা ঐ জল কি করে আপনার পরলোকগত পূর্বপুরুষদের নিকট পৌঁছুবে ?

এ- কথা শুনে তো ব্রাহ্মনেরা অবাক হয়ে গেলেন।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে নানক ধর্মের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হতে লাগলেন। সংসারের কোন কাজ বা আয় উন্নতির দিকে তার কোন মন নেই । সাধু, সন্ন্যাসী ও ফকিরদের দিকে তাঁর মন ঝুঁকে গেল। পিতা কালুবেদী ছেলের এ মতি-গতি দেখে বেশ চিন্তিত হলেন। নানক পিতার কথামতো গরু মহিষ নিয়ে মাঠে যেতেন এবং পশুগুলোকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে একাকী নির্জনে কোন গাছের নীচে বসে ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতেন। পশুগুলো দেখা গেল কারও ক্ষেত নষ্ট করেছে। এমন ও হতে লাগলো কোন গরু মহিষ খুঁজেই পাওয়া যেত না। এ-সব শুনে নানকের পিতা তাকে গরু চরানোর কাজ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে কৃষিকাজে লাগিয়ে দিলেন এবং বললেন মন দিয়ে কৃষিকাজ করতে। একদিন নানক বললেন, "বাবা, আমি একটি

নূতন ক্ষেত পেয়েছি। সেই ক্ষেতের চাষ আরম্ভ হয়েছে। নূতন নূতন অংকুর বের হচ্ছে, আমাকে সেই দিকেই খেয়াল রাখতে হচ্ছে। অন্যের ক্ষেতের দিকে দৃষ্টি দেবার সময় কই আমার ? "

নানকের সংসারী পিতা এ কথার কোন অর্থ বুঝতে পারলেন না। তিনি নানককে একটি অপদার্থ, অকর্মন্য ছেলে বলে ধমক দিলেন।

নানককে দিয়ে কৃষিকাজ ও হলোনা। পিতা এবার নানককে ব্যবসায়ের কাজে লাগালেন। তিনি নানকের হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, "এক গ্রাম থেকে লবন কিনে আর এক গ্রামে বিক্রি করে এস। "

নানক টাকা নিয়ে বালাসিন্দু নামে এক ভৃত্যকে সাথে নিয়ে লবন কিনতে গেলেন। এমন সময় পথে কতগুলো সাধু ফকিরের সাথে তাঁর দেখা হয়ে গেল। সাধুদের দেখে তাঁর খুব ভাল লাগলো। তিনি তাদের সাথে ধর্মের আলাপ করবেন ভেবে কাছে গেলেন। কাছে গিয়ে দেখেন, তারা তিন দিনের উপবাসী। কথা বলবার শক্তি ও নেই।

নানক তখন কাতরভাবে ভৃত্য বালাসিন্ধুকে বললেন, আমার বাবা লবনের ব্যবসা করার জন্য কিছু টাকা দিয়েছেন। আমার বড় ইচ্ছা এই টাকা দরিদ্র সাধুদের দান করে তাদের কষ্ট দূর করি।

বালাসিন্ধু নানকের এই কথায় সায় জানালেন।

নানক সব টাকা ফকিরদের দিয়ে দিলেন । ফকিররা কিছু খাওয়া দাওয়া করার পর সুস্থ হলো এবং নানককে ধর্মের কথা শুনালো। নানকের মন আনন্দে ভরে গেল।

কিন্তু নানকের বাবা এ কথা শুনে দারুন রেগে গেলেন এবং নানককে এ জন্যে শাস্তি দিলেন।

দেখতে দেখতে নানক বিশ বৎসরে পড়লেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁর ঈশ্বর-প্রীতিও বেড়েছে। বাবা অনেক চেষ্টা করেও সংসারের দিকে তাঁর মন ফিরাতে পারলেন না। সন্নাসী ও ফকিরের সাথেই মিশতে ভালবাসতেন নানক। একবার হলো কি, নানক এক সন্নাসীকে একটি সোনার আংটি ও পানপাত্র দিয়ে দিলেন। ছেলের এই দানের কথাও নানকের বাবা ভীষণ রেগে গিয়ে নানককে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

নানকের বাবা কালুবেদী ছিলেন তালবন্দী গ্রামের জতিদার রায় বুলারের একজন অনুগত কর্মচারী। বুলার আবার নানককে পরম সাধুজ্ঞানে ভক্তি করতেন। তিনি এ সময় নানককে সুলতানপুরে তার বোনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ভগ্নীপতি জয়রাম নবাব দৌলত খাঁ লোদীর অধীনে রশদ বিভাগের মুদিখানার কর্তা ছিলেন। নানক এই মুদিখানায় কাজ করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি যা আয় করতেন, সবই সাধু সেবায় ব্যয় করে ফেলতেন।

নানকের পিতা তখন নানককে সংসারী করার জন্যে সুলক্ষনী নামে এক সুন্দরী বালিকার সাথে তার বিয়ে দিলেন। কিন্তু বিয়ের পরও নানকের মনের কোন পরিবর্তন হলো না। তিনি আগের মতই সংসারের প্রতি উদাসীন রয়ে গেলেন।

একদিন নানক মুদিখানার কাজ করছেন, এমন সময় এক সন্ন্যাসী এলেন সেখানে। তিনি নানককে বললেন, ভগবান আপনাকে অতি মহৎ কাজের ভার দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছেন। আপনার নাম 'নানক নিরহঙ্কারী'। আপনি কি ঈশ্বরের নাম কীর্তণ করবেন, না মুদিখানার কাজে জীবন কাটিয়ে দিবেন ?

সন্ন্যাসীর কথায় নানকের মনে একটি বিরাট পরিবর্তন এলো। তিনি স্ত্রী সুলখ্নী, চার বৎসরের ছেলে শ্রীচাঁদ, শিশুপুত্র লক্ষীদাস, পিতা মাতা সবাইকে ছেড়ে সাংসার থেকে চলে গেলেন। এ সময় নানকের বয়স ছিল ৩২ বৎসর।

নানকের বাবা নানকের গৃহ ত্যাগের খবর পেয়ে মর্দ্দানা মিরাসী নামে এক ব্যাক্তিকে নানকের কাছে পাঠালেন। মর্দ্দানা নানককে ধরতে গিয়ে নিজেই তাঁর কাছে ধরা দিলেন। নানকের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সাংসারত্যাগী হলেন। মর্দ্দানা সুন্দর গান গাইতে পারতেন। নানক যে সব শে-াক ও কবিতা রচনা করতেন তিনি সে সব গাইতেন। মর্দ্দানা ছাড়া চাকর বালাসিন্ধু ও নানকের সঙ্গী হলেন।

নানক ফকিরের বেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কোন পথ তিনি অবলম্বন করবেন ? কোন্ ধর্মমত শ্রেষ্ঠ তা নির্ণয় করার জন্য তিনি ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং বর্তমানে বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, তিব্বত, বার্মা, সিংহল, মক্কা, বাগদাদ, তুরস্ক, মিশর, পারস্য, কাবুল, চীন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ভ্রমন করেন। কথিত আছে যে, দেশ ভ্রমণকালে তিনি রাস্তায় কোন শিশু দেখলে তার সাথে মিশে শিশুর মতো হয়ে যেতেন এবং তার সাথে খেলাধূলা করতেন।

এসময় নানক অনেক সুন্দর সুন্দর গান রচনা করে ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনা করেন।

শুনবে একটি ?

তু সুন হরি রস ভিন্নে প্রীতম্ আপনে।
মন তন রবনে ঘড়ী ন বিসরৈ
কিউ ঘড়ী বিসায়ী হউ বলহারী
হউ জীবা শুন গা-এ
না কোঈ মেরা হউ কি সকেরা
হরি বিন রহন না জা এ।
ওট গহী হরি চরণ নিবাসে
ভয়ে পবিত্র শরীরা।
নানক দ্রিসট দীরঘ সুখ পাব
গুরু সবদী মন ধীরা।"

এর অর্থ কি জানো ? ওগো হরি তোমার প্রীতিতে তোমার প্রেমে আমি সরস হয়েছি। আমর হৃদয় গলে গেছে। আমার প্রার্থনা শোন। তোমার সঙ্গে যে আমার মনে ও প্রাণে মাখামাখি। এ কথা কি আমি ক্ষনিকের জন্য ও ভুলতে পারি ? কেন পারব ? আমি যে তোমার চরণে নিজেকে সঁপে দিয়েছি। তোমার গুণ গেয়েই আমি বেঁচে আছি। আমার যে কেউ নেই। আমি যে কার, তাওত জানি না। তোমার আশ্রয় পেয়ে, তোমার চরনে স্থান পেয়ে আমার শরীর ও মন পবিত্র হয়েছে। নানক বলেছেন, যদি তোমার কৃপা দৃষ্টি হয়, তা'হলেই সুখী হওয়া যায়, গুরুর উপদেশে মন শান্ত হয়।

এ-ভাবে সন্ন্যাসীর বেশে বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে দীর্ঘদিন পর ১৫২০ সালে তিনি ফিরে আসেন পাঞ্জাব। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ৫১ বৎসর।

নানক সপরিবারে বিপাশা নদীর তীরে কর্ত্তারপুরে বাস করতে থাকেন এবং প্রচার করতে লাগলেন তার ধর্মমত - এক উদারপন্থী মতবাদ। নানকের মত অনুসারে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন আকার নেই। তিনি নিরাকার। একমাত্র ঈশ্বর সত্য, আর সব অস্থায়ী। ঈশ্বরকে লাভ করার জন্যে সংসারত্যাগী হবার দরকার নেই। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে ঈশ্বর মিশে আছেন। যে

মানুষকে ভালবাসবে, সে শান্তিতে থাকবে।

সকল ধর্মের প্রতিই ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা। তিনি তাঁর ধর্মমতে সকল ধর্মের সমন্বয় সাধন করতে চেষ্টা করেন। তিনি মুসলমানকে উপদেশ দেবার সময় কোরআন শরীফ হতে বচন উদ্ধৃত করে উপদেশ দিতেন এবং হিন্দুকে উপদেশ দেবার সময় হিন্দুশাস্ত্রের উলে-খ করতেন। ফলে তাঁর হিন্দু-মুসলমান অনেক শিষ্য হলো। তবে হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ, মূর্তিপূজা ইত্যাদি তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন, ধর্মের মূলকথা হলো, আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা, আত্মার উন্নতি ও বিকাশ। বাহ্যিক ভাবে পূজা, উপাসনা এবং মন্দির, মসজিদ, গীর্জা ইত্যাদিতে প্রার্থনা করার চেয়ে আত্মার শুদ্ধিই বড় কথা। তবে ঈশ্বরকে পাবার জন্য সৎ গুরুর উপর নির্ভর করতে হয়।

তিনিই শিষ্যকে ঈশ্বরের সন্ধান বলে দেবেন।

নানক আরও বলতেন- কে কোন্ জাতি, ঈশ্বর কখনও তার সন্ধান নেবেন না, সংসারে এসে কে কি করলাম, সেটাই তিনি দেখবেন। সকলের মধ্যে যে জ্যোতিঃ সেটা তাঁরই জ্যোতিঃ। তাঁর প্রকাশে সকলি প্রকাশিত হয়।

গুরু নানকের প্রচারিত এই ধর্মের নাম শিখ ধর্ম। শিখ শব্দের অর্থ কি জানো ? এর অর্থ হলো শিষ্য। তাঁর সকল শিষ্যই শিখ নামে পরিচিত। নানকের সহচর ভক্তদিগের মধ্যে মর্দ্দানা, বালাসিন্ধু, তুঙ্গ গ্রামের রামদাস নামে এক রাখাল ও ছিলেন। রামদাস বয়সে সবার চাইতে বেশী বলে সবই তাকে 'বুড্ডা' বলে ডাকত। তবে নানকের সহচরদের মধ্যে লহনা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। নানক তাঁর শ্রদ্ধা ভক্তি ও ধর্মপ্রাণতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি লহনাকে "গুরু-অঙ্গদ" নাম দিয়ে দ্বিতীয় গুরুর পদে বরণ করেছেন। লহনা জাতিতে ছিলেন ক্ষত্রিয়।

নানক জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই তাঁর শিষ্য করতেন। তবে জাঠ সম্প্রদায়ের কৃষকেরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল বেশী। অল্প সময়ের মধ্যে এই ধর্ম খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের পাঞ্জাব এবং সিন্ধু-প্রদেশে এই ধর্ম বিশেষ ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। নানকের মতবাদ এমন বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল যে, মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে এই ধর্ম বিরাট শিখ জাতির জন্ম দিয়েছিল। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে দিল-ী অবধি এই ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল।

এখন শিখ জাতির ইতিহাস ও ধর্ম ও ধর্ম সম্বন্ধে কিছু শোন -

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিখ সম্প্রদায়ের ওপর বেশ অত্যাচার চলে। তাদের অবদমিত করার চেষ্টা হয়, এতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুন্ন হয়। শিখরা তখন তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চরম আহুতি দেয়। মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ও তখন বিপন্নের পথে। আহমদ শা আবদালির নেতৃত্বে আফগান আক্রমণ শুরু হলো। শিখরা এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। অবশেষে মহারাজা রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে (১৭৮০-১৮৩৯ খৃঃ) শিখরা সাফল্য লাভ করে।

শিখ সাম্রাজ্য প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পর্যন্ত অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার তাদের পরাধীন করে।

তারপর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক শিখ সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে। ফাঁসির দড়ি গলায় পরে, অনেক নির্যাতন সহ্য করে-একমাত্র উদ্দেশ্য দেশকে পরাধীনতা থেকে শৃঙ্খলমুক্ত করা।

শিখরা কঠিন কাজে খুব দক্ষ। যদিও ভারতের জনসংখ্যার মাত্র দুই শতাংশ শিখ ধর্মাবলম্বী, তবুও তারা সমাজ জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। বিশেষ করে সেনাবিভাগে তাদের দক্ষতা অসাধারণ। এছাড়া কৃষি, খেলাধূলা শিল্প, শিক্ষা, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতিতেও তাদের প্রচুর দক্ষতা। তাদের দুর্জয় অভিযাত্রিক মনোবৃত্তির জন্য তারা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম গুরু গ্রন্থসাহেব।' গ্রন্থটি গুরুমুখী ভাষায় লেখা। শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুন দেব পূর্ব গুরুদের বাণী নিয়ে এটির সংকলন করেন ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে। এই গ্রন্থে শিখ গুরুদের নির্দেশ ও রচনাবলী ছাড়াও রয়েছে একাধিক মুসলমান সুফী সাধকের ও হিন্দু ভক্ত, সাধকের বক্তব্য ও বাণী । এরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসী ছিলেন। যেমন মূলতানের শেখ ফরিদ, বাংলার জয়দেব ভক্ত, কবীর ভক্ত, রবিদাস চামর, ভক্ত নামদেব ইত্যাদি। গুরু অর্জুন অমৃতসরের বিখ্যাত শিখ ধর্মমন্দির 'দরবার সাহেব' প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্বর্ণমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্যে গুরু অর্জন হযরত মিয়া মীর নামে একজন প্রখ্যাত মুসলমান ফকিরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই আমন্ত্রণ জানানোর মূল উদ্দেশ্য কি ছিল জানো ? সবাইকে জানানো যে, সব মানুষই এক ঈশ্বরের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের কোন বিরোধ নেই

এটা বোঝানো।

এই 'দরবার সাহেবে' চারিদিক দিয়ে ভিতরে যাবার ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ যে কোন দিক দিয়ে যে কেউ অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে। যারা আত্মার আনন্দ ও আধ্যাত্মাচিন্তায় মগ্ন হতে চান পৃথিবীর যে কোন দেশের জাতি, ধর্ম বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এখানে প্রবেশ করতে পারে।

শিখ ধর্ম একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। পরম শক্তিমান একমাত্র ঈশ্বরই সব শক্তির আধার। শিখ ধর্মে বলে - জীবন পঙ্কিল নয়। পবিত্র উৎস হতে সৃষ্ট। পরম সত্য তার জন্মস্থল। গুরু নানক তাই বলেছেন -

'হে আমার অন্তঃকরণ

তুমি পরম আলোকের একটি স্ফুলিঙ্গ

তুমি তোমার স্বরূপ উপলব্ধি কর।"

শিখরা বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী নয়। তারা মূর্তি পূজা করে না। দেবী দেবতা বিশ্বাস করে না এবং ধর্মীয় কুসংস্কার ও নেই। তাদের ধর্মের মূলকথা - বাস্তব জীবনযাপন, মানব সমাজের সেবা, সহিষ্ণুতা প্রদর্শন, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এবং প্রত্যেকের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখা। মানব সেবাই শিখধর্মের সবচেয়ে মৌলিক কর্মধারা। গুরু নানক বলেছেন, 'আমাকে অবেহেলিত বঞ্চিত মানুষের মধ্যে চিনে নাও।' সব শিখ গুরুই জাতিধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দরিদ্র সাধারণ মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে সচেষ্ট হন।

শিখ গুরুরা বলেননি - জাগতিক বিধি বন্ধন ছিন্ন করে পরমার্থের সন্ধান করতে। বলেছেন সৎ ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে।

"সে একাই হে নানক

সঠিক পথ পারে চিনতে

যে জীবিকা নির্বাহ করে

কপালে ঘাম ঝরিয়ে

এবং তারপর

অপরের সঙ্গে ভাগ করে

খাবার খায়।"

শিখরা নৈরাশ্যবাদে বিশ্বাসী নয়। তারা আশাবাদে বিশ্বাসী। "তোমার ডান গালে আঘাত করলে বা গাল পেতে দাও"। এই মতের কোন দাম নেই শিখদের কাছে। উপরন্তু তাদের বক্তব্য হলো।

"যখন সব উপায় শেষ হয়েছে

অথচ সমস্যার সামাধান হয়নি

তখন যথার্থ কাজ হবে

খাপ থেকে তলোয়ার বার করা।"

কথাটি বলেছেন শিখদের দশম এবং শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৬৬-১৭০৮ খুঃ)। তিনি প্রথম শিখ ধর্মান্তকরণ উৎসব উদযাপন করেন ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে। তিনি দেখলেন শিখদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে এবং তাদেরকে শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করতে হলে শিখদের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। তিনি সর্বপ্রথম শিখ জাতিকে একটি সামরিক জাতিতে পরিণত করেন। তারা হয়ে উঠল দুধর্ষ যোদ্ধা। তাদের নতুন নাম হল খালাসা। খালাসা শব্দের অর্থ কি জানো? ঈশ্বরের সম্পত্তি। তাদের চিহ্ন হলো ৫টি। প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষর 'ক' । এগুলি হলো - কেশ (লম্বা চুল) কঙ্গ (চিরুনী) কড়া (বালা), কচ্ছা (ছোট প্যান্ট) এবং কৃপাণ (তরোয়াল)। অর্থাৎ বড় চুলদাড়ি, খাটো জাঙ্গিয়া, হাতে লোহার বালা, চুলে চিরুণী আর কোমরে তরোয়াল। প্রতিটি শিখ এসব চিহ্ন ধারণ করে।

প্রত্যেক শিখের জন্যে অমৃত অর্থাৎ শিখ ধর্মান্তকরণ বাধ্যতামূলক । এর জন্যে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। শিখদের দশজন ধর্মগুরু যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই বিধি-নিয়ম পালনই শিখ ধর্মপালনের মূল-মন্ত্র।

শিখধর্ম বাস্তববোধ সম্পন্ন আশাবাদী ধর্ম। মানুষের মনের প্রগতিশীলতায় এই ধর্ম আস্থা রাখে। এই ধর্ম মানুষকে শিক্ষা দেয় কিভাগে পৃথিবীতে সুষ্ঠ স্বাভাবিক জীবন যাপন করা যায় এবং সমাজে প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করা যায়। যে কোন ধর্মের, জাতির, যে কোন নারী বা পুরুষ, সমাজের যে কোন স্তরের ব্যক্তি, যারা শিখ ধর্মমতে ও আদর্শে বিশ্বাসী তারা শিখ হতে পারে এবং খাল্‌সা পন্থে যোগ দিতে পারে।

শিখ আচরণ বিধিকে 'রেহাত্ মর্য্যাদা' আখ্যা দেওয়া হয়। গ্রন্থ সাহেবের শিক্ষা সূত্রের ওপর এটি নির্ভরশীল। এগুলি ব্যবহৃত হয় সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মীয়

শৃঙ্খল একইভাবে পালনের জন্য। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এর কোন নিয়ম কানুন পরিবর্তন করতে পারে না এবং কোন নতুন বিধি ও সংযুক্ত করতে পারে না। এই ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র 'পন্থের' ওপর। মূল শিখনীতি বিরোধী যে কোন নতুন নিয়মই অবৈধ।

শিখ ধর্মে কোন মাদক জাতীয় দ্রব্য, মদ, তামাক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। ব্যভিচার পাপ হিসাবে গণ্য হয়। অপরের কন্যাকে স্বীয় কন্যা এবং পরস্ত্রীকে ভগিনীরূপে বা মাতৃরূপে গণ্য করা নিয়ম। সমাজে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান, স্বীকৃত। পরিবারে এবং সমাজে প্রয়োজনীয় ভূমিকার জন্য তারা সম্মানিত হন। কন্যা সন্তানকে হেয় করা হয়না। বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। সমাজের সর্বক্ষেত্রে মহিলাদের ও সমঅধিকার আছে। শিখ সমাজে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। কোন চুক্তিমাত্র নয়। বিবাহিত ও পারিবারিক জীবন মর্যাদাসম্পন্ন, স্বাভাবিক ও আদর্শ হতে হবে। বিবাহের সময় নব-দম্পত্তি গুরু সাহেবকে চারবার প্রদক্ষিণ করবে। প্রতিবারই পুরোহিত শে-াক উচ্চারণ করবেন। চারটি শে-াকে যে ভাবে নির্দেশ দেওয়া আছে সেইভাবে তাদের বিবাহিত জীবন যাপনের জন্যে নির্দেশ দেবেন পুরোহিত। বিধবা বিবাহের সময় ও একই রীতি পালন করা হয়।

প্রত্যেক শিখের খুব ভোরে সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে ওঠার নিয়ম। স্নান শেষ করে কিছুক্ষণ ঈশ্বরের ধ্যান করতে হবে।

"খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠো এবং
তাঁর নামে ধ্যান করো,
হ্যাঁ, দিবস এবং রাত্রি
প্রভুর সঙ্গে বাস কর,
তাহলে কখনো দুঃখ পাবে না
এবং তোমার সমস্ত যন্ত্রনা দূর হবে। (গুরু গ্রন্থ)"

এছাড়া নিম্নলিখিত পাঁচটি রচনা প্রতিদিন আবৃত্তি করা হয় ঃ

সকাল- জপজী সাহিব, জাপ সাহিব, এবং দশ সোবায়্যে

বিকাল - রেহরাস।

রাত্রি - (শয়নের পূর্বে) সোহিলা।

একজন শিখের নিয়মিতভাবে ধর্মমন্দির গুরুদ্বারে যেতে হয়। গুরুদ্বার কাকে বলে জানো তো ? শিখদের উপাসনাগৃহ বা ধর্মমন্দির। প্রত্যেক গুরুদ্বারের

মুখ্যভবনে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ "গুরু গ্রন্থ সাহেব' স্থাপিত হয়। এটা প্রতিদিনের প্রার্থনার জন্যে প্রয়োজন হয়। গুরুদ্বারে প্রবেশের আগে জুতো সেন্ডেল ইত্যাদি খুলতে হয়, এবং মাথা ঢাকতে হয়। মূল ভবনে প্রবেশের পর পবিত্র গ্রন্থকে অভিবাদন জানিয়ে সকলে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করে। যে কোন শিখ পুরুষ বা মহিলা প্রার্থনা সভা পরিচালনা করতে পারে বা দৈনন্দিন মন্দিরের কাজকর্ম করতে পারে। উপাসনা শুরু হয় বাদ্য-যন্ত্র সহযোগে স্তোত্রপাঠের মাধ্যমে। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে সঙ্গীতের মাঝে বক্তৃতা, কবিতা পাঠ বা শিখ ইতিহাসের উলে-খযোগ্য ঘটানাবলী বিশে-ষণ করা হয়।

উপাসনা শেষ হয় 'অরদাস' বা ধর্মীয় প্রার্থনার পর। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়, যাতে তিনি সুখ, সমৃদ্ধি শান্তি ও প্রত্যেক মানুষের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন।

নিজেদের বাড়ীতে বা গুরুদ্বারে শিখরা প্রাত্যহিক প্রার্থনা 'অরদাস' শেষ করে এইভাবে।

"হে প্রভু তোমার নাম যেন উত্তরোত্তর ধ্বনিত হয় -
যেন সমস্ত মানুষ তোমার দয়ায়
উন্নতি লাভ করে।"

প্রার্থনা শেষ হলে একটি "শব্দ" (স্তোত্র) পাঠ করা হয় পবিত্র গ্রন্থ হতে। তারপর ভক্তবৃন্দকে 'কড়া পরসাদ' পরিবেশন করা হয়। এটা কি জানো? আটা-চিনি ঘি দিয়ে তৈরী হালুয়া।

গুরুদ্বারের আরও দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে। একটি হলো সঙ্গত অর্থাৎ ধর্মসভা আর একটি পঙ্গত, অর্থাৎ যৌথ পাকশালা ও পংক্তি ভোজন। একে গুরু কা লঙ্গর ও বলা হয়। এই পাকশালার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক ভক্ত, পরিব্রাজক ও অতিথীকে খাদ্য দান। এটি সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। এখানে উচ্চ-নীচ, ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত-মূর্খ রাজা ও ভিখারি সকলেই এক সাথে এক পংক্তিতে বসে একই খাবার খায়। একবার সম্রাট আকবর গোয়িনডোয়ালে গুরু অমরদাসের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। তখন প্রথমেই তাকে অনুরোধ করা হয় 'পঙ্গতে' বসতে। সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে রাজী হন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে অতি সাধারণ খাবার খান।

অধিকাংশ বড় বড় গুরুদ্বারে নিয়মিতভাবে "পঙ্গত" বা গুরু কা লঙ্গর চালু থাকে। তবে উৎসব পার্বনে সব গুরুদ্বারেই এই প্রথা চালু হয়। এই পাকশালা

শিখদের দান-দক্ষিণায় চলে। বলা যায়, লঙ্গর প্রথাটি একটি মহামিলন ক্ষেত্র বিশেষ - সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে সামাজিক সাম্য রক্ষার একটি উপায়।

প্রত্যেক গুরুদ্বারে হলুদ রংয়ের পতাকা থাকে। একে বলা হয় 'নিশান সাহিব'। এতে দু'দিকে ধারঅলা তলোয়ারের ছবি আঁকা থাকে। একে বলা হয় 'খান্ডা'। এই নিশান হলো শিখ জীবনের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার মিশ্রণের প্রতীক।

প্রত্যেক শহরে বা নগরে প্রয়োজন অনুযায়ী গুরুদ্বার রয়েছে। তবে বেশ কয়েকটি গুরুদ্বার আছে যা শুধু ধর্ম মন্দির-ই নয়। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও অপরিসীম। পাঁচটি প্রধান মুরুদ্বার 'তখত্' নামে খ্যাত। এগুলো হলো বিহারের 'তখ্ত পাটনা সাহিব' আনন্দপুর সাহিবের 'তখ্ত কেশগড় সাহিব, তালওয়ান্দি সাবোর তখ্ত দমদমা সাহিব', মহারাষ্ট্রের নানদের তখ্ত হুজুর সাহিব' এবং অমৃতসরের 'অকাল তখ্ত সাহিব'।

এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অকাল তখ্ত। এখান থেকে শিখ সম্প্রদায়ের জন্য প্রায়ই শুধু ধর্মীয় নয়, দৈনন্দিন জীবন-যাপন সম্পর্কিত নির্দেশ ও জারী করা হয়। এই নির্দেশগুলিকে বলা হয় 'হুকুমনামা।' এগুলি শিখ ব্যক্তিগত আইনের আওতায় পড়ে। এগুলি বাধ্যতামূলক এবং অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

শিখদের মধ্যে পুরোহিত বলে পৃথক কোন শ্রেণী নেই। তবে যিনি প্রতিদিনের উপাসনা পরিচালনা করেন তাকে বলা হয় 'গ্রন্থি'। যারা স্তোত্র পাঠ করেন তাদের বলা হয় 'রাগী' আর ধর্মসঙ্গীতকে বলা হয় কীর্তন।

পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধর্ম, যেমন ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট ধর্মের সঙ্গে শিখ ধর্মের অনেক মিল আছে। যেমন -

মূর্তিপূজা না করা। এবং একমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস - এ ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে মিল আছে।

এক ঈশ্বর, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানব সেবা, এই ক্ষেত্রে খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে মিল আছে।

সমবেত প্রার্থনা, ধর্মসভার ক্ষেত্রে মিল আছে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে। বৌদ্ধরা বলে সংঘ, শিখরা বলে 'সাধ সঙ্গত'।

ভক্তিবাদ, পুর্নজন্মবাদ, কর্মফলে বিশ্বাস এই ক্ষেত্রে মিল আছে হিন্দুধর্মের সাথে।

শিখদের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ উৎসবগুলো হলো

- জন্মদিন পালন, সন্তানের নামকরণ অমৃত (ধর্মান্তকরণ), আনন্দ করজ (বিবাহ) এবং মৃত্যু শনসৎকার। এর মধ্যে মূল্যবান হলো 'অমৃত' পান উৎসব।

এইসব উৎসবের পৃথক কোন রীতিনীতি নেই। গুরু গ্রন্থ সাহেবের "শে-াক" পাঠই একমাত্র বাধ্যতামূলক। শে-াক বা স্তোত্রকে বলা হয় 'শবদ'।

মৃতদেহ দাহ করা হয়, এবং ভস্ম নিকটস্থ খাল বা নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। কোন একটি নির্দিষ্ট নদীকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কোন স্মৃতিফলক তৈরী ও নিষিদ্ধ।

এছাড়া শিখরা আর ও ৫টি উলে-খযোগ্য দিন পালন করে (১) দশজন গুরুর জন্ম ও মৃত্যুদিবস পালন (২) পবিত্র গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন (৩) খালসার জন্মতিথি পালন। একে বলা হয় বৈশাখী দিবস। সাধারণতঃ এই দিনটি হয় ১৩ই এপ্রিল (৪) উলে-খযোগ্য শিখনেতার, যারা ধর্মরক্ষার জন্যে বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হয়েছেন, তাদের মৃত্যুদিবস পালন। এবং (৫) শিখ ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে জড়িত দিনগুলির স্মরণে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

এবার গুরুনানকের একটি গল্প শোন।

ললো ছুতোর নামে গুরুনানক নামে গুরুনানকের একটি শিষ্য ছিলো। সে ছিল খুব গরীব। একদিন গুরুনানক লালু ছুতোর বাড়ীতে গেলেন অতিথী হয়ে। লালো ছুতোরের পাশেই ছিলো গুরুনানকের আরেক শিষ্যের বাড়ী। সে শিষ্যের নাম ছিল মালেক ভাগো। মালেক ভাগো ছিলেন সেখানকার বিত্তশালী দেওয়ান। মালিক ভাগো অনেক অনুরোধ করেও গুরুকে তার বাড়ীতে আনতে পারেননি। অথচ তারই পাশে গরীব কাঠ মিস্ত্রি লালো ছুতোরের বাড়ীতে তিনি গেলেন অতিথী হয়ে। এতে দেওয়ান সাহেবের আত্ম সম্মানে দারুন আঘাত লাগে। নানক বুঝলেন ব্যাপারটা । তিনি তখন মালেক ভাগোকে তার বাড়ী থেকে খাবার আনতে বললেন। মালেক ভাগো তখন গুরুর জন্য খুব দামী দামী খাবার নিয়ে এলেন।

নানক তখন করলেন কি জানো ? সে খাবারগুলোকে হাতে নিয়ে নিংড়াতে লাগলেন। আর খাবার থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো টাটকা রক্তের ধারা। ব্যাপার দেখে মালেক ভাগো তো ভয় পেয়ে গেলেন। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

গুরু নানক এবার লালো ছুতোর এর রুটি নিয়ে নিংড়াতে লাগলেন। আর কি আশ্চার্য। এই শুকনো রুটি থেকে গড়িয়ে পড়তে লাগল সাদা দুধের ধারা।

এটা দেখে মালেক ভাগোর চৈতন্যোদয় হলো। তিনি যে ধন ঐশ্বর্য্যের অহংকার করছিলেন, তার জন্য অনুতপ্ত হলেন এবং তখনি গুরুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন। তার অন্তর নির্মল হলো - আত্মা শুদ্ধ হলো। তিনি হলেন খাটি শিখ।

১৫৩৯ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসের দশমীর দিনে ৭১ বৎসর বয়সে কর্তারপুরে গুরুনানকের মৃত্যু হয়।

এখন তোমাদের শিখদের ধর্মগ্রন্থ "গুরু গ্রন্থ" থেকে কিছুটা অংশ শোনাই -

"হে আমার হৃদয়, তোমাকে নিসক্ত
নিবৃত্ত রাখো সংসারের মধ্যেও।
যদি সত্যের সাধনা কর সৎকর্ম কর
তোমার মন আলোকোদ্ভাসিত হবে
ঈশ্বরের অনুগ্রহে।"

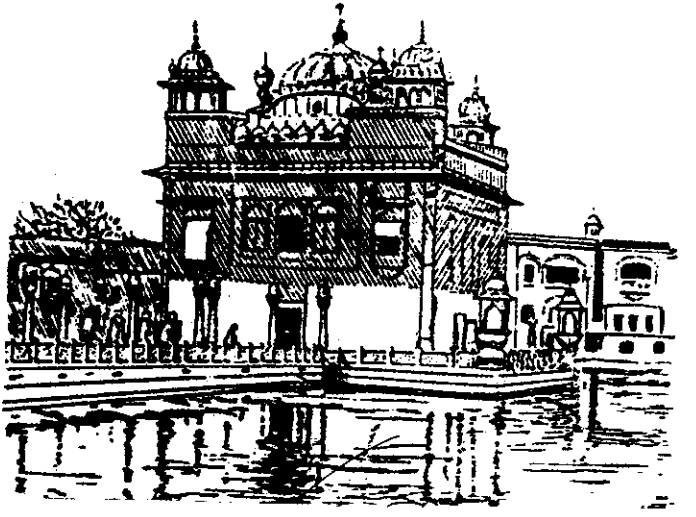

স্বর্ণ মন্দির

জরথুষ্ট্র

পার্শী ধর্ম মতবাদের প্রবর্তক

আরব দেশের কাছেই পারস্য দেশ। যাকে বলা হয় ইরান। বর্তমানে ইরানে প্রায় সবাই মুসলমান। কিন্তু একসময় তা ছিলো না। সেখানে অন্য একটি ধর্ম চালু ছিল। ধর্মটির নাম হলো পার্শী ধর্ম। এই ধর্মের প্রবক্তা হলেন জরথুষ্ট্র। ইংরেজীতে বলে জোরোথাষ্টার বা জরোয়াষ্টার।

প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে প্রাচীন পারস্যে এই ধর্ম প্রচলিত ছিল। খৃষ্টের জন্মের প্রায় সাত আটশ বছর আগে মহাপুরুষ জরথুষ্ট পারস্য দেশে এই ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। 'জরথুষ্ট' শব্দের অর্থ কি জানো ? বুড়ো উটওয়ালা। 'জরথ' মানে জরাগ্রস্থ আর উষ্ত্র মানে উস্ট্র, বৃদ্ধ উস্ট্ররক্ষক। অথাৎ বুড়ো উটওয়ালা।

আবার পার্শী পুরোহিতগণ বলেন, 'উষত্র, অর্থ দীপ্ত। কাজেই জরথুষ্ট নামের অর্থ হচ্ছে 'যার দীপ্তি সুবর্ণের মত। অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণ তারকা।

কথিত আছে, জন্ম থেকেই তিনি নাকি ক্রমাগত হাসতেন, আর মাথা কাপাঁতেন। তারপর হঠাৎ করে একদিন তিনি কোথায় যেন চলে যান। প্রায় বিশ বছর পর তিনি এক পাহাড় থেকে নেমে এলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে ঝরে পড়তে লাগল আগুন। কিন্তু তাতে তার কিছুই হলো না। তিনি আগুনের ভেতর থেকে হেটে এলেন। কথিত আছে, এই দীর্ঘ বিশ বছর ধরে তিনি

পাহাড়ের নির্জনতায় ঈশ্বরের ধ্যানে কাটিয়েছিলেন এবং সাধানায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। এরপর অনেক দিন কেটে গেল। আবার একদিন তার ইচ্ছায় আকাশ থেকে আগুন ঝরে পড়লো। আর সে আগুনেই তিনি মারা গেলেন।

তাই এই আগুনই পার্শী ধর্মে সব চাইতে পবিত্র জিনিস। তাদের মন্দিরে সব সময় আগুন জ্বলে। তাতে যজ্ঞ করবার জন্যে পুরোহিত আছেন। পুরোহিতরা কোমরে পৈতে পরেন। এটার নাম কস্তি। পুরোহিতদের বলে দস্তুর। যজ্ঞকে পার্শীরা বলে 'যশ্ন'।

পার্শীদের অগ্নিপূজক বলা হয়। কিন্তু আগুন তাদের দেবতা নয়। তারা একমাত্র ঈশ্বর বা ভগবানকে মানে। পার্শীদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'জেন্দ আবেস্তা'। জরথুষ্ট আবেস্তা ধর্মগ্রন্থের একজন ঋষি।

আবেস্তা শাস্ত্রগ্রন্থ অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত (১) যশ্ন, (২) জীষপেরেদ, (৩) যশ্ত (৪) ক্ষেরেদা আবেস্তা (৫) বেন্দিদাদ , (৬) নাস্ক প্রভৃতি।

যশ্ন ভাগে আছে যজ্ঞ ও উপাসনার কথা। এটা বাহাত্তরটি অধ্যায়ে বিভক্ত। একে গাথা ভাগও বলা হয়। গাথাগুলো পদ্যে লিখা এবং ছন্দ ও খুব সুন্দর।

জরথুষ্ট তার ধর্মমত ও উপলব্ধিময় বাণী পাঁচটি গাঁথাতে প্রকাশ করেছেন।

জীষ্পেরেদে আছে দেবগনের স্তবস্তুতি। যশ্ত-দেবতা ও দেবদূতগণের স্তব-গানে পূর্ণ। চতুর্থ খণ্ডে আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তব ও কবিতা। এগুলো প্রতিদিন বা নির্দিষ্ট উৎসবাদি উপলক্ষে আবৃত্তি করা হয়। বেন্দিদাদ্ বা পঞ্চম গ্রন্থে আছে সৃষ্টি রহস্য, কৃষি কাজ, আইন কানুন, চিকিৎসা, অশৌচ ও অশৌচান্তের বিধি ব্যবস্থা। ষষ্ঠ গ্রন্থে বিবিধ বিবরণের সমাবেশ । জরথুষ্ট প্রাচীনকালের পারসিক মগি বা জ্ঞাণী ব্যক্তিদিগকে স্বীয় ধর্মমত শিক্ষা দিয়েছিলেন। তার সেই শিষ্যগণ জরথুষ্টের মৃত্যুর পর সেগুলো দেশের মধ্যে প্রচার করেন। এভাবে বংশপরম্পরায় এই ধর্ম পারসিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হয়।

প্রাচীনকালের পারস্য রাজাগণ, যেমন কুরুস, দরায়ুস, জরাক্সিস প্রভৃতি আর্কিমিনীয় রাজারা জরথুষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

পার্শী ধর্ম অনুযায়ী ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তার নাম অহুর মজ্দা। তিনি শুধুই ভালো। তিনিই আলো। সূর্য আর আগুনের রূপ ধরে তিনি আমাদের

দেখা দেন। আর কুদেবতা একজন আছে, তার নাম আহিরমেন (Ahirman) তার সবই মন্দ। তার বাস অন্ধকার রাজ্যে। এর সঙ্গে অহুর মজ্‌দা সারাক্ষণ লড়াই করছেন। ভালো পথে থাকলে সূর্য আর আগুনকে পূজা করলে অহুর মজ্‌দা মানুষকে সেই দুষ্ট আহিরমেনের হাত থেকে রক্ষা করেন।

জরথুষ্ট বলেছেন, মানুষের মনে সৃষ্টি হতে দুটি বিষয়ের দ্বন্দ্ব চলে আসছে। সেটা হচ্ছে একটি 'সু' অপরটি 'কু' । মানুষ যখন কোন একটি কাজ করতে যায়। তখন সুমতি বা 'সু' সে কাজটি অন্যায় হলে বলে এ কাজ অন্যায়, এটা করতে নেই। কিন্তু 'কু' এসে বলে কর। এই দু'জনের দ্বন্দ্বের মধ্যে যে জয়ী হয়, মানুষ সেই পথেই চলে। 'সু' পরাজিত হলে 'কু' জয়ী হয়ে যায়। এই 'কু' ও 'সু' র দ্বৈতবাদ নিয়েই জরথুষ্টীর ধর্ম। বোহু শব্দের অর্থ 'সু' এবং অংগ্র শব্দের অর্থ মন্দ বা 'কু' । অংগ্রমৈন্য কু বোহুমৈনন্য 'সু'র শত্রু। অহুর মজ্‌দা হচ্ছেনবোহুমৈন্য অর্থাৎ 'সু'র দেবতা। তিনিই বিশ্বস্রষ্টা। এ জন্যেই তিনি উপাস্য। অংগ্রমৈন্য 'কু' মানুষের ভয়ের কারণ হলেও উপাস্য দেবতা নন। অহুর মোজ্‌দা 'আমেষ স্পেন্ত' বা সদাচারী অমরবৃন্দ নিয়ে পরলোকের নিয়ন্তা রূপে বাস করেন।

পার্শী ধর্মে পৃথিবীকে আর আগুনকে পবিত্র মনে করা হয়। মানুষকে সব সময় ভালোর দিকে অহুর মজ্‌দার পক্ষে থাকতে হয়। নয়তো আহিরমেন তাকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয়। আর মৃত্যুর পর তাকে নরকের অন্ধকারে নিয়ে যায়।

জরথুষ্ট্র প্রত্যেক পদার্থকে সৎ ও অসৎ এই দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তরুলতা , মাছ, পশু, পাখী মানুষের কল্যাণকামী বিধাতার সৃষ্টি। আর কতকগুলো দুষ্ট দেবতার সৃষ্টি। তাই জরথুষ্ট বলেছেন, যশ্ন অর্থাৎ যজ্ঞ ও উপাসনার দ্বারা কুপথ ত্যাগ করে সু-পথে আসার জন্য মানুষের হিতকামী দেবতার তুষ্টি সাধন করা উচিত।

পার্শী ধর্মে বলে, মৃত্যুর পর আমরা স্বর্গে যাবো কি নরকে যাবো, সুখ ভোগ করবে, কি দুঃখ ভোগ করবো, সে সব নির্ভর করছে আমাদের পৃথিবীর কর্মের উপর। মৃত্যুর পর আত্মা হিসাব রক্ষকের সেতু ছাড়া কোথাও যেতে পারে না। সেই সেতু পার হবার সময় সেতুরক্ষক হিসাবের খাতা খুলে সেই আত্মার পাপপূণ্যের হিসাব-নিকাশ করেন। হিসাবের খাতায় যদি পূণ্যের ঘরে বেশী জমা

থাকে, তাহলে তাকে স্বর্গের পথ দেখান হয়। আত্মা অনন্ত সুখরাজ্যে চলে যায়। যদি পাপের ঘরে বেশী জমা থাকে, তবে নরকের দরজা খুলে যায় - সাজা ভোগ করার জন্যে । আর যদি পাপ ও পূন্যের হিসাব সমান হয়, তাহলে আত্মার শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত ছায়া রাজ্যে অবস্থান করতে হয়।

পার্শী ধর্মানুযায়ী মৃতদেহ দাহ করা বা মাটিতে সমাধিস্থ করা হয় না। কারণ তা'হলে আগুনের আর পৃথিবীর পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য তারা একটা গোল মঞ্চের মত উঁচু বাড়ী তৈরী করে তারই ছাদে মৃতদেহ ফেলে রাখে। শকুনিরা এসে তা খেয়ে যায়। এই বাড়ীকে তারা কি বলে জানো ? 'টাওয়ার অব সাইলেন্স' নিস্তব্ধতার স্তম্ভ।

অন্যান্য ধর্মের মত পার্শী ধর্মেও মতবিভেদ দেখা যায়। তারা শাহান শাহী ও কাদসী এই দুই দলে বিভক্ত।

ইসলাম বা মুসলিম ধর্ম সম্প্রসারিত হবার পর পারস্য যখন সবাই মুসলমান হতে লাগলো, তখন এই ধর্মের কিছু লোক ভারতবর্ষে পালিয়ে এল। তারা ভারতের মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে বসতি স্থাপন করে। তাদেরকে বলা হয় পার্শী । তারা আজও জরথুষ্ট্রের এই পার্শী ধর্ম মেনে চলছেন। এখন তোমাদের জরথুষ্ট্রের কিছু বাণী শোনাই-

* ঈশ্বর এক, দুই নয়।

* লক্ষ্যবিহিন জীবন, ব্যর্থতাই আনে।

* নদী যেমন সাগরের দিকে নানাভাবে নানা গতিতে চলেও শেষে সাগরেই মিলে, তেমনি দেবতার আদেশ শিরে রেখে, সংসারের কন্টক পথে স্থির লক্ষ্য চলবে।

* পূর্ণ্য অর্জন করা শক্ত, কেননা পাপ মানুষের নিত্যসঙ্গী যেমন আলোর পাশে আঁধার।

* মিথ্যা কথা। প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা যে মানুষের নিত্য সাথী সেই ব্যক্তিকে ত্যাগ করাই ভাল।

ঈশ্বর তার সৃষ্ট সকল মানুষেরই অন্তর জানেন। তার কাছে ফাঁকি চলে

না। শত অন্যায় শত অত্যাচার হোক না কেন, তবু সত্যকে আশ্রয় করে থাকবে। এরূপ মনের বল যার আছে, তার কাছে দেবতার আশীর্বাদ সুলভ।

জ্ঞানবান ব্যক্তিমাত্রই মনের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী অনুভব করেন। সেজন্য প্রতিটি চিন্তায়, প্রতিটি কথায়, প্রতিটি কাজে তিনি অনুভব করেন যে, ঈশ্বরই তাকে চালানা করছেন।

আমি ক্ষুদ্র ও নগণ্য, আমার কি শক্তি আছে ? ওগো বিশ্ববিধাতা, তোমার নির্দেশ ব্যতীত যে আমার কোন কিছু করবার ক্ষমতা নেই।

অগ্নি পূজার মন্দির

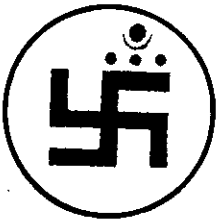

বর্ধমান মহাবীর

(৫৯৯খৃঃ পূর্বাব্দ - ৫২৭ খৃষ্টপূর্বাব্দ)

জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা)

ভারতবর্ষে বুদ্ধের সময় আর একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম বর্ধমান মহাবীর। তাঁকে বলা হয় জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। জৈন ধর্ম ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন ধর্ম । ৫৯৯ খৃঃ পূর্বাব্দে উত্তর বিহারের বৈশালীর কাছে (বর্তমানে মজঃফরপুর জেলা) কুন্ড গ্রামে এক ক্ষত্রিয় পরিবারে মহাবীরের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন জ্ঞাকৃত নামে একটি ক্ষত্রিয়কুলের অধিনায়ক। বৈশালীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে মহাবীরের আর এক নাম ছিল বৈশিল্য । বর্ধমান যখন শিশু, সে সময়ে জ্যোতিষী পন্ডিতেরা গণনা করে তাঁর পিতামাতাকে বলেছিলেন যে, আপনাদের এই ছেলে যদি সংসারে থাকে, তা'হলে সে দিগ্বীজয়ী সম্রাট হবে। আর যদি ধর্মের পথে যায়, তা'হলে সে হবে একজন প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক। জ্যোতিষীর কথায় বর্ধমানের পিতা-মাতা তাকে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন।

এই সময় ভারতের সামাজিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। জাতিভেদ প্রথা তখন চরম আকার ধারণ করেছিল। উচ্চ বর্ণ তথা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরাই ছিল সমাজের সব রকম সুযোগ-সুবিধা ভোগের একচ্ছত্র অধিকারী। ব্রাহ্মণদের ছিল ধর্মকর্মের একচেটিয়া অধিকার, রাজ্য শাসনের সব রকম অধিকার ছিল ক্ষত্রিয়দের আর বৈশ্যরা ভোগ করত ব্যবসা বাণিজ্যের সব রকম সুবিধা। সবচেয়ে করুণ অবস্থা ছিল নিম্নশ্রেণী শূদ্রদের। তারা ছিল দাস শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। তাদের কোন সামাজিক অধিকার বা মর্যাদা ছিল না। কিন্তু তারাই ছিল সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। মহাবীর জন্মেছিলেন ঠিক এমনি এক অস্বস্তিকর সামাজিক পরিবেশে। বিপুল ঐশ্বর্য্য আর ভোগবিলাসের মধ্যে তাঁর শৈশবকাল কাটে। যৌবনে তিনি বিয়ে করে সংসারী হন এবং এক কন্যা সন্তানের জনকও হন। এরপর পিতার মৃত্যুর পর হঠাৎ একদিন সব কিছু থেকে তার মোহ কেটে যায়। সংসার থেকে মন উঠে যায়। শুধু এক চিন্তা, জীবনের নিগূঢ় অর্থ কি ? এই অবস্থায় একদিন বড় ভাইয়ের অনুমতি নিয়ে সংসার, স্ত্রী, কন্যা ছেড়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন পথে। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বৎসর। ঐ সময়ে ভারতবর্ষের নানা স্থানে পার্শ্বনাথ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের মঠ ছিল। বৈশালী নগরে এই

সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা বাস করতেন বেশী। মহাবীর সংসার ত্যাগ করে এই মঠে কিছুদিন বাস করেন। কিন্তু এখানেও বেশী দিন তাঁর মন বসলো না। তাই তিনি মঠ ত্যাগ করে দেশে দেশে ভ্রমণ করতে লাগলেন এবং শুরু করেন অরণ্যের নির্জনতায় কঠোর তপস্যা। সেখানে একটানা বারো বৎসর তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। তিনি তাঁর ধ্যানে এমনি বুঁদ হয়ে থাকতেন যে, আহার-নিদ্রার কথা পর্যন্ত ভুলে যেতেন। এ সম্বন্ধে দুটো ছোট্ট ঘটনা শোনো। একবার এ রকম মৌনী অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে মহাবীর একটি রাজ্যে এসে পড়েন। নগর-রক্ষীরা অচেনা এ লোককে দেখে ভাবলো, এ নিশ্চয়ই চোর। তারা তাঁকে ধরে নিয়ে গেল নগর পালের কাছে। সেখানে মহাবীরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হলো। কিন্তু মহাবীর নিশ্চুপ। মৌনী অবস্থায় একটি কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বের হলো না।

নগরপাল এতে রেগে গেলেন এবং মহাবীরের প্রাণদন্ডের আদেশ দিলেন। মহাবীরকে নিয়ে আসা হলো বধ্যভূমিতে। তাঁকে বধ করা হবে। পরপর সাতবার চেষ্টা চালানো হলো। কিন্তু দেখা গেল কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। রাজকর্মচারীরা ঘাবড়ে গেলো। এতো সাধারণ মানুষ নয়। তারা বুঝতে পারলেন ইনি একজন অসাধারণ শক্তিশালী সাধক। আর এ জন্যেই এ অলৌকিক ঘটনা ঘটছে।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে নগরপাল সঙ্গে সঙ্গে মহাবীরকে মুক্তি দিয়ে দিলেন।

আর একবার, মহাবীর গভীর তপস্যায় মগ্ন। এক রাখাল ছুটতে ছুটতে এসে তার হারানো গরুর কথা জিজ্ঞেস করলো মহাবীরকে। মহাবীরতো তখন ধ্যানে ডুবে আছেন। রাখালের কোন কথাই তাঁর কানে গেল না। আর তখন রাখালটা করলো কী, উত্তর না পেয়ে রেগে গিয়ে পাছের দুটো তীক্ষ্ণ ডাল মহাবীরের দুই কানের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগলো। কিন্তু মহাবীর কোনো বেদনা অনুভব করলেন না।

রাখালকে অবশ্য তিনি ক্ষমা করেছিলেন।

এইভাবে কঠোর তপস্যায় মহাবীরের অন্তর থেকে মুছে যায় সংসার জীবনের সব রকম লোভ-লালসা, হিংসা, বিদ্বেষ, ভোগ বিলাসের প্রবৃত্তি। তিনি লাভ করেন কৈবল্য বা পরম জ্ঞান। সব ইন্দ্রিয়কে জয় করেছিলেন বলে তাঁর আর এক নাম হয় জিন (মানে দুঃখীজয়ী) বা জিতেন্দ্রিয়। আর তাঁর প্রচারিত ধর্ম 'জৈনধর্ম' নামে পরিচিত হয়।

প্রথম অবস্থায় মহাবীরের শিষ্যরা নির্গ্রন্থ (সর্বপ্রকার বন্ধন বিহীন) নামে

পরিচিত ছিলেন। পরে তারা জৈন নামে পরিচিত হলো। 'জিন' শব্দ হতেই তাঁর ধর্ম সম্প্রদায় 'জৈন' নামে পরিচিত হলো।

জৈনদের প্রাচীন ইতিহাস হতে জানা যায় ২৪ জন সিদ্ধ পুরুষের কথা, যাঁরা ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এইসব সিদ্ধ মহাপুরুষকে জৈনগণ বলেন "তীর্থঙ্কর" বা ধর্মের পথপ্রদর্শক। এরা হলেন-

(১) ঋষভদেব, (২) অজিত নাথ, (৩) সম্ভবনাথ, (৪) অভিনন্দন, (৫) সুমতিনাথ, (৬) পদ্মপ্রভু, (৭) সুপার্শ্বনাথ (৮) চন্দ্রপ্রভু, (৯) সুবিধিনাথ, (১০) শীতলনাথ, (১১) শ্রেয়ংসনাথ, (১২) বাসুপূজ্য, (১৩) বিমলনাথ, (১৪) অনন্তনাথ, (১৫) ধর্ম্মনাথ, (১৬) শান্তিনাথ, (১৭) কুন্তুনাথ, (১৮) অরনাথ, (১৯) মলি-নাথ, (২০) সুব্রত, (২১) নমিনাথ, (২২) নেমিনাথ, (২৩) পার্শ্বনাথ, (২৪) বর্ধমান মহাবীর।

এই ২৪ জন তীর্থঙ্করের তেইশতম তীর্থঙ্কর ভগবান পার্শ্বনাথ। তিনিই প্রকৃতপক্ষে জৈনধর্ম্মের সংস্কার ও সংগঠন করেন। পার্শ্বনাথ ৩০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করে বনে গিয়ে তপস্যা আরম্ভ করেন এবং জ্ঞান লাভ করে ধর্মের উপদেশ দিতে থাকেন। পার্শ্বনাথ তাঁর সন্ন্যাসী-শিষ্যদের প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন যে, তারা প্রাণীহত্যা করবে না। মিথ্যা কথা বলবে না, চুরি করবে না এবং কোন প্রকার ধন-সম্পত্তি রাখবে না । ভারতের গ্রান্ড কর্ড লাইনে যে পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ পাহাড় দেখতে পাওয়া যায় সেখানে তিনি একশ বৎসর বয়সে শরীর রক্ষা করেন। পরেশনাথ পাহাড় জৈনদের অন্যতম তীর্থ স্থান।

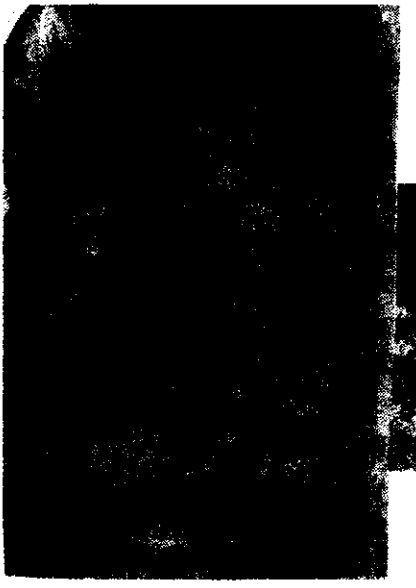

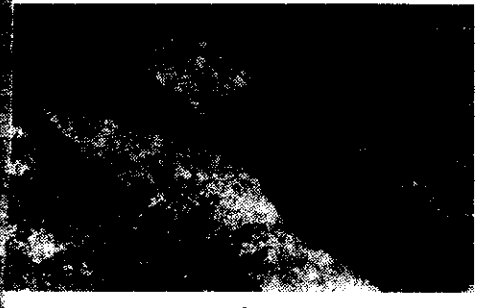

পার্শ্বনাথ পর্বতের উপর
জৈন মন্দির

ভগবান পার্শ্বনাথের মৃত্যুর প্রায় দুইশ বৎসর পরে ষষ্ঠ শতকে চব্বিশতম (২৪) তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীরের জন্ম, হয়। মহাবীরকেই বলা হয় সর্বশ্রেষ্ট ও শেষ তীর্থঙ্কর এবং জৈন ধর্মের প্রবর্ত্তক। তিনি পার্শ্বনাথের ধর্মমত মেনে চলতেন। তবে পার্শ্বনাথের ধর্মমতের চারটি সংযমের সাথে তিনি আরও একটি সংযম যোগ করেন। তা'হলো ব্রহ্মচর্য। তিনি দেখলেন অনেক লোক মুনি হয়েও সংসারের সুখভোগ করতে ছাড়তো না। তাই মহাবীর নিয়ম করলেন যে, মুনিরা বিয়ে করবে না এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখবেনা ও কোন প্রকারের সম্পত্তি রাখবে না।

মহাবীরের বয়স যখন চল্লি-শ বৎসর তখন থেকেই তিনি ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। মহাবীর প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে মগধ (পাটনা ও গয়া জেলা), অঙ্গ (ভাগলপুর জেলা), বিদেহ (ত্রিহুত) কোশল (অযোধ্যা) প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচার করে বহু লোককে দীক্ষিত করেন। গৌতম বুদ্ধ যে সময় ধর্ম প্রচার করেন, মহাবীরও সেই সময় তাঁর নবধর্ম প্রচার করেন।

মগধের রাজারা মহাবীরকে বেশ সাহয্যে করতেন। তাঁদের আনুকূল্যে জৈনধর্ম উত্তর ভারতে বিস্তার লাভ করে। প্রথম অবস্থায় এটা মথুরা, কর্ণাট এবং পশ্চিম ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতক হতে দাক্ষিণাত্যে জৈনদের খুব প্রভাব বেড়েছিল। এর কারণ কি জান ? কারণ ঐ দেশের শাসক চানুক্য ও রাষ্ট্রকূট রাজগণ জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে অনবরত বিবাদের ফলে ভারতের সর্বত্র জৈন প্রভাব আস্তে আস্তে কমে গেল। বর্তমানে ভারতের গুজরাট ও রাজপুতনায় অনেক জৈন বাস করে।

মহাবীর বলতেন, হিংসার চেয়ে পাপ নেই, অহিংসার চেয়ে ধর্ম নেই। পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তাদের সবার মধ্যে প্রাণ আছে। কাজেই প্রতি মূহুর্তে সতর্ক হয়ে চলতে হবে। আজও অনেক জৈন কাপড় দিয়ে ছেঁকে জলপান করে, পাছে কোন পোকা জলে থেকে যায়। পথ চলবার সময় সন্তর্পণে পা ফেলেন। যেন কোন প্রাণী আহত না হয়। মহাবীর আর ও বলেছেন, ক্রোধকে দমন করবে, লোভকে দূরে রাখবে। তাহলে তোমর মনুষ্যত্ব ফুটে উঠবে। অর্থপ্রিয়তা সকল পাপের মূল। বঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা যখন থাকে না , তখনই মনে আসে অফুরন্ত শান্তি। ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ এই চারটিই মানুষকে পৃথিবীতে আবদ্ধ করে রাখে। মনের সুখ-দুঃখ একেবারে জয় করতে পারলেই মানুষকে বার বার জন্ম নিতে ও মরতে হবে না। সে মুক্তি পাবে। সেজন্য মহাবীর সবাইকে মন জয়

করবার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ তার নিজ নিজ কর্মফলের হাত থেকে নিস্তার পেলেই মুক্তি পায়।

মহাবীর আরও বহুবিধ উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর উপদেশগুলী পরে বারোটি ভাগে সংকলিত হয়। এগুলিকে বলে অঙ্গ। এ ছাড়া উপাঙ্গ, মুল সূত্র প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র ও জৈনধর্মে আছে।

বুদ্ধ যেমন মৃত্যুর সময় তাঁর কোন শিষ্যকেই নেতা করেননি , শুধু বুদ্ধ বচন মানতে উপদেশ দিয়েছেন, মহাবীর কিন্তু তেমন করেননি। তাঁর প্রধান শিষ্য ইন্দ্রভূতিকে জৈনদের নেতা করে গেলেন। ইন্দ্রভূতির পর ক্রমশঃ সুধর্ম্মা ইত্যাদি আরও ছয়জন নেতা হলেন। অষ্টম নেতা ছিলেন ভদ্রবাহু। ইনি সম্রাট আশোকের পিতামহ সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সময় জীবিত ছিলেন। কথিত আছে যে, এই সময় উত্তর ভারতে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ফলে জৈনভিক্ষুদের জীবন ধারন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তখন ভদ্রবাহু বারো হাজার ভিক্ষু নিয়ে দক্ষিণ ভারতে চলে যান। যারা উত্তর ভারতে রয়ে গেলেন তাঁদের নেতা হলেন স্থুল ভদ্র।

মহাবীর মোক্ষলাভের জন্য কঠোর তপস্যা ও সংসারের সকল সংশ্রব ত্যাগ করা প্রয়োজনীয় মনে করতেন। তিনি নিজে কাপড় পরতেন না ও শিষ্যদের কাপড় পরতে নিষেধ করতেন। কিন্তু যে জৈনেরা স্থুলভদ্রের অধীনে উত্তর ভারতে রয়ে গেলেন তারা ধীরে ধীরে কাপড় পরতে আরম্ভ করলেন। এইরূপে জৈনদের মধ্যে দুটি ভাগ হয়ে গেল। যারা বস্ত্র পরতেন তাদের নাম হলো শ্বেতাম্বর এবং যারা নগ্ন থাকতেন তাদের নাম হলো দিগম্বর। এটা আনুমানিক খৃঃ পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর ঘটনা।

এবার তোমাদের জৈনদের পূজা পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলি। পূজারী স্নানাদির পর আটটি জিনিস দিয়ে জৈন মূর্তির পূজা করেন। এই আটটি জিনিস হলো-জল, চন্দন, পুষ্প, ধুপ, দীপ, অক্ষত, নৈবেদ্য, ও ফল। অক্ষত পূজা কি জানো ? পূজারী কিছু চাল নিয়ে নিয়মানুযায়ী সাজিয়ে মন্ত্র পড়েন।

এভাবে পূজারী চাল সাজান

(১) 卐

(২) • • •

(৩)

জৈনদের মধ্যে স্থানকবাসী নামে একটি দল আছে। এই দলের লোকেরা মূর্ত্তি-পূজা করে না, শুধু মনে মনে ধ্যান ও স্তবস্তুতি করে।

জৈনধর্মে যাগযজ্ঞ ও জীবহিংসা নিষিদ্ধ। এই ধর্মে বলা হয়, প্রত্যেক জিনিসেই আত্মা আছে। মানুষের মধ্যে আত্মা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হলেই তাকে ভগবান বলা হয়। জৈনরা জীবে দয়া, নিজেকে পীড়ণ করা এবং কষ্ট করাকে ধর্মলাভের প্রধান উপায় বলে মনে করেন। অর্থাৎ এই ধর্মে কৃচ্ছতা সাধনের প্রতি জোর দেয়া হয় বেশী।

জৈনগণ বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন। ঈশ্বরকে জগতের সৃষ্টিকর্তা বলে মানেন না। তাদের দেবতাগণ যদি মোক্ষলাভ করতে চান, তা'হলে আগে তাদের মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হবে। তাদের দেবতারা নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ -

(১) নরকের দেবতা - এদের কাজ পাপীকে কষ্ট দেওয়া।

(২) পাতালের দেবতা - এরা নরকের দেবতার মত নিকৃষ্ট, কিন্তু প্রাণীকে কষ্ট দেন না।

(৩) জ্যোতিষী দেবতা - এরা সূর্য্য, চন্দ্র ও তারায় বাস করেন।

(৪) বিমানবাসী দেবতা - এরা দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

হিন্দুদের মত জৈনদের মধ্যেও ইন্দ্র দেবরাজ। স্বর্গের উপরে আচে সিদ্ধলোক।

এখানে তারাই বাস করেন, যারা মোক্ষলাভ করেছেন।

গুজরাটের একটি জৈন মন্দির

জৈনদের আচার-ব্যবহার, বিবাহাদির নিয়ম, সামাজিব রীতি-নীতি হিন্দুদের থেকে বিশেষ আলাদা নয়। তারা বরাবরই হিন্দুদের সাথে মিলে-মিশে চলেছে।

হিন্দুদের মত তারাও জাতিবিভাগ মেনে চলেন। এই কারণে, ভারতবর্ষে যখন হিন্দুধর্মের প্রধান্য হলো, তখন জৈনগণকে হিন্দু সমাজের একটি অংশ বলে ধরে নেওয়া হলো। আর তাই জৈনধর্ম আজও ভারতবর্ষে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলছে।

পরেশনাথ পর্বতের উপর পার্শ্বনাথের মন্দির, রাজ পুতানার আবু পর্বতের জৈন মন্দির, কলকাতা মানিকতলায় পার্শ্বনাথের মন্দির প্রভৃতি জৈন ধর্ম্মাবলম্বীগণের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়।

মহাবীর প্রায় ৭২ বৎসর জীবিত ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি সারাক্ষণই বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন।

আনুমানিক ৫২৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে পাটনা জেলার পাবায় (বর্তমানে পাঁওপুরী) তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

এখন তোমাদের মহাবীরের কিছু বাণী শোনাই -

আগুন যেমন লোহার সাথে মিলতে পারে, জলের সাথে যেমন দুধ মিশে, তেমনি আত্মা ও কর্ম এক। মানুষ জীবনে তার কর্মফলই বহন করে। কর্মফল ও আত্মার সাথে মানুষের যে বন্ধন, তার হাত থেকে মুক্তিলাভ করতে মানুষের সাধ্য নেই।

মানুষের জীবনে কর্ম চার প্রকারে প্রভাব বিস্তার করে (১) প্রকৃতি (২) চরিত্র (৩) অবস্থা (৪) সময়ের প্রভাব।

সত্যকে সত্য বলে সম্মান করা, মিথ্যাকে মিথ্যা বলে অন্তরের সাথে ঘৃণা করাই হচ্ছে সত্য ধর্ম। এর দ্বারাই জগতে জয়ী হওয়া যায়।

নিজের ক্ষমতা ও অক্ষমতা বুঝে কাজ করা উচিত। যে কাজ করতে পারবে না, তেমন কাজ হতে বিরত থাকবে। কাজ ভাল, কথা ভাল নয়।

আয় বুঝে ব্যয় করবে। সামাজিক অবস্থা বুঝে পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করবে। প্রতিদিন সৎচিন্তা, সৎগ্রন্থ পাঠ ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করে মনকে পবিত্র রাখবে।

যে ব্যক্তি সৎ ব্যক্তিদের সাথে সৎ কথা আলোচনা করে, অসৎ সংসর্গ ত্যাগ করে এবং পিতামাতাকে পূজা করে, সর্বজীব দয়া করে , ঈশ্বরের মঙ্গল আর্শীবাদ তার শিরেই বর্ষিত হয়।

পাবাপুরী

কনফুসিয়াস

(৫১১খৃষ্ট-পূর্বাব্দ-৪৭৮ খৃষ্টপূর্বাব্দ)

চীনের 'কনফুসী' ধর্ম মতবাদের প্রবর্তক

চীন দেশে প্রধানতঃ তিনটি ধর্ম প্রচলিত - কনফুসি ধর্ম, তাও বা তাওচি ধর্ম আর বৌদ্ধ ধর্ম।

কনফুসি ধর্মের প্রবর্তক হলেন কনফুসি বা কংফুশিয়ো। ইউরোপীয়দের ভাষায় ইনি কনফুসিয়াস নামে পরিচিত। তার বংশের নাম ছিল কুং, আর তাঁর দেশের লোক তাঁকে বলতে কুং- ফু- ৎজি। অর্থাৎ গুরুদেব কুং ।

কনফুসিয়াস ছিলেন ভারতের বুদ্ধের সমসাময়িক। ৫৫১ খৃষ্ঠপূর্বাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছরেরও আগে পুরনো চীনের প্রাচীন লুরাজ্যের অন্তর্গত শানটুং নামক স্থানে এক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশে কনফুসিয়াস জন্ম গ্রহণ করেন।

কথিত আছে তার জন্মের আগের রাতে তার মা এক স্বপ্ন দেখে পরদিন 'নি' পর্বতে যান। সেখানে যক্ষ আর অপ্সরারা তাকে একটি গুহায় নিয়ে যায়। অপ্সারাদের কাছে সেই দিনই তার একটি ছেলে হয়। তখন যক্ষরা তাকে বলে যে, এই ছেলেটি কালে একজন মহাপুরুষ হবে। মা সেই ছেলেকে নিয়ে বাড়ী ফিরে আসেন।

কনফুসিয়াসের বাবার নাম ছিল হেই। তার গায়ে ছিল সাংঘাতিক শক্তি। একবার তিনি একদল সৈন্য নিয়ে পেই -ইয়াং শহরে ঢুকছেন এমন সময় দেখা গেল শহর ঘেরা প্রাচীরের প্রকান্ড দরজাটা ওপর থেকে নেমে আসছে। ঢুকবার পথ বন্ধ হয়ে যায় আরকি। তক্ষুণি চীনরে ভীম হেই তার মুগুরের মত দুই হাত দিয়ে ঠেলে ধরলেন সেই ভারী দরজাটাকে। দরজার কপাট গেল থেমে ।

কনফুসিয়াস খুব ছোটবেলায় তার বাবাকে হারান। পারিবারিক অবস্থাও তাদের খুব একটা ভাল ছিল না। বাবা মারা যাওয়ায় সংসারের অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। তবুও মায়ের ইচ্ছা কষ্ট করে হলেও তিনি ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবেন। তাই মা তাকে স্কুলে পাঠালেন। কনফুসিয়াসকে বেশ কষ্ট করেই লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল। ছোট বেলায় লেখাপড়া ছাড়াও বাঁশী বাজাতে ও গান গাইতে খুব ভালবাসতেন। শৈশবকালেই কনফুসিয়াসের চরিত্রে বিশেষত্ব দেখা গিয়াছিল । তিনি তখন থেকেই সন্ন্যাসীদের মত পোশাক পরতে ভালবাসতেন কনফুসিয়াস। সমবয়সীদের সাথে খেলতে গেলেও সন্ন্যাসী সাজতেন। লেখাপড়ায়ও তিনি ছিলেন মেধাবী, স্বভাব চরিত্র ছিলেন ধীর স্থির। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে যেমন গণিত, সাহিত্য, সংগীত, জ্যোর্তিবিদ্যা, ইত্যাদিতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

চীন দেশে তখন কোন শান্তি ছিল না। রাজ্যময় অশান্তি। রাজার মনে শান্তি নেই। প্রজাদের মনে শান্তি নেই। চারদিকে গোলমাল। কনফুসিয়াস ভাবলেন, শাস্ত্রমত চললে সবার ভালো হবে। পুরোনো শাস্ত্রে যে সব কথা আছে তা মেনে চললেই সবার মংগল ।

তিনি বুঝলেন, জ্ঞানই মনের সব অজ্ঞানতা দূর করে। এর জন্য দরকার প্রচুর পড়াশুনা। তাই তিনি ভাবলেন, লাইব্রেরীতে গিয়ে তিনি সব বই পড়বেন। জানবেন এ দেশের অতীত ইতিহাস। তিনি চলে এলেন রাজধানীতে । ডুবে গেলেন লাইব্রেরীর বই এর মাঝে। শুরু হলো তার জ্ঞানের সাধনা।

আজ যে রকম বই তোমরা পড়ছো, তখনকার বই কিন্তু এ রকম ছিল না। তখনো কাগজই আবিস্কার হয়নি। তাই বইগুলো ছিল গাছের ছালের উপর লেখা বই। তুলি দিয়ে অক্ষর এঁকে এঁকে লেখা হতো।

এইভাবে রাজধানীতে বেশ কয়েক বৎসর কাটিয়ে পড়াশুনা শেষ করে কনফুসিয়াস ফিরে গেলেন তার নিজের দেশে 'লু' প্রদেশে। উনিশ বৎসর বয়সে কনফুসিয়াস বিয়ে করেন। বাইশ বৎসর বয়সে তিনি একটি স্কুল খুলেন । তার পান্ডিত্যের খবর ছড়িয়ে পড়ল দেশ-দেশান্তরে। ফলে বহু লোক আসতে লাগলো তার কাছে - তার জ্ঞানের কথা শুনার জন্য, তার উপদেশ শোনার জন্য। তিনি শেখাতে আরম্ভ করলেন কিভাবে রাজাদের দেশ শাসন করা উচিত আর সাধারণ লোকদের আচার-ব্যবহার কি হওয়া উচিত।

অনেক শিষ্য জুটে গেল তার । তিনি বলতেন , রাজা হচ্ছে ভগবানের প্রতিনিধি। রাজা ভাল হলেই প্রজারা ভাল হবে। তাতে সারা দেশটার ভাল হবে, না হলে সমূহ অকল্যাণ। খারাপ রাজা হিংস্র বাঘের চেয়েও বেশী ভয়ঙ্কর ও অনর্থের কারণ।

এ সম্বন্ধে একটি কাহিনীও আছে। একবার তিনি শিষ্যদের নিয়ে টাই পর্বত পার হচ্ছিলেন। এমন সময় শুনতে পেলেন স্ত্রীলোকের কান্নার শব্দ। কান্নার শব্দ ধরে সেদিকে গিয়ে তিনি দেখেন একজন স্ত্রীলোক কাঁদছে। কনফুসিয়াস তাকে জিজ্ঞেস করলেন - তুমি কেন কাঁদছো মা ?

স্ত্রীলোকটি বললো , এ দেশে বাঘের বড় উৎপাত। আমার শ্বশুরকে খেয়েছে। আমার স্বামীকে খেয়েছে, এখন আমার ছেলেকেও খেলো।

কনফুসিয়াসের শিষ্যরা তখন তাকে বললো, এর আগে তুমি পালিয়ে গেলে না কেন ? পালিয়ে গেলেই তো বাঘের হাত থেকে রেহাই পেতে পারতো?

স্ত্রীলোকটি বলল, পালাব কেন? এখানকার রাজা যে ভাল ।

এটা শুনে কনফুসিয়াস শিষ্যদের বললেন, এর কাছে তোমরা শিখলে তো যে, বাঘের চাইতেও ভয়ংকর কিছু যদি থাকে তো সে হচ্ছে খারাপ রাজা।

শিষ্যদের কাছে কনফুসিয়াসের আবার একটি কঠিন নিয়ম ছিল । যদি কোন শিষ্য একটি সূত্র বুঝিয়ে দেবার পর অপর দু'টি সূত্রের অর্থ আপনা হতে করতে না পারত, তাহলে তিনি সে ছাত্রকে আর পড়াতেন না।

অবশেষে বাহান্ন বছর বয়সে কনফুসিয়াস তার নীতি প্রয়োগের সুযোগ পেলেন। লুরাজ্যের রাজা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন।

কনফুসিয়াসের ন্যায়বিচার, সত্যবাদিতা ও সুশাসন গুণে রাজা যেমন সন্তুষ্ট ছিলেন, প্রজারাও তেমনি শান্তিতে সুখে ছিল। দেখতে দেখতে রাজ্যের লোকেরা একেবারে বদলে গেল। তাদের মন্দ স্বভাব কমে গেল। আর ভাল গুণ সব ফুটে উঠতে লাগল, কনফুসিয়াসের ব্যবস্থার গুণে। দেশে বিদেশে লোকের মুখে মুখে গানে গানে ফিরতে লাগল তার নাম ।

কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন রইল না। কনফুসিয়াসের শত্রুও গজিয়ে উঠলো। তারা কনফুসিয়াসের বিরুদ্ধে রাজাকে বিভিন্ন কুপরামর্শ দিতে লাগলো। তাদের চক্রান্তের ফলে রাজা কনফুসিয়াসকে তাচ্ছিল্য করতে লাগলো। কনফুসিয়াস দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। তেরো বছর বাইরে কাটিয়ে আবার তিনি লুরাজ্যে ফিরে আসেন। তারপর বই লিখতে থাকেন। ধর্ম ও রাজনীতি নিয়ে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ লেখেন। পাঁচখানি মহাকাব্য ও চারখানি ধর্মগ্রন্থ। ঐ পঞ্চ কাব্যকে চীন ভাষায় বলে চীং। ইচীং, সূচীং সীচিং, লীচীং ও চুনচুই চীং। প্রথমটিতে আছে পরিবর্তনশীল জগতের কথা, দ্বিতীয়টিতে প্রাচীন ইতিহাস, তৃতীয়টিতে বিভিন্ন দেবতার স্তবস্তুতি, চতুর্থটিতে আচার অনুষ্ঠানের কথা এবং পঞ্চমটিতে হেমন্ত ও বসন্তের বর্ণনা।

ধর্মগ্রন্থগুলিতে আছে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে ধর্মোপদেশ। অধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক বিষয় উপদেশ, সাম্য মৈত্রী ও ছন্দ রক্ষা করে চলার কথা এবং প্রাচীন দার্শনিক পন্ডিত মেংয়ের নীতি ও সে সম্বন্ধে কনফুসিয়াসের মতবাদ। চীনে ভাষায় এ বইগুলির নাম লুন উ, তাসিয়ো, চাং উং, আর মেংৎসী। তাঁর উপদেশ এক সাথে করে শিষ্যরা 'লুম-ই আই' নামে একটি বই লিখেন। এ সবই চীনের পবিত্র গ্রন্থ।

তাঁর বহু শিষ্য ছিল। তার মধ্যে প্রায় ৭০/৮০ জন সব সময় তাকে ঘিরে থাকত। তার প্রতিটি কথা তারা লিখে রাখত। তার প্রধান চার জন শিষ্যের নাম হলো ইয়েন- ইয়েন , ইয়েন -হবু ইহবুই, থজি-লু এবং থজি-কুং।

কনফুসিয়াস রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে ঘুরে তার ধর্ম মানে কিসে মানুষের ভাল হবে, সে সম্বন্ধে তার মত বলে বেড়াতেন। এরূপ ভ্রমণের সময় অনেক সংসার-ত্যাগী সাধু সন্ন্যাসীর সাথে তার দেখা হতো। সন্ন্যাসীরা কনফুসিয়াসের কথাবার্তা

শুনে আশ্চর্য হতেন। তারা বলতেন, মানুষ সংসারে থেকে কি ধর্মকর্ম করতে পারে ? কনফুসিয়াস তখন তাদেরকে বলতেন, মানুষের সঙ্গ ছেড়ে আমি কি বনে জংগলে গিয়ে ধর্মালোচনা করবো ? মানুষ হয়ে যদি মানুষের দুঃখ দৈন্য দূর করতে না পারলাম , তাহলে বনের বাঘ ভাল্লুক হয়ে জন্মালেই তো হতো। সন্ন্যাসীরা এ কথা শুনে আর কোন জবাব দিতে পারতেন না।

কনফুসিয়াসের ধর্মমতে ভগবান বা দেবদেবীর কোন কথা নেই। তিনি বলতেন, ভালো হবার নিয়ম মেনে চলাই যথার্থ ধর্মাচরণ। পরিবারের মধ্যে আর সমাজের মধ্যে সে কিসে ভাল থাকবে, শুধু তাই দেখলেই যথেষ্ট। তার সময়েরও অনেক আগে চীনে 'শাংটি' বা ভগববানের কথা প্রচলিত ছিল। তিনি ও যে তা মানতেন না তা নয়, তবে তিনি বলতেন, ভালো হবার কয়েকটা নিয়ম মেনে চললেই মানুষের ধর্মাচরণ করা হবে। মানুষ আসলে ভাল। ভাল পথ দেখতে পেলে সে তা ধরে চলবেই। ভালবাসা, ন্যায়, শ্রদ্ধা, জ্ঞান ও আন্তরিকতা থাকা চাই সবার কাজে ও ব্যবহারে। তিনি সভ্যতা ও ভদ্রতা শেখার উপরে জোর দিতেন এবং বলতেন, নৈতিক জীবনের মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করা এবং পিতামাতাকে মেনে চলা, মানব জীবনের এটাই প্রধান শিক্ষার বিষয়। যে ব্যবহার মানুষ নিজে পেতে চায় না, সে ব্যবহার কারো সংগে করা উচিত না। কথা ও কাজের সামঞ্জস্য রেখে চলবে। সত্যবাদী হও, লোকে বিশ্বাস করবে। পূর্ব-পুরুষদের পূজা করা, পিতামাতাকে ভক্তি করা, রাজার অনুগত হওয়া সবার কর্তব্য। এটাই কনফুসিয়াসের সোনার নিয়ম বা গোল্ডেন রুল নামে পরিচিত। কনফুসিয়াসের ধর্মের ব্যাখ্যা করে পরে অনেকে বই লেখেন। তাদের মধ্যে ছিলেন তার নাতি খজি-খজি ও আর একজন মহাপুরুষ মেনসিয়াস।

চীন দেশে ৪০/৫০ কোটি লোক এই ধর্ম মানে। তবে চীনের বাইরে কোথাও এই কনফুসিয় ধর্ম প্রচলিত নেই। এই ধর্মে পূর্বপুরুষদের পূজা সবচেয়ে বড় কথা। চীন দেশে পিতৃভক্তির মত গুণ আর নেই। পিতৃভক্তির অনেক সুন্দর সুন্দর কাহিনী আছে সে দেশে ।

শুনবে সে রকম একটি কাহিনী ?

অনেক কাল আগে ইয়াং লো নামে এক রাজা ছিলেন চীনে। তারই সময়ে চীনের রাজধানী নানকিং থেকে পিকিং শহরে স্থানান্তরিত হয়। একদিন রাজার শখ হলো, একটি বড় আকারের ঘন্টা বানাতে হবে, যার শব্দ সারা শহরে শোনা যায় । যেমন ভাবা তেমন কাজ। রাজার হুকুমে সবচেয়ে সেরা কারিগরকে

ডেকে আনা হলো। সে কারিগরের নাম ছিল কুয়ান য়ু। কুয়ান য়ু তার বাছাবাছা কারিগর নিয়ে কাজ শুরু করে দিল। সবচেয়ে ভাল ধাতু সংগ্রহ করা হল। তারপর তা গলিয়ে ঢালবার জন্য একটা বিরাট ছাঁচ তৈরী করা হল। যেদিন ঘন্টাটা ছাঁচে ঢালাই হবে সেদিন রাজা তার পাত্র মিত্রদের নিয়ে এলেন। খুব ঘটা করে ঢালাই হল। কিন্তু যখন ছাঁচ থেকে ঘন্টাটা খুলে বের করা হল তখন দেখা গেল তাতে একটা ফাটল । কুয়ান-য়ুর এতোদিনের সব পরিশ্রম বৃথা গেল। রাজা খুব হতাশ হলেন তবু নতুন করে ঢালাই করবার হুকুম দিলেন। কুয়ান য়ু নিজেও খুব চিন্তায় পড়লো। এতো বছর ধরে ঘন্টা বানাচ্ছে। ঘন্টা বানানোতে তার চেয়ে ভাল কারিগর কেউ নেই, কোন সময়তো এমন হয়নি ? ঘন্টা ফাটবার মত কোন কারণ তো নেই ? যাক, রাজার হুকুম আবার সে নতুন করে কাজ শুরু করল এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটা মস্ত বড় ঘন্টা ঢালাই করবার ছাঁচ তৈরী করল। এবার আরও লোকের ভিড় হলো। রাজা তার পাত্রমিত্র নিয়ে এলেন। ছাঁচ থেকে ঘন্টাটা খুলে বের করা হল। কিন্তু এ কি! ঘন্টার চারদিকটা অসংখ্য ছোট ছোট গর্তে ভর্তি। রাজাতো রেগে আগুন। তিনি কুয়ান য়ু কে ডেকে বললেন, তোমায় আর একবার সুযোগ দেয়া হলো । কিন্তু যদি এবারও ঘন্টায় কোন দোষ থাকে তবে তোমায় শিরচ্ছেদ করা হবে।

কুয়ান য়ু রাজার আদেশ পেয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরে এল। সব পুথিপত্র পড়ে দেখল, দেবতার কাছে প্রার্থনা করল এবং সব সময় বিষণ্ন হয়ে রইল। কুয়ান য়ুর একটি মেয়ে ছিল। ভারী সুন্দর। নাম কো আই। সে বাবাকে তার বিষণ্নতার কারণ জিজ্ঞেস করল। বাবা তাকে সব খুলে বললো।

সেই গাঁয়ের পাশের পাহাড়ের গুহায় থাকত এক যাদুকর। কো-আই সেই যাদুকরের কাছে গিয়ে তার বাবার এই বিপদের কথা খুলে বললো। যাদুকর সব শুনে চুপ করে রইল। কিন্তু কো-আই নাছোড়বান্দা। শেষে কো-আই এর অনুরোধে যাদুকর বললো, এত বড় আকারের ঘন্টা তৈরী করতে তার গলিত ধাতুর মধ্যে কোন ও কুমারী কন্যার রক্ত মেশাতে হয়। তবেই সেই ঢালাই হয় নিখুত।

যাদুকরের কথা শুনে কো-আই চমকে উঠলো তারপর বাড়ী ফিরে এল। বাড়ীতে এসে কো-আই তার বাবাকে ঘন্টা বানাতে উৎসাহ দিয়ে বললো এবার ঘন্টাটা নিশ্চয়ই নিখুঁত হবে।

কুয়ান-য়ু খুব সতর্ক হয়ে ঘন্টা বানাতে লাগল।

ঢালাই-এর দিন এল। এবার আরও ভিড় হলো। রাজা এলেন। পাত্রমিত্র এলো। তরল ধূমায়িত ধাতু ছাঁচে ঢালা হচ্ছে। হঠাৎ সবাই 'গেল গেল' বলে চীৎকার করে উঠল। কিন্তু ততোক্ষণে সবার সামনে কো-আই সেই টগবগ করা ফুটন্ত ধাতুর মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। তার বাবা তাকে বাধা দেয়ার জন্য ছুটে গেল এবং তাকে ধরেও ফেলেছিল, কিন্তু মেয়ের পায়ের ছোট্ট একটি জুতো মাত্র তার হাতে রইল। আর কিছুই সে রাখতে পারল না। সেই জুতোটি হাতে নিয়ে কুয়ান-য়ু ডুকরে কেঁদে উঠল। অন্যরা তাকে ধরাধরি করে দূরে নিয়ে গেল।

এবার ঘন্টাটা যখন ছাঁচ থেকে খোলা হলো, দেখা গেল তা একেবারেই নিখুঁত হয়েছে। কোথাও কোন ফাটা নেই। ফাঁপা নেই। ঘন্টার গায়ে সূক্ষ কারুকাজগুলো চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। ঘন্টাটি দেখে রাজা খুবই খুশী হলেন।

ঘন্টা ঘরে ঘন্টা টাঙ্গানো হলো। কিন্তু ঘন্টা বাজার সাথে সাথে আর একটি শব্দ বাজতে লাগল 'হ্‌শিয়ে'।

চীনা ভাষায় জুতোকে বলে 'হ্‌শিয়ে' ।

সবাই বলাবলি করতে লাগল কো-আই তার জুতা চাইছে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সেই বৃহৎ ঘন্টাটি বাজলেই শোনা যায় - 'হ্‌শিয়ে'।

গল্পতো শুনলে। এবার আমরা আবার কনফুসিয়াসের কথায় ফিরে আসি।

একদিন কনফুসিয়াসের এক শিষ্য পাহাড়ে শিকার করতে গিয়ে একটি অদ্ভুত প্রাণী নিয়ে এল। তার একটি শিং। তাতে এক ফিতে বাঁধা।

প্রাণীটি দেখেই কনফুসিয়াস চিনলেন। এ হল 'কি-লিন।' তার জন্মের আগের রাতে তার মা একে স্বপ্নে দেখেছিলেন। আর স্বপ্নেই এর মাথায় এই ফিতেটি বেঁধে দেন।

কনফুসিয়াস বুঝলেন, তার সময় ফুরিয়ে এসেছে। তিনি তার শিষ্য ৎজি-কুংকে বললেন, 'পর্বতও গুড়ো হয়ে যায়। প্রকান্ড কড়িকাঠও ভেঙ্গে পড়ে। আর জ্ঞানী মানুষও ঘাসের মত শুকিয়ে যায়' এই বলে তিনি বিছানা নিলেন। আর উঠলেন না। ৪৭৮ খৃষ্টপূর্ব অব্দে তার মৃত্যু হয়।

কনফুসিয়াস শুধু তার বেঁচে থাকার সময়ে নয়, তারপর ও আজো এই

আড়াই হাজারেরও বেশী সময় ধরে চীনের সবচেয়ে জ্ঞানী লোক বলে সম্মান পেয়ে আসছেন। চীনের লোকদের জাতীয় চরিত্রের উপর তিনি প্রভাব বিস্তার করে আছেন। তাঁর সমাধির ওপর লেখা আছে- সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষিতুল্য আচর্য, সর্বগুণময় এবং সর্বজ্ঞানময় রাজা।'

লাওৎসে

(৬০৪ খৃষ্টপূর্বাব্দ-৫৩২ খৃষ্টপূর্বাব্দ)

তাও ধর্মের প্রবক্তা

চীন দেশে কনফুসিয়াসের ধর্ম আর বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়া আরও একটি ধর্ম আছে। তাহলো তাও ধর্ম।

তাও ধর্মের প্রবক্তা হলেন লাওৎসে বা লাওৎজে । লাওৎসের জন্ম হয়েছিল বুদ্ধদেবেরও আগে। ৬০৩ খৃঃ পূঃ মতান্তরে ৬০৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে লাওৎসে জন্ম গ্রহণ করেন। লাওৎসে কে চীন দেশের প্রথম দার্শনিক পন্ডিতও বলা হয়। তার আসল নাম ছিল 'লি-এর আর লাওকুং'।

কথিত আছে তিনি ৭০-৮০ বছর মাতৃগর্ভে ছিলেন। জন্মকালে তার চুল দাড়ি সব পাকা ছিল, যেন একটা বুড়ো মানুষ। আর বুদ্ধিশুদ্ধিও ছিল বড়দের মত। তাই লোকে তাকে বলতো লাওৎসে। লাওৎসে অর্থ কি জানো ? চুলপাকা শিশু।

ছোট বেলা থেকেই লাওৎসে ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির। তিনি জন্মেছিলেন গরীবের ঘরে। নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং নিজের চেষ্টাতেই কাউ রাজবাড়ীর গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। পাঠাগারে বসে তিনি প্রচুর পড়াশুনা করেন। এছাড়া তার ছিল বিধিপ্রদত্ত জ্ঞান। তিনি জীবনের বিভিন্ন সমস্যা- যেমন জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তা করতেন। আর চিন্তা করতে করতে তার এরূপ ধারণা হল যে, এ জীবন অনিত্য, জীবনের একমাত্র সার সত্য হচ্ছে নিজেকে 'তৃণাদপিনীচ' মনে করা। ক্রমে লাওৎসের কাছে রাজৈশ্বর্য্য, গৌরব আর বড় বলে মনে হলো না। মনে হলো, যে সত্য তিনি লাভ করেছেন, তাই জগতে প্রচার করবেন। এই ভেবে একদিন তিনি রাত্রিবেলা কাউকে কিছু না বলে রাজবাড়ী থেকে বের হলেন। রাজবাড়ী প্রহরী তাকে চিনে ফেলল এবং জিজ্ঞাসা করলো, আপনি এত রাতে রাজবাড়ী ত্যাগ করছেন কেন ?

লাওৎসে বললেন, 'আমি আর রাজার কাজ করবো না। জীবনের যে সার সত্য লাভ করেছি সেটাই জগতে প্রচার করবো।

প্রহরী বললো, হে ধার্মিক মহাপুরুষ। আমি আপনার এ শুভ কাজে বাধা দেবো না। তবে আমার একটি অনুরোধ। আপনি সংসার ত্যাগ করবার আগে মানুষের মংগলের জন্য একটি গ্রন্থ রচনা করে যান।

এটা শুনে লাওৎসে রাজবাড়ীতে ফিরে গেলেন এবং একটি বই লিখলেন তার নাম 'তাও তেহ-কিং'। কেউ বা বলেন, 'তও তে-চিং'। এই বইয়ে আছে তাও ধর্মের উপদেশ। তাও শব্দের অর্থ পথ এবং মুক্তি। এই মুক্তির পথই তিনি দেখিয়েছেন চীনের মানুষকে। তাও ধর্মের উপদেশগুলো তিনি বলেছেন তার এই বইতে।

বই লেখার পর তিনি বেরিয়ে পড়লেন পথে। অনেক দেশে গেলেন। শিখলেন অনেক কিছু। অনেক শিষ্যও হলো তার। কথিত আছে, লাওৎসে ভারতবর্ষ ও ভ্রমণ করেছিলেন এবং ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। দেখা গেছে, লাওৎসে তাও ধর্মের স্বরূপ বর্ণনা করতে যেয়ে যা বলেছেন, তা উপনিষদের ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কিত তত্ত্বের অনুরূপ । তাই অনেকে বলেন, লাওৎসের উপর ভারতীয় প্রভাব ছিল। আজও চীনদেশের তত্ত্ববিদ পন্ডিতেরা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের মত মাথা ন্যাড়া করে টিকিও রাখে।

লাওৎসে তাঁর ধর্মোপদেশ দিতে গিয়ে বলতেন, হে মানব, তুমি শিশুর

মত সরল হও। চিন্তা ভাবনা দুশ্চিন্তা মন থেকে দূর কর। মনকে স্বাধীন কর। নিজেকে সামলে চলবে। কোনও কিছুতে অস্থির হবেনা। মধ্যপথ অবলম্বন করবে। বেশী কথা বলবে না, বেশী আশা করবে না। কাজ করে যাবে। দুঃখ আর কুচিন্তাকে মনে স্থান দেবে না। জিহ্বাকে সংযত করবে। নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলবে। নিজের স্বভাবকে ভালো করাই সুখী হবার উপায়। আপনাকে জেনেই তৃপ্ত হও, অন্য মানুষের বিচার করো না। উপকার করে অপকারের প্রতিদান কর।

লাওৎসে বলতেন, আমার যে তিনটি অমূল্য রত্ন আছে, তা আমি কাছা ছাড়া করি না। এগুলো হচ্ছে দয়া, মিতাচার ও বিনয়। ভাল মানুষের কাছে আমি ভাল। যে ভাল নয়, তার কাছেও আমি ভাল, তাকে ভালর দিকে টানবার জন্য।

যুদ্ধকে তিনি ঘৃণা করতেন। আর বলতেন, টাকা-কড়ি মান-যশ সবই তুচ্ছ। আসল হলো তাও। তাওয়ের মধ্যেই সব, আবার সবই শেষে তাওয়ের সঙ্গে মিশে যায়।

সংসার ত্যাগ করে এভাবে তিনি দেশে দেশে শিষ্যদের সাথে নিজের ধর্ম প্রচার করে বেড়াতেন। আনুমানিক ৫৩২ খৃঃ পূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

লাওৎসের মৃত্যুর পর তাও ধর্ম হয়ে দাঁড়াল দেবতা-উপদেবতার অর্চনা প্রধান। অমরত্ব লাভের জন্য মন্ত্রতন্ত্র জাদুবিদ্যা ভেল্কি হয়ে উঠল তাদের কাজ ও লক্ষ্য। লাওৎসের পর তাও ধর্মের ধর্মগুরুরা অমর হবার ওষুধের লোভ দেখিয়ে লোকদের শিষ্য করতেন। তারপর 'চ্যাৎসো জিং' বলে এক যাদুকর যখন শুরু হলেন, তখন চীন সম্রাট পর্যন্ত তার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে তার শিষ্য হলেন। লু-হু পাহাড়ের এক প্রাসাদে তিনি রাজার মত থাকতেন। ওষুধের গুনে তিনি নাকি কখনও বুড়ো হননি।

এইভাবে যারা পরপর গুরু হলেন, তারা ওষুধ, ভেল্কি, তাবিজ কবচ ইত্যাদি নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। ফলে লাওৎসের পর যথার্থ তাও ধর্ম আস্তে আস্তে বহুদূরে সরে গেলে।

শ্রী চৈতন্যদেব

(১৪৮৬ - ১৫৩৩)

(বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক)

বঙ্গদেশে ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠ প্রচারক ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি ছিলেন শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকের সমসাময়িক। তিনি প্রেমভক্তিমূলক বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক। শ্রীচৈতন্য প্রচার করেন - ঈশ্বরের আরাধনায় সকলের সমান অধিকার। প্রাণে ভক্তি নিয়ে ঈশ্বরকে ডাকলে তাকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ভক্তিতেই মুক্তি।

যেই ভজে সেই বড় অভক্তিহীন ছার।

কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার।

বিনয়, সহিষ্ণুতা, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষকে সমানভাবে দেখা ও সম্মান করা এই ছিল তাঁর প্রেমধর্মের মূল কথা - যার সার্বজনীন আবেদন ধর্ম ও সংস্কৃতির নবজাগরণ ঘটিয়ে অবক্ষয়িত হিন্দুধর্মে নতুন প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করে।

১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ফাল্গুনী পূর্ণিমার এক সন্ধ্যায় ভারতের পশ্চিম বঙ্গের নবদ্বীপ শহরে শ্রী চৈতন্যদেবের জন্ম। তাঁর পিতার নাম পন্ডিত জগন্নাথ মিশ্র। মায়ের নাম শচীদেবী। তাঁরা জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ। শ্রী-চৈতন্যের ছেলেবেলার নাম ছিল বিশ্বম্ভর। মা আদর করে ডাকতেন নিমাই বলে। গায়ের রং উজ্জ্বল গৌর ছিল বলে অনেকে আবার তাঁকে "গৌরাঙ্গ" বলে ডাকতো।

নিমাইরা মোট দশ ভাইবোন। আট বোন আগেই মারা গেছে। দুই ভাই

বেঁচে আছে , বড় বিশ্বরূপ, ছোট বিশ্বম্ভর।

ছেলেবেলায় নিমাই বেশ দুরন্ত ছিলেন। কিন্তু অনেক সন্তান মারা যাবার পর এদের পেয়েছেন বলে বাবা- মা তাদের কঠোর শাসন করতেন না। আবার নিমাইয়ের চেহারাটি বেশ সুন্দর ছিল বলে পাড়ার লোকেরাও তাকে খুব ভালবাসত। নিমাই দিনভর দুষ্টুমী করে বেড়ায় আর তার বড় ভাই বিশ্বরূপ অদ্বৈত আচার্যের টোলে পড়ে।

একদিন এক ব্রাহ্মণ অতিথি হলেন নিমাইদের বাড়ীতে। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণেরা অন্যত্র গেলে নিজে রান্না করে খেতেন। ব্রাহ্মণ নিজে রান্না করলেন। আহারের আগে ভগবানকে অন্ন নিবেদন করে আহারে বসবেন এমন সময় কোত্থেকে নিমাই এসে এক মুঠো ভাত মুখে তুলে নিল। অন্ন এঁটো হয়ে গেল। সে ভাত আর ব্রাহ্মণ খেলেন না। ব্রাহ্মণ আবার রাঁধলেন। অন্ন নিবেদন করে চোখ খুলেই দেখেন শিশু নিমাই কোত্থেকে এসে আবার খাচ্ছে। অতিথির এবারও খাওয়া হলো না। বাবা রেগে গিয়ে ছেলেকে মারতে গেলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ বাধা দিলেন এবং আবার রেধেঁ নিলেন। পিতা নিজে পাহারা দিতে লাগলেন নিমাইকে। দুপুর বেলা। বসে থেকে থেকে একসময় ঝিমিয়ে পড়লেন বাবা, সেই ফাঁকে নিমাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আবার অতিথির থালায় হাত দিলেন। ব্রাহ্মণ নারায়নকে অন্ন নিবেদন করে খেতে বসবেন। দেখেন নিমাই খেতে বসে গেছে।

ব্রাহ্মণ আর কাউকে কিছু না বলে নারায়নের প্রসাদ মনে করে সেই অন্নই আহার করলেন।

নিমাই পাঠশালায় ভর্তি হলেন। অসামান্য মেধা। সবাই বলে পন্ডিতের ছেলে পন্ডিত হবে, এ আর নতুন কথা কি। কিন্তু পিতার মনে অন্য রকম আশংকা দেখা দিল। ভাবলেন, বড় ছেলে বিশ্বরূপ এতো পড়াশুনা করলো। কিন্তু যেই সে বুঝতে পারলো যে, এই সংসারে থেকে কোন লাভ নেই অমনি সে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেল। নিমাই পন্ডিত হলে আর ঘরে থাকতে চাইবে না। নিমাইয়ের পড়াশুনা বন্ধ হলো। সমবয়সীরা সবাই পড়ে। পাঠশালায় যায়। আর তারই পড়া বন্ধ। নিমাই জেদ ধরলেন মায়ের কাছে। বাবাকে বলে কয়ে রাজী করাতে হবে। একদিন নিমাই এক ফন্দী বের করলো। দুপুরে আস্তাকুড়ে ছাইয়ের গাদায় এক হাঁড়ির উপর বসে রইলো। খবর পেয়ে মা ছুটে এলেন এবং কথা দিলেন নিমাইকে পাঠশালায় ভর্তি করে দেবেন। এদিকে কয়েকদিনের জ্বরে ভুগে পিতা জগন্নাথ মিশ্র মারা গেলেন। নিমাই এর বয়স তখন নয়/দশ বৎসর।

নিমাই জগন্নাথ পন্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পাঠ শেষ করে গেলেন বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে ন্যায়শাস্ত্র পড়তে। বাসুদেব ছিলেন ন্যায় শাস্ত্রের সব চেয়ে বড় পন্ডিত। বাসুদেবের টোলে রঘুনাথ নামে এক ছেলে ছিল। সে পড়াশুনায় সব চাইতে ভাল ছিল। একদিন সে নিমাইকে বলল, নিমাই তুমি নাকি ন্যায় শাস্ত্রের একটি বই লিখছো ? কি লিখছো, আমাকে দেখাবে ?

নিমাই বললো কেন দেখাবো না? অবশ্যই দেখাবো।

পরদিন নৌকা করে গঙ্গা পার হবার সময় নিমাই তার পুঁথি পড়ে শোনাতে লাগলেন রঘুনাথ কে। রঘুনাথ যতই শোনে ততই তার মুখ শুকিয়ে যায়। শেষে সে বলে - নিমাই, আমিও ন্যায়শাস্ত্রের একটি বই লিখছিলাম। কিন্তু তোমার এই বইখানির কাছে আমার বই কিছুই না। তোমার এই বই যে পড়বে, সে আর আমার বই পড়বে না।

নিমাই এ কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বইটা গঙ্গায় ফেলে দিয়ে বললো, তা'হলে তোমার বই-ই চলুক।

রঘুনাথ অবাক হয়ে গেল। তার চোখে জল এল। বন্ধুর জন্য যে বন্ধু এতোটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারে তা সে ভাবতেও পারেনি।

নিমাই এবার নিজেই টোল খুললেন। ছাত্র পড়ান। এতে যা আয় হয় তাতেই সংসার চলে। নিমাই এর বয়স হলো একুশ বৎসর। নিমাইয়ের মা নিমাইকে সংসারী করার জন্য লক্ষ্মী দেবী নামে এক মেয়ের সাথে বিয়ে দিলেন।

এ সময় কাশ্মীরের বিখ্যাত পন্ডিত আচার্য্য কেশব মিশ্রকে শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজিত করে নিমাই রাতারাতি খ্যাতি অর্জন করেন।

ছেলেবেলা থেকেই নিমাই এর অভ্যাস তর্ক করা। তিনি গেলেন পূর্ববঙ্গে। কয়েকমাস পূর্ববঙ্গে থেকে সিলেট ঘুরে তিনি ফিরলেন। কিন্তু ফিরে এসে স্ত্রী লক্ষীদেবীর সাথে তার আর দেখা হলো না। সাপের কামড়ে স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী ইতিমধ্যে মারা গেছে।

নিমাই নামকরা পন্ডিত হয়ে উঠলেন। পূর্ববঙ্গ থেকে অনেক ছাত্র এলো নিমাই পন্ডিতের কাছে পড়তে। নিমাই একখানি ব্যাকরনের টিপ্পনী লিখতে শুরু করলেন। ছেলেকে আবার সংসারী করার জন্য নিমাই এর মা বিষ্ণুপ্রিয়া নামে এক সুন্দরী বালিকার সাথে নিমাই এর বিয়ে দিলেন। কয়েকদিন পর নিমাই গয়া গেলেন পিতৃশ্রাদ্ধ করতে। গয়ার একটি মন্দিরে বিষ্ণুর পাদপদ্মের চিহ্ন আছে। সেই মন্দিরে গিয়ে নিমাই দেখলেন চারদিকে ব্রাহ্মণেরা স্তবস্তুতি করছে। কেউ পূজা দিচ্ছে। চারদিকে ধূপধূনার সুগন্ধ। এসব দেখে নিমাই এর মন ভক্তি ভাবে অন্যরকম

হয়ে গেল। ঈশ্বরপুরী নামে এক বৈষ্ণব সাধুর সাথে নিমাই এর দেখা হয়ে গেল। সাধুর সাথে আলাপ করে নিমাই এর মনের ভক্তি আরও বেড়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই নিমাই ঈশ্বরপুরীর কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হলেন এবং সব ছেড়ে শুধু ভগবানের ধ্যানে মগ্ন হয়ে রইলেন।

কিছুদিন পর তিনি গয়া থেকে ফিরে এলেন নবদ্বীপে । এ তার অন্যরূপ। কোথায় তার সংসারের মায়া ? কোথায় তার ছাত্র পড়ানো ? মুখে শুধু কৃষ্ণ নাম। দু-চোখে অশ্রু। তিনি কৃষ্ণ নামে সংকীর্ত্তন করার জন্য নবদ্বীপে একটি দল গঠন করলেন। বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে ভক্তেরা এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। কোন জাতি-বিচার নেই। যে একবার প্রাণের সাথে হরিনাম করবে চৈতন্যের কাছে সে পরম পবিত্র। এখানে নিয়মিত কীর্ত্তন হতে লাগলো। আর নিমাই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে রইলেন। এখানে তিনি অনেক মহাপুরুষকে তার সাহচর্যে আনলেন। যেমন সন্ন্যাসী শ্রী নিত্যানন্দ, পুন্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীধর পন্ডিত, অদ্বৈত, ভক্ত হরিদাস ইত্যাদি। এই নূতন ধর্মের নাম হলো বৈষ্ণব ধর্ম। দেখতে দেখতে তার নব প্রবর্তিত প্রেমভক্তির ধর্মের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

এরপর চৈতন্যদেবের সংসারে আর মন টিকল না। একদিন তিনি গভীর রাতে নিদ্রিতা মাতা ও স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যান কাটোয়ায়। সেখানে তিনি কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হন। এ সময় নিমাই এর বয়স ছিল মাত্র ২৪ বৎসর। তাঁর নাম হলো শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য। তিনি নীলাচলে অর্থাৎ পুরীতে গিয়ে ভক্তদের সাথে বাস করতে লাগলেন।

নীলাচলে শ্রীচৈতন্য

এরপর তিনি নদীয়া, কাশী, বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে তাঁর ভক্তিভাবের নতুন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। এভাবে দেশ-বিদেশ ঘুরে ঘুরে তিনি ২০/২২ বছর কাটিয়ে দিলেন।

শ্রী চৈতন্যদেব ভগবানের প্রতি ভক্তি এবং ভালবাসা, জীবে দয়া, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষকে সমানভাবে দেখবার জন্য উপদেশ দিতেন। পূজা অনুষ্ঠানের আড়ম্বরের চাইতে ভগবানের নামকীর্তন তিনি সাধনার একটি বড় অঙ্গরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

এরপর ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, আষাঢ় মাসের একদিন মাত্র ৪৮ বছর বয়সে পুরীতে তিনি দেহত্যাগ করেন। আজও নানা স্থানে বহুলোক শ্রী-চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম মেনে চলে।

নিমাই- এর জীবনের বহু কাহিনী ছড়িয়ে আছে বৈষ্ণব সাহিত্যে। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ভক্তিধর্ম বাংলার ধর্মীয় ধারাকে এনে দেয় এক নতুন রূপ। প্রেরণা যোগায় পরবর্তী যুগের বহু সাধককে। আকর্ষণীয় করে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যকে।

এতকাল ধরে বাংলা সাহিত্য যেভাবে রচিত হয়ে আসছিল এবার তাতে দেখা দিল এক বিরাট পরিবর্তন। অজানা অদেখা দেব-দেবীর চেয়ে এই দেবোপম মানুষকে তাঁরা অনেক বেশী মহৎ ও সুন্দর বলে উপলব্ধি করলো। আর তাই বহু কাব্য রচিত হতে লাগলো চৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বন করে। বাংলাভাষায় যে সব চৈতন্য জীবনী কাব্য রচিত হয়, তার মধ্যে উলে-খযোগ্য হলো বৃন্দাবনদাসের লেখা 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের। লোচনদাস এবং জয়ানন্দ দুজনই চৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বন করে দু'টি কাব্য রচনা করেন। তাদের দু'জনেরই জীবনী কাব্যের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল।' এ দুটো কাব্যই গান গাওয়ার জন্য রচনা করা হয়েছিল এবং বৈষ্ণব সমাজে বেশ সমাদর পেয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে পদাবলী রচনা করে যারা বেশ নাম করেছিল লোচনদাস তাদেরই একজন। চৈতন্যমঙ্গল থেকে তার রচনার একটু শুনবে?

"কিসের রান্ধন কিসের বাড়ন কিসের হলদি বাটা,
আঁখির জলে বুক ভিজিল ভাস্যা গেল পাটা।
উঠিল গৌরাঙ্গভাব সম্বরিতে নারে,
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছারেখারে।"

'গোবিন্দদাসের কড়চা' গ্রন্থখানিও চৈতন্য জীবনের উপাদন হিসেবে উলে-খযোগ্য। তবে বিভিন্ন চৈতন্য-জীবনীর মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' হলো সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রামানিক পুস্তক।

শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে পরবর্তী সময়ে বহু পদ রচিত হয়েছে। এ সকল পদে মহাপ্রভুর ভাব, রূপ ও মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। গৌরাঙ্গের বিষয়ে রচিত বলে এ সব পদকে বলা হয় 'গৌরচন্দ্রিকা।'

তোমাদের নরোত্তমদাসের বৈষ্ণব গীতি কবিতার একটি পদ শোনাই-

"গৌরাঙ্গ বলিতে হৈবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর।
আর কবে নিমাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হৈবে।
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন,
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দবন।

এই ভাবে বাংলাসাহিত্যের গতি মানবমুখী হয়েছিল শ্রীচৈতন্যকে পেয়ে।

তাই বলা যায়, পঞ্চদশ শতাব্দীর নবজাগরণের পথিকৃৎ শ্রীচৈতন্য আজও প্রকট রয়েছেন বৈষ্ণব ধর্মে, তাঁর উদার ভাবধারা ও সার্বজনীন আবেদনের মধ্যে।

রাজা রামমোহন রায়

(১৭৭৪-১৮৩৩)

ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তক

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে পশ্চাত্য সভ্যতা ও খৃষ্টান ধর্মের প্রভাবে অনেক হিন্দু, হিন্দু ধর্মের গোড়ামির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে থাকেন। তাই দরকার হয়ে পড়ল হিন্দু ধর্মের সংস্কার। হিন্দুধর্মের এই সময়োচিত সংস্কারের ভার নিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ইনি এক নতুন মতবাদ প্রচার করলেন, যার নাম ব্রাহ্মধর্ম। ব্রহ্মের বা ভগবানের উপাসনা করাই হল এই ধর্মের মূল কথা। তাঁরা উপনিষদকে মানেন, তাতে যে ব্রহ্মের কথা আছে তাকেই মানেন। ভগবান এক ও অদ্বিতীয়, তার কোন আকার নেই। অন্যহিন্দুরা প্রায় সবাই মূর্তি বা ছবির পূজো করেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মে তা করেনা। এইসব বিভিন্ন পার্থক্যের জন্য ব্রাহ্মধর্মকে একটি আলাদা ধর্ম বলা হয়।

রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তার এই নতুন মতবাদের নামই ব্রাহ্মধর্ম। রামমোহন রায় নানা ভাষায় সুপন্ডিত

ছিলেন। উপনিষদ, কোরআন ও বাইবেল তিনি ভালভাবে পড়েছিলেন। তাই এই তিনটি গ্রন্থের মূল আদর্শ- এক ভগবানের এই মতবাদই তাঁর ধর্মে ফুটে উঠেছিল।

রামমোহন রায়ের গড়ে তোলা ব্রাহ্মসমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত। '১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তাকে সবাই বলত মহর্ষি। তিনি ব্রাহ্মধর্মের আর ব্রাহ্ম সমাজের সব নিয়ম কানুন ঠিক করে দিয়ে এটাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর শুরু হল দলাদলি। কেশবচন্দ্র সেনকে লোকে 'ব্রহ্মানন্দ' বলত। তার নেতৃত্বে পুরোনো ব্রাহ্মসমাজ দু'ভাগ হয়ে যায়। নতুন দলের নাম হয় 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ।' আদি ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদ প্রথা মানতেন। কিন্তু এই সমাজ জাতিভেদের বিরোধিতা করতেন। কিছুদিন পর ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল লোকেরা যেমন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী ইত্যাদি কয়েকজন মিলে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামে আরও একটি নতুন সমাজ গঠন করলেন। এদের মতবাদ আরও আধুনিক ও প্রগতিশীল ছিল। জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরোধিতা এবং স্ত্রী- শিক্ষাও স্ত্রী স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম ছিল এই নতুন সমাজের মতবাদের অঙ্গ।

তাই বলা যায়, ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীই হিন্দুধর্মকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

এসো, আজ আমরা ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে কিছু জেনেনেই।

আজ থেকে অনেক অনেক বৎসর আগের কথা। ১৭৭৪ সালের ১০ই মে, ভারতের হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদার বংশে রামমোহন রায়ের জন্ম। তাঁর রাজা নামটি কিন্তু উপাধি। উপাধিটি দিয়েছিলেন বাদশাহ আকবর শাহ।

রাজা রামমোহন রায়ের বাবার নাম ছিল রামকান্ত রায় আর মায়ের নাম তারিনী দেবী। রামমোহনের পূর্ব-পুরুষ রাজ সরকারের কাজ করে 'রায় রায়ান' উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁদের উপাধি ছিল 'বন্দোপাধ্যায়।' রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ের তিন বিবাহ ছিল। প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান। দ্বিতীয়া তারিনী দেবী, তৃতীয়া রামনি দেবী। তারিনী দেবীর দুই পুত্রও এক কন্যা ছিল। বড় জগমোহন

ও ছোট রামমোহন। রামমোহনের এক বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। নাম রামলোচন। তিনি ছিলেন সবার ছোট।

ছোটবেলা থেকেই খুব মেধাবী ছিলেন রামমোহন। প্রথমে গৃহে ও পরে গ্রামের পাঠশালায় তাঁর প্রাথমিক শিক্ষালাভ হয়। পাঁচ বৎসর বয়সেই রামমোহনের পড়াশুনার প্রতি দারুন অনুরাগ দেখা দেয়। পড়াশুনার প্রতি রামমোহনের এতো আগ্রহ দেখে পিতা- মাতা বেশ আনন্দিত হতেন। আট বৎসর বয়সে তাকে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। তিনি এখানে বাংলা ও আরবী ভাষা শেখেন। তখনকার দিনে সংস্কৃত আর ফার্সী শিখলেই উচ্চ শিক্ষিত বলে গণ্য করা হত। রামকান্ত ছেলেকে সংস্কৃত শিখতে পাঠালেন কাশীতে। রামমোহন কয়েক বছরের মধ্যেই সংস্কৃত ভালভাবে শিখে ফেলে-ন। এরপর পিতা রামমোহনকে ফার্সী শিখাবার জন্য পাঠালেন পাটনায়। রামমোহন এত ভালো ফার্সী শিখলেন যে, তার নাম হয়ে গেল 'মৌলবী রামমোহন।' এ ভাবে মাত্র চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সে অসামান্য পন্ডিত হয়ে নিজ গ্রাম রাধানগরে ফিরে এলেন রামমোহন এখানে বিখ্যাত অধ্যাপক নন্দনকুমার কাব্যালংকারের সংস্পর্সে এসে রামমোহন আরো জ্ঞান অর্জন করেন।

কিন্তু এত বিদ্যা এত জ্ঞান কাল হয়ে দাড়াল রামমোহনের পক্ষে। দেব-দেবীর পূজোয় তাঁর আর বিশ্বাস নেই। তিনি বললেন, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। মাটি, পাথরের দেবতাকে পূজো করা ভুল। এক ঈশ্বরকে যারা নানারূপে দেখে, তারা ভুল করে।

প্রথম প্রথম রামমোহনের পিতা ছেলেকে বোঝাতে চাইতেন। কিন্তু তর্কে বিচারে রামমোহন পিতাকে হারিয়ে দিতেন। এতে একদিন ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন পিতা রামকান্ত। গর্জন করে উঠলেন তিনি ছেলের প্রতি- 'নাস্তিক কুলাঙ্গার। বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।'

সেই মুহূর্তেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল ষোল বছরের রামমোহন। কিছুকাল ঘুরে বেড়ালেন পশ্চিম বঙ্গের নানা জায়গায়। ঘুরতে ঘুরতে তিনি একদিন চলে আসেন তিব্বতে। তিব্বতে সু-উচ্চ প্রাসাদ দেখে একদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন স্থানীয় একজনকে-

এ কার প্রাসাদ?

দালাই লামার

কে তিনি?

যাকে জিজ্ঞেস করা হলো এবার রেগে উঠলো সেই লোকটি। বললো- দালাই লামা কে জানো না? তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। তিনিই স্বর্গ মর্ত্য পাতালের দেবতা। তাঁর ইচ্ছায় চন্দ্র-সূর্য ওঠে, অস্ত যায়। তাঁর আদেশে ভূমিকম্প হয়, মহামারী আসে, পাহাড়ে তুষার ঝড় উঠে-

খিল খিল করে হেসে উঠলো সতেরো বছরের রামমোহন, বললো, আমি এ সব বিশ্বাস করি না। দালাইলামা একজন মানুষ। ও-সব কিছুই করবার ক্ষমতা তার নেই।

এতো বড় কথা। দালাই লামার নামে এতো বড় অপবাদ। লোকগুলো ক্ষেপে গেল রামমোহনের উপর। তারা হত্যা করবে রামমোহনকে।

হত্যা তারা করত ও। কিন্তু রামমোহনকে আড়াল করে রেখে তাকে বাঁচিয়ে দিল তিব্বতের মেয়েরা। কেননা তারাও মায়ের জাত।

দেশের পথে যাত্রা করলো রামমোহন। মনে সংকল্প। ধর্মের নামে মানুষের এই মূঢ়তাকে সে দূর করবে। আর সে কখনো ভুলবেনা মায়ের জাতকে। তাদের দুঃখ দূর করাই হবে তার জীবনের সাধনা।

দেশে ফিরে এলেন রামমোহন। কিন্তু বেশীদিন নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। কিছুদিন পৈতৃক সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের পর আবার একদিন বেরিয়ে পড়লেন পৃথিবীর পথে। নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তুলবেন।

কিছুকাল ঘুরে বেড়ালেন ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। পাটনা, কাশী এবং আরো বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু যেখানেই যান, দেখেন একই দুর্ভাগ্য, একই কুসংস্কার। হিন্দুর দেশ ভারতবর্ষ। কিন্তু কোথায় হিন্দু? কেউ শাক্ত, কেউ বৈষ্ণব, কেউ রামায়েৎ, কেউ গানপৎ। শুধু পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ আর ঘৃনা। গঙ্গাসাগরে সন্তানকে ভাসিয়ে দিয়ে দেশের মানুষ ভাবে পূর্ণের ভাড়ায় ঘর ভরে উঠেছে। ঘরের মেয়েদের অশিক্ষা আর দুর্গতির মধ্যে রেখে তারা মনে করে ধর্মচর্চা হচ্ছে। এক এক জন কুলীন তিনশো-চারশো করে বিয়ে করে। একজন কুলীন যখন মারা যায়, তখন ছয় মাসের মেয়ে থেকে ছিয়াশী বছরের বুড়ী পর্যন্ত এক সঙ্গে বিধবা হয়। আর দেখলেন সতীদাহের বীভৎস ভয়ংকর রূপ। নব্বই বছরের বুড়ো স্বামীর চিতায় জোর করে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে ষোল বছরের স্ত্রীকে। নাহ! এই ইতিহাস বদলাতে হবে। নতুন করে গড়তে হবে এ দেশের দুর্দশাগ্রস্থ

মানুষগুলোকে।

রামমোহন কলকাতায় এলেন। এখানে শুরু করলেন কোম্পানীর কাগজের ব্যবসা। কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালত আর নতুন গড়ে ওঠা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। এই সময় ইংরেজ সিভিলিয়ানদের অনেকের সঙ্গেই তার পরিচয় হয়, এদের একজনের নাম জন ডিগ্‌বি।

তখন রামমোহনের বাবা রামকান্ত রায় বর্ধমান রাজ সরকারের চাকরি করতেন এবং সেখানেই বাড়ি করে থাকতেন। রামমোহনের বাবা নিজেও ছিলেন বেহিসেবী। তাই শেষ জীবনে নানা রকম দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই সব মানসিক দুশ্চিন্তা আর অসুখে ১৮০৩ সালে একদিন রামমোহনের বাবা বর্ধমানে মৃত্যুবরণ করেন।

বাবার মৃত্যুর সংবাদ শুনে রামমোহন চলে এলেন দেশের বাড়িতে। তাঁদের আদিবাড়ি লাঙ্গুল পাড়ায় রামকান্তের শ্রাদ্ধের আয়োজন করা হলো। কিন্তু রামমোহনের নুতন ধর্মমত নিয়ে দেখা দিল গোলযোগ। রামমোহনের মা তারিনী দেবী রাম মোহনকে পিতৃশ্রাদ্ধের অধিকার দিলেন না। তাদের কাছে রামমোহন নাস্তিক। যা সামান্য বন্ধন ছিল, তা ও কেটে গেল। রামমোহন চিরদিনের মতো পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে চলে গেলেন।

জন ডিগ্‌বির সঙ্গে রামমোহনের আগেই পরিচয় ছিল। এবার তা আরো ঘনিষ্ঠতায় পরিনত হলো। ইতিমধ্যে টমাস উডফোর্ড নামে এক ইংরেজ কালেক্টারের দেওয়ানী করে সরকারী কাজে রামমোহন কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। এ সব কারণে ডিগবি বেশ আগ্রহের সাথেই রামমোহনকে নিজের দেওয়ান করে নিলেন। রামমোহন ডিগ্‌বির সাথে রামগড়, যশোহর, ভাগলপুর ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ডিগ্‌বি রামমোহনের অসামান্য প্রতিভা বুঝতে পারলেন। একদিন তিনি কথায় কথায় রামমোহনকে বললেন, রামমোহন, ফার্সী আর সংস্কৃতে তুমি এত ভাল। তুমি ইংরেজী শিখোনা কেন?

রামমোহন উপলব্দি করলেন, দুনিয়াকে জানতে গেলে ইংরেজি শিখতে হবে। কিন্তু দেশে তখন ইংরেজি শেখার কোন স্কুল নেই এবং ইংরেজি শেখার রেওয়াজ ও নেই। ফার্সী জানলেই সরকারী চাকরী পাওয়া যায়। তাই রামমোহন

বললেন, কে আমাকে ইংরেজি শেখাবে?

ডিগ্‌বি বললেন, আমিই শেখাব।

শুরু হলো ডিগ্‌বির কাছে ইংরেজি শেখা। এ সময় রামমোহনের বয়স ছিল বাইশ বৎসর। অসামান্য মেধা আর একাগ্র নিষ্ঠায় মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই রামমোহন যে কোন ইংরেজের মতো চমৎকারভাবে ইংরেজি বলতে আর লিখতে শিখলেন।

রামমোহন ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। একবার হলো কি, রামমোহন পালকি চেপে ভাগলপুরে যাচ্ছিলেন। রাস্তার ধারে দাড়িয়ে ছিলেন স্যার ফ্রেডারিক হ্যামিলটন। তিনি ছিলেন ভাগলপুরের বিদায়ী কালেক্টর। তখনকার দিনে কোনো ইংরেজ অফিসারের সামনে কোন বাঙ্গালীর চেয়ারে বসবার অধিকার ছিল না। এ হেন অবসথায় তাকে সেলাম না কইে বাঙ্গালী রামমোহন পালকি চেপে চলে গেল। রামমোহনের এমন সাহস দেখে হ্যামিলটন তো রেগে আগুন। তক্ষুণি তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে রামমোহনের পালকি ধরলেন। তারপর শুরু করলেন অকথ্য ভাষায় গালাগাল।

রামমোহন করলেন কি, তখনকার বড়লাট লর্ড মিন্টোর কাছে এই অসম্মানের প্রতিকার দাবী করে একটি আবেদনপত্র পাঠালেন। ফলে স্যার হ্যামিলটনের কাছে নির্দেশ এল, তিনি যেন ভবিষ্যতে কোন দেশীয় লোকের সঙ্গে এ-রকম অভদ্র বচসা না করেন।

এমনি সিংহের মতো পুরুষ ছিলেন রামমোহন। এ-দিকে ডিগ্‌বীর সঙ্গে চাকরি করে রামমোহনের যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হলো। তিনি রংপুর থেকে দেশে ফিরে এলেন। রঘুনাথপুরে একটি নতুন বাড়ী তৈরী করলেন। নিজের বাড়ীতে বসে তিনি শাস্ত্র আলোচনা করেন, বই লেখেন, স্বাধীন মতামত প্রচার করেন। সারা ভারতবর্ষের জন্য সার্বজনীন ধর্মমত গড়ার কথা বলেন "একমোবাদ্বিতীয়ম্" (এক ঈশ্বর ছাড়া আর দ্বিতীয় নেই) মন্ত্রে। কিন্তু তার এই স্বাধীন মতামতের জন্যেই চারদিকে শত্রু সংখ্যা বেড়ে গেল। নানা উৎপাত শুরু হলো রামমোহনের বাড়ীতে। তাঁর বাড়ীতে ঢিল পড়া, গরুর হাড় পড়া শুরু হলো। তাঁর নামে কদর্য ভাষায় গান রচনা করে দলে দলে লোক তা গেয়ে বেড়ায়।

রামমোহন বুঝলেন, গ্রামে বসে এ সাধনা আর সংগ্রাম সম্ভব নয়। তিনি চলে এলেন কলকাতায়। তখন তাঁর বয়স চলি-শ বৎসর। এখানে এসে

মানিকতলায় একটি বাড়ী কিনলেন তিনি এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই তার প্রতিভার কথা ছড়িয়ে পড়ল কলকাতায়। দলে দলে লোক তার বাড়ীতে আসতে লাগল। রামমোহন ছিলেন বহুভাষাবিদ। মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে তিনি দশটি ভাষা শিখে ফেলেছিলেন। ইংরেজী , বাংলা, আরবী, গ্রীক, হিব্রু, ল্যাটিন, ফরাসী, এবং উর্দু ভাষাতে তিনি লিখতে ও পড়তে পারতেন।

কলকাতায় এসেই রামমোহন তাঁর নতুন সর্বভারতীয় ধর্মমত প্রচার করতে লাগলেন। এবার তার অনেক অনুরাগী হলো। এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ছিলেন। এই সব অনুরাগীদের নিয়ে রামমোহন তার বাড়ীতে একটি সভা গঠন করলেন। এই সভায় বিভিন্ন রকম আলোচনা হত। শাস্ত্র পাঠ হত। তাঁর 'একমেবাদ্বিতীয়ম' অর্থাৎ এক ঈশ্বর ছাড়া আর দ্বিতীয় নেই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলত। রামমোহনের এ সভায় জাতিভেদ, সমাজভেদ ছিল না। সবাই আসতে পারতো - দেশের সমস্ত মানুষের জন্যই তিনি জ্ঞানের দরজা খুলে দিলেন। কিন্তু তাঁর এই উদার ধর্মমত গোঁড়ারা বেশীদিন সহ্য করতে পারলনা। ফলে রামমোহনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। কিন্তু রামমোহন ও ছেড়ে দেবার পাত্র নন। সত্য আর যুক্তির ভিত্তিতে সব আক্রমনের জবাব দিতে লাগলেন। একের পর এক বই লিখে যেতে লাগলেন। প্রকাশ্য বিচার সভায় পন্ডিতেরা হেরে যেতে লাগলো তাঁর কাছে। তাঁর ফার্সী বই "তূহ্ফাৎ" উল-সুয়াহ্হিদিন।' 'বেদান্ত সার' 'বেদান্ত গ্রন্থ' ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে ইউরোপে পর্যন্ত সাড়া জাগিয়ে তুললো। রামমোহন তার বন্ধু অ্যাডামকে নিয়ে একটি নতুন ধর্মসভা গড়ে তুললেন এবং নাম দিলেন 'ইউনিটারিয়ান কমিটি।' এর উদ্দেশ্য হলো 'গোঁড়া ক্রীশ্চান-ধর্মের সংস্কার।'

এতে ক্রীশ্চান পাদ্রীরা রামমোহন আর অ্যাডামের উপর দারুন ক্ষেপে গেল ও গালাগালি আরম্ভ করলো। তারা ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস থেকে রামমোহনের বই ছাপানো বন্ধ করে দিল। কিন্তু রামমোহন হার মানতে জানেন না। নিজের টাকায় তিনি নতুন প্রেস কিনলেন, আর বই ছাপাতে লাগলেন। ব্যস্ততায় কাটতে লাগলো রামমোহনের দিন।

তখন দেশে ঈষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব। এই কোম্পানী ভারতবর্ষে শিক্ষা প্রচারের জন্যে কিছু কিছু কাজ করে যাচ্ছিলো। এই সময় কলকাতায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়। ১৮১৬ সালের মে মাসে সুপ্রীম

কোর্টের চীফ জাষ্টিস্ স্যার এডোয়ার্ড হাইড্ ঈষ্টের বাড়িতে আলোচনা সভা হলো। কলকাতার সমস্ত বিশিষ্ট লোকের ডাক পড়ল-একদিকে যেমন রামমোহনের দলের লোক রইল, অন্যদিকে তেমন তার বিরোধী দলের লোকও রইল।

চাঁদা তুলবার প্রস্তাব উঠল। সেই সাথে কলেজের পরিচালক সমিতি গড়বার ও প্রস্তাব হলো। কিন্তু তক্ষুনি প্রতিবাদ উঠল রামমোহনের বিরোধী পক্ষ থেকে। বিরোধী পক্ষেরা বললো, রামমোহন যদি এই কলেজের কোন ব্যপারে জড়িত থাকেন বা চাঁদা দেন তাহলে তারা সমবেতভাবে এই প্রতিষ্ঠানকে বর্জন করবেন।

এ-কথা শুনে স্যার হাইড্তো অবাক। শিক্ষার ক্ষেত্রে এ-সব ব্যক্তিগত কোন্দল কেন? কিন্তু রামমোহনের বিরোধী দলের এক কথা, 'হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী রামমোহন এই কলেজের সংশ্রবে থাকলে তারা এই কলেজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না।"

হাইড্ ঈষ্ট হেসে ফেলে তখন বললেন, আমি তো গোঁড়া ক্রীশ্চান। আমি যদি কিছু অর্থ আপনাদের কলেজের জন্য সাহায্য করি. নেবেন ? বিরোধী বক্তারা বললো- 'অবশ্যই নেবো। কিন্তু রামমোহনের কিছু নেবোনা । তাকে বাদ দিতেই হবে।

রামমোহন ইচ্ছে করলে নিজের জোরেই সেদিন কলেজের পরিচালন সমিতিতে থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ালেন। ভাবলেন, দেশের জন্য তার এইটুকু ক্ষতি কিছুই না, তবুও দেশে গড়ে উঠুক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যার জন্যে এতো চেষ্টা এত পরিশ্রম করেছেন তাকে সফল করে তুলতে এ ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে।

রামমোহনকে বাদ দিয়েই গড়ে উঠলো তার স্বপ্নতীর্থ-এক মহাপাঠশালা। সে মহাপাঠশালাটি আজো মাশা উঁচু করে আছে সগৌরবে। তার নাম কি জানো? প্রেসিডেন্সী কলেজ।

এবার রামমোহন ভাবলেন, নিজেই একটি স্কুল দেবেন। ইংরেজী শিক্ষা চাই। চাই জ্ঞানের আলো। তাই নিজেই গড়ে তুললেন একটি স্কুল- 'অ্যাংলো হিন্দু স্কুল।'

কিন্তু ছাত্র আসেনা। তাতে কি! রামমোহন তার নিজের ছেলে রামপ্রসাদকে ভর্তি করে দিলেন। শিষ্য নন্দকিশোর বসুর ছেলে রাজনারায়নকে

নিয়ে এলেন, দ্বারকানাথ তার ছেলে দেবেন্দ্রনাথকে ভর্তি করে দিলেন। এ-ভাবে এলো আরো কিছু কিছু ছাত্র। এদের কাছেই রামমোহন শোনাতে লাগলেন তার মতবাদ- হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ খৃষ্টানের মিলনের বানী,আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা।

রামমোহন অনুভব করলেন আরো স্কুল দরকার। ব্যাপক ইংরেজী শিক্ষা চাই। তখন কলকাতার চার্চ অব স্কটল্যান্ডের প্রধান বিশপ ছিলেন রেভারেন্ট জেম্‌স ব্রাইট। রামমোহন তার সঙ্গে আলোচনা করে স্কটল্যান্ড থেকে একজন নামকরা শিক্ষক আলেকজান্ডার ডাফকে আনালেন।

আলেকজান্ডার ডাফ নতুন স্কুল খোলার উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল, কেউ স্কুল বাড়ী ভাড়া দিতে রাজী হলো না। কেননা তারা ভাবলো, ক্রীশ্চানকে ঘর ভাড়া দিলে জাত যায় যদি ? এছাড়া ইংরেজী শিক্ষার ফলে ছেলেরা যদি ক্রীশ্চান হয়ে যায় ? ডাফ চিন্তায় পড়লেন। ভরসা দিলেন রামমোহন। বললেন, কোন চিন্তা নেই। আমিই সব ঠিক করে দিচ্ছি। তিনি ডাফ্‌কে বাড়ী যোগাড় করে দিলেন। কিন্তু ছাত্র আসেনা। রামমোহন নিজেই পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের বাড়ী ঘুরে ঘুরে ছাত্র যোগাড় করে আনতে লাগলেন। গড়ে উঠলো স্কুল। সেই স্কুলটিই আজকের স্কটিশচার্চ কলেজ।

দেশে তখন তেমন খবরের কাগজ নেই। অতএব জনমত প্রকাশের মুখপাত্র চাই। রামমোহন পত্রিকার পর পত্রিকা বের করে চলেছেন। 'সম্বাদ কৌমদী', ব্রাহ্মণ সেবধি, 'ফার্সী মিরাৎ উল আখবার' । এইসব কাগজে তিনি প্রচার করতে লাগলেন তাঁর নতুন সার্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম , শাস্ত্রের বিচার আর নতুন চিন্তা ও আদর্শ। তিনি বিভিন্ন দাবী জানাতে লাগলেন, যেমন মেয়েদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রতিকার, প্রজার উপর জমিদারী পীড়নের অবসানের জন্য নতুন প্রজা-সত্ব আইন, আসামীর হেরিয়াস কার্পাসের অধিকার আর ন্যায় বিচারের জন্য জুরীর প্রথা। এসব সমাজ সংস্কারমূলক-কাজের সাথে সাথে বের করতে লাগলেন বইয়ের পর বই। বন্ধুর সাথে শত্রুও জুটলো। রক্ষণশীল প্রাচীন পন্থীরা পত্র-পত্রিকায় কটু ভাষায় গালাগালি করতে লাগলো রামমোহনকে। রটে গেল রামমোহন ম্লে-ছ-গরুর মাংস খায়, আরও কত কী। তার নামে গান রচনা হল-

ব্যাটার সুরাই মেলের কুল,

ব্যাটার বাড়ী খানাকুল,
ব্যাটার জাত বোষ্টম কুল,
ওঁ তৎ সৎ বলে ব্যাটা
বানিয়েছে স্কুল

কিন্তু রামমোহন এসবে পরোয়া করলেন না। এগিয়ে চললেন তাঁর সত্যের পথে। মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা- "দেশ আজ আমায় না চিনুক - কাল চিনবে।"

অনেকেই তখন বলতো- রামমোহন পুরুষ নয়, সিংহ।

তখন মিশনারিরা ভাবতেন, দেশের বড় বড় লোকদের ক্রীশ্চান করতে পারলে সারা দেশ ক্রীশ্চান হওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়বে। চার্চ অব ইংল্যান্ডের আর্চবিশপ মিডলটনের ও সেই বিশ্বাস ছিল। তিনি ভাবলেন, চলতি হিন্দু ধর্মের সঙ্গে রামমোহনের মিল নেই। ক্রীশ্চানদের ইউনিটারিয়ান কমিটির সঙ্গে তার ঘনিষ্ট যোগাযোগ । তাই একটু চেষ্টা করলেই কি তাঁকে ক্রীশ্চান ধর্মে টেনে আনা যায় না? একদিন রামমোহনকে নিমন্ত্রণ করে সেই ইঙ্গিতই দিলেন মিড্লটন। বললেন, তুমি ক্রীশ্চান হও। দেখবে তোমার সৌভাগ্য কেমন করে খুলে গেছে।

রামমোহনের দু'চোখে আগুন জ্বলে উঠলো। সেই যে তিনি মিড্লটনের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন আর কোনদিনও সে মুখো হননি।

স্বদেশ হোক আর বিদেশ হোক, যেখানেই পীড়িতের কান্না সেখানে রামমোহন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, কবে তার দেশের মানুষও ফ্রান্সের বিপ-বী জনতার মতো মুক্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠবে, 'মার্সে-ই।' কবে আমাদের দেশেও চূর্ণ হয়ে যাবে বাস্তিলের কারাগার।

মানুষের স্বাধীনতা আর মুক্তির জন্য ছিল তার অসামান্য ব্যাকুলতা। ভাবলে অবাক হতে হয় পিতামাতা যাকে বার বার ত্যাগ করেছেন, নিজের পত্নীরা পর্যন্ত যাঁর জীবন সংগ্রাম হতে দূরে ছিলেন, সমাজ যাকে উৎপিড়ন করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে নাই, দেশ যাকে অস্বীকার করেছে, সেই মহাপুরুষ সমাজ ও দেশবাসীর জন্য কি-না করেছন।

রামমোহনের ছিল অটুট স্বাস্থ আর অফুরন্ত কর্মশক্তি। তার শরীরটি ছিল দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট উঁচু। সাধারণতঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মাথা যত বড় হয় রামমোহনের মাথা ছিল তাদের চেয়েও অনেক বড়। দৈনিক আঠারো/উনিশ ঘন্টা পরিশ্রম করতেন তিনি। আর খেতেও পারতেন প্রচুর। সারাদিনে বারো সের দুধ খেতেন তিনি। কথিত আছে একবারে একটি আস্ত পাঠার মাংস তিনি খেতে

পারতেন। তিনি নিজের শরীরের অত্যন্ত যত্ন নিতেন এবং সেটাকে ভগবানের মন্দির বলে মনে করতেন। তাঁর একটি দিনলিপি শোন। তিনি প্রতিদিন খুব ভোরে উঠতেন এবং প্রাতঃ ভ্রমণ করতেন। তারপর স্নান করতেন। স্নানের আগে তিনি ভালভাবে সমস্ত শরীরে সরিষার তৈল মালিশ করতেন। দু'টি জোয়ান লোকে তার শরীরে তেল মালিশ করে দিত । স্নানের পর ভারতীয় প্রথায় জোরাসন করে বসে তিনি আহার করতেন।

সাধারণতঃ রুটি, মধু ইত্যাদি দিয়ে তিনি প্রাতঃরাশ সরাতেন। দুপুরে তিনি মাছ-ভাত ও দুধ খেতেন। এরপর সাধারণতঃ দু'টা পর্যন্ত লেখাপড়ার কাজকর্ম করতেন। তারপর বিকালে তাঁর সাহেব বন্ধুদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যেতেন। রাতে তিনি বিলেতি নিয়মে মুসলমানী খাবার , পোলাও কোপ্তা, কোর্মা ইত্যাদি খেতেন। তিনি মাংস খেতে পছন্দ করতেন বেশী। তিনি পায়জামা, চোগা-চাপকান ও পাগড়ী পরতে ভালবাসতেন এবং বলতেন ঈশ্বরের রাজদরবারে যেতে হলে তার যোগ্য পোষাক পরে যাওয়া উচিত।

সেকালে কুলীন ব্রাহ্মণেরা অতি শৈশবেই বিয়ে করতেন। তাদের বহু বিবাহ ও প্রচলিত ছিল। রামমোহনও এই সামাজিক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পান নাই। তাঁর তিন বিয়ে। প্রথম বিয়ে হয় অতি অল্প বয়সেই। সে বালিকা শৈশব অতিক্রম না করতেই মারা যায়। রামমোহনের যখন নয় বছর বয়স সে সময় তার পিতা তাঁকে আবার বিয়ে করান। ঐ বছরই আরও একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। রামমোহনের দুই পুত্র। বড় ছেলে রাধা প্রাসাদ ১৮০০ সালে জন্মগ্রহণ করে। আর ছোটটির নাম রমাপ্রাসাদ।

রামমোহন অনেক রাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনা করতেন। রাত দু'টা তিনটার আগে কোনদিন ঘুমুতেন না। তাঁর পড়ার ঘরে একটি বড় ঘুরানো গোল টেবিল ছিল। তার উপর অনেক বই থাকত। যখন যে বই এর দরকার রামমোহন টেবিলখানি ঘুরিয়ে দিতেন, বই হাতের কাছে এসে পড়ত। রামমোহনের মেধাও ছিল অসাধারণ। একবার এক বড় পন্ডিত একটি তন্ত্রের বই নিয়ে রামমোহনের সঙ্গে তর্ক করতে এলেন। তন্ত্রের সেই বইটি রামমোহনের পড়া ছিল না। তিনি পন্ডিতকে পরদিন আসতে বললেন, আর এই ফাঁকে বইটি আনিয়ে এক রাত্রির মধ্যে সম্পূর্ণ আয়ত্ব করলেন সেই দুরূহ বইটি।

পরদিন শুরু হলো তর্ক। রামমোহনের কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন সেই পন্ডিত। বই লেখা ছাড়া রামমোহন অনেক গান ও রচনা করেছেন। ১৮২৭-

২৮ সালে রামমোহন প্রতিষ্ঠা করেন 'ব্রহ্মসভা।' এই ব্রহ্মসভাই পরে ব্রাহ্মসমাজ নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে। ব্রাহ্মসভার মাধ্যমেই রামমোহন প্রচার করেন তার ধর্মমতবাদ। তিনি বেদে বর্ণিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উলে-খ করে প্রচার করেন যে, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি নিরাকার , তিনিই বেদের ব্রহ্ম। এরা ব্রাহ্মের যারা উপাসক তারাই ব্রাহ্ম। তিনি তাঁর প্রচারিত এই মতবাদের উপর 'ব্রাহ্মোপাসনা' এবং 'বেদান্তগ্রন্থ' নামে দুটো গবেষণামূলক বই লেখেন। রামমোহনের প্রবর্তিত এই মতবাদ তখন প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি হলেন ব্রাহ্ম ধর্মমতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। আজো ব্রাহ্মধর্ম মতবাদের প্রচুর সমর্থক আছে।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ছাড়াও রামমোহনের আরও একটি উলে-খযোগ্য কাজ হলো সতীদাহ প্রথা নিবারণ। তখন হিন্দু ধর্মের মধ্যে এই কু-প্রথা চালু ছিলো যে, কোনো মেয়ের স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকেও স্বামীর সাথে জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়া মারা হতো রামমোহন এই কু-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮১৮ সালের নভেম্বর মাসে রামমোহন সতীদাহ নিবারণকল্পে প্রথম পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে তিনি পরপর তিনটি পুস্তক লিখেন এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে সতীদাহ বন্ধ করার জন্য আবেদন জানান। অন্যদিকে যারা সতীদাহের সমর্থক, তারা চুপ করে রইলেন না। তারা সতীদাহের পক্ষে যুক্তি দেখান এই বলে যে, "যেহেতু স্বাভাবিক ভাবেই মেয়েরা নীচু স্তরের জীব, তাদের বুদ্ধি-সুদ্ধি কম, তাদের কোনো মনের জোর নেই, তারা বিশ্বাসের অযোগ্য, তারা অজ্ঞ, এবং যেহেতু শাস্ত্রের হুকুমে তারা বিধবা হয়ে সংসারের সব সুখ বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য সেই জন্যে তাদের এইভাবে পুড়িয়ে মারাই উচিত।

সিংহ গর্জনে এর প্রতিবাদ করলেন রামমোহন। তীক্ষ্ণধার যুক্তিতর্কে প্রমাণ করে দিয়ে বললেন, "মেয়েরা কোনো অংশেই পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট তো নয়ই বরং অনেকদিক থেকেই তারা শ্রেষ্ঠ। সতীদাহের পেছনে হিংস্র বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না। "

যুক্তিতে হেরে গেল প্রতিপক্ষ। তারা রামমোহনের সর্বনাশ কামনা করতে লাগলো। এ সময় ভারতবর্ষে গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। তিনি সতীদাহ সম্পর্কে আগে থেকেই বিরূপ ছিলেন। রামমোহনের লেখা পড়ে এবং তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক স্থির করলেন ভারতবর্ষ থেকে এ প্রথা তিনি উচ্ছেদ করবেন। এই ঘোষণায় মৌচকে যেন ঢিল পড়ল। রক্ষণশীল সমাজ চিৎকার করে উঠল- হিন্দু ধর্ম গেল। জাত

গেল। বেন্টিঙ্ক যেন কক্ষনো এমন অন্যায় কাজ না করেন। অপর দিকে দেশবাসীও তখন কিছুটা সজাগ হয়ে উঠেছে। ফলে রামমোহনের দলেও লোকের অভাব হলো না। দু'দিকে ভাগ হয়ে গেল হিন্দু সমাজ। আর শেষ পর্যন্ত রামমোহনেরই জয় হলো। সেটা ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখ, সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে আইন পাশ হয়ে গেল।

হায় হায় করে উঠলো ধর্মধবজীরা। তারা ক্ষেপে গিয়ে বলে উঠলো - অসম্ভব! এ কিছুতেই হতে পারে না। দেশের রাজা, মহারাজা , পন্ডিত থেকে শুরু করে প্রায় আটশো লোক সতীদাহের পক্ষে দরখাস্তে সই করেছে। তবুও আইন পাশ হয়ে গেল ? ম্লে-ছ রামমোহনের ভাওতায় পড়ে খৃষ্টান বেন্টিঙ্ক হিন্দু ধর্মের এতো বড় অপমান করলো ? নাহ্ এটা সহ্য করা যাবে না। আবার দরখাস্ত পাঠাতে হবে বিলেতে প্রিভি কাউন্সিলে। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ চাঁদা তুললো। অনেক চাঁদা উঠলো একেবারে বিশ হাজার টাকা। এরপর হিন্দু ধর্ম সভার পক্ষ থেকে ফ্রান্সিস্ বেথি নামে এক ইংরেজ অ্যাটর্নিকে টাকা আর দরখাস্ত নিয়ে বিলেতে পাঠানো হলো।

রামমোহনের ধর্ম সভাও চুপ করে বসে রইল না। তারাও রামমোহনকে বিলেতে পাঠনোর জন্য চেষ্টা করতে লাগলো। এদিকে হিন্দু ধর্ম সভার লোকেরা রামমোহনকে খুন করার জন্যে ভাড়াটে গুণ্ডা ঠিক করলো। রামমোহনের জীবন প্রায় বিপন্ন হয়ে উঠলো।

আত্মরক্ষার জন্য রামমোহন একটি ছোরা নিয়ে চলেন। এমনকি কিছুদিন পুলিশের সাহায্য পর্যন্ত নিতে হয়েছিল তাঁকে। রামমোহনের বিলেতে যাওয়ার জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুর এরা হাজার পাঁচেক টাকা সংগ্রহ করলেন। বেথি বিলেতে রওনা হয়ে গেছে। আর দেরী করা যায় না। কিন্তু রামমোহন এ টাকা নিলেন না। তিনি তা ব্রাহ্ম সমাজকে দান করে দিলেন এবং বললেন, তিনি বিলেত যাবেন , নিজের টাকায়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো রামমোহনের প্রতি। বিলেতে যাওয়ার সুযোগ ও এসে গেল অদ্ভুতভাবে। তখন ভারতবর্ষে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পাণীর রাজত্ব । এ সময় দিল-ীতে একজন নাম মাত্র বাদশা ছিলেন, দ্বিতীয় আকবর তিনি তাঁর কতগুলো ন্যায্য অধিকার নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কোম্পানী সে আবেদন গ্রাহ্য করলোনা। দ্বিতীয় আকবর তখন ইংল্যান্ডের রাজার কাছে একজন দূত পাঠাবেন বলে স্থির করলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন কাকে পাঠানো যায় ? বিদ্যায় বুদ্ধিতে বাদশার দূত হতে

পারে এমন মানুষ কে ? মনে পড়লো রামমোহনের কথা। হ্যাঁ সে-ই একমাত্র উপযুক্ত ব্যাক্তি। প্রস্তাব পাঠালেন তিনি রামমোহনের কাছে- দিল-ীর বাদশা তাঁকে রাজা উপাধি দিয়ে ইংল্যান্ডে পাঠাতে চান। রামমোহন খুশী মনে সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, এবং তক্ষুণি বিলেতে যাওয়ার জন্য তৈরী হলেন। কিন্তু এখানেও এল বাধা, দু'দিক থেকে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রামমোহন কে দূত বলে মানতেই চাইলো না এবং তার রাজা উপাধিও স্বীকার করতে চাইলো না। বললো- 'কে দিল-ীর বাদশা? কে তাকে মানে ? রামমোহন ও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। বললেন, ঠিক আছে, সাধারণ মানুষ রামমোহন সাধারণ ভাবেই বেড়াতে যাবেন বিলেত। অগত্যা কোম্পানীকে ছাড়পত্র দিতেই হলো। এবার বাধা দিল হিন্দু সমাজ। তারা বললো - ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে যাবে বিলেতে ? তার মুখ ও দেখবো না। তাকে একঘরে করবো।

এসব শুনে রামমোহন হাসলেন। মনে মনে বললেন, সমাজ তাকে একঘরে করতে আর বাকী রেখেছে কী?

বিলেতে যাওয়ার সব ব্যবস্থাই তিনি করে ফেলে-ন। এমন সময় এক খবর এল, হিন্দু ধর্ম সভার দরখাস্ত নিয়ে স্যার ফ্রান্সিস বেথি যে জাহাজে করে গিয়েছেন- সে জাহাজ ঝড়ে ডুবে গেছে। বেথি কোন রকমে প্রাণে বেঁচেছেন, কিন্ত কাগজ-পত্রগুলো সব ডুবেছে। রামমোহন হেসে বলে উঠলেন, বেথির জাহাজ ডুবেছে, ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মেয়ের গভীর দীর্ঘশ্বাসের ঝড়ে। কিন্তু তাদের আশীবাদে আবার জাহাজের পালে লাগবে হাওয়া।

১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে 'অ্যালরিয়ন' জাহাজের পালে হাওয়া ছুটিয়ে রামমোহন ইউরোপের পথে যাত্রা করলেন।

তখন তো আর আজকের মতো অবস্থা ছিল না। ভারতবর্ষ থেকে বিলেতে যেতে হলে তখন পুরো ছয়টি মাস লাগতো। ১৮৩১ সালের ৮ই এপ্রিল রামমোহন লিভারপুল পৌঁছুলেন। চারদিক থেকে রামমোহনকে স্বতঃফূর্ত অভ্যর্থনা জানানো হলো। ইংল্যান্ডে তখন নতুন রেল -লাইন হয়েছে। সেই রেলে চেপে রামমোহন লিভারপুল থেকে ম্যাঞ্চেষ্টারের কলকারখানা দেখতে গেলেন। কারখানার কুলি মুজুররাও ছুটে এল এই অসামান্য পুরুষটিকে দেখতে। এভাবে লিভারপুল থেকে লন্ডন যেখানেই তিনি বিশ্রাম নেন সেখানেই কৌতূহলী মানুষ ভিড় করে তাকে দেখতে। লন্ডনে পৌঁছে বাসা নিলেন তিনি রিজেন্ট ষ্ট্রীটে। কাজের মানুষ কাজে ডুবে গেলেন। খ্যাতি আর সম্মাদর আসতে লাগল চারদিক থেকে। ভারতবর্ষে থাকতে যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাঁর রাজা উপাধি মানতে চায়নি সে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভোজসভায় আমন্ত্রণ

জানাল। রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের অভিষেক উৎসবে অন্যান্য দেশের রাজদূতদের সাথে তাকেও আসন দেওয়া হলো। তখনকার দিনে ইউরোপে কোনো বাঙালীর এতো বড় সম্মান ছিল কল্পনাতীত।

ইতিমধ্যে সতীদাহ বিলের আলোচনা শুরু হলো প্রিভি কাউন্সিলে। রামমোহন তাঁর ধারালো যুক্তি নিয়ে দাঁড়ালেন। সে যুক্তির কাছে ধর্ম-সভার দরখাস্ত হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ব্যর্থ হল ফ্রান্সিস বেথির সমস্ত চেষ্টা। ভারতবর্ষ থেকে চিরদিনের জন্য মুছে গেল সতীদাহের পাপ-প্রথা। এছাড়া বিলেতে গিয়ে তিনি বাদশা দ্বিতীয় আকবরের পক্ষে পার্লামেন্টে বক্তৃতা দেন এবং বাদশার বৃত্তির হার বৃদ্ধি করান।

১৮৩২ সালে বাদশার কাজ শেষ করে তিনি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে আসেন। ফ্রান্সের সম্রাট লুই ফিলিপ তাঁকে রাজোচিত সম্বর্ধনা দেন এবং তাঁর সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করেন।

পরম সমাদরে বেশ কয়েক মাস ফ্রান্সে কাটিয়ে রামমোহন আবার ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। ইংল্যাণ্ডে রামমোহন কিছুটা অর্থকষ্টে পড়লেন। এমন সময় ব্রিষ্টল থেকে রামমোহনের বন্ধু রেভারেন্ড ডক্টর কার্পেন্টার তাকে আমন্ত্রণ জানালেন। ব্রিষ্টলে এসে রামমোহনের অর্থকষ্ট কিছুটা দূর হলো। মিসেস কিড্‌ল নামে এক মহিলা ষ্টেপল্‌টন গ্রোভে তাঁর বিরাট বাড়ির অনেকটাই রামমোহনের বসবাসের জন্য ছেড়ে দিলেন।

জীবন-যুদ্ধের অক্লান্ত সৈনিক রামমোহন এবার বুঝি বিশ্রামের ডাক শুনতে পেলেন। এখানেই একদিন ১৮৩৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর জ্বরে আক্রান্ত হলেন রামমোহন। সাধ্যমত চিকিৎসা চলতে লাগল। কিন্তু সবকিছুকে ব্যর্থ করে দিয়ে ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর, রাত্রি দুইটা পঁচিশ মিনিটে ষ্টেপল্‌টন গ্রোভে রামমোহন চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়লেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বৎসর। এই ষ্টেপল্‌টন গ্রোভে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

দশ বৎসর পর রামমোহনের বন্ধু রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলেতে যান, তখন তিনি ব্রিষ্টল গিয়ে রামমোহনের দেহ ওখান থেকে সরিয়ে এনে 'আর্নসভেল' (Arnosvale) নামক স্থানে সমাহিত করেন এবং তার ওপর একটি মন্দির গড়ে দেন।

রামমোহন আজ নেই, কিন্তু তিনি অমর হয়ে আছেন তাঁর কীর্তির মাঝে ও ব্রাহ্ম- ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। তাঁর রচিত দুটি ব্রহ্মসঙ্গীত শুনবে ?

ইমন কল্যাণ-তেওট

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,

সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে।
গৌড়মল-ার - আড়াঠেকা
সঙ্গের সঙ্গীরে মন কোথা কর অন্বেষণ
অন্তরে না দেখে তাঁরে কেন অন্তরে ভ্রমণ ?
যে বিভু করে যোজন কর্ম্মেত ইন্দ্রিয়গণ
মজিয়া মনদর্পন তারে কর দরশন।
রামকেলী - আড়াঠেকা।
মনে কর শেষের সেদিন ——।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া কিবা পুত্র কিবা জায়া
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর।
অতএব সাবধান ত্যাজ দম্ভ অভিমান
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর।

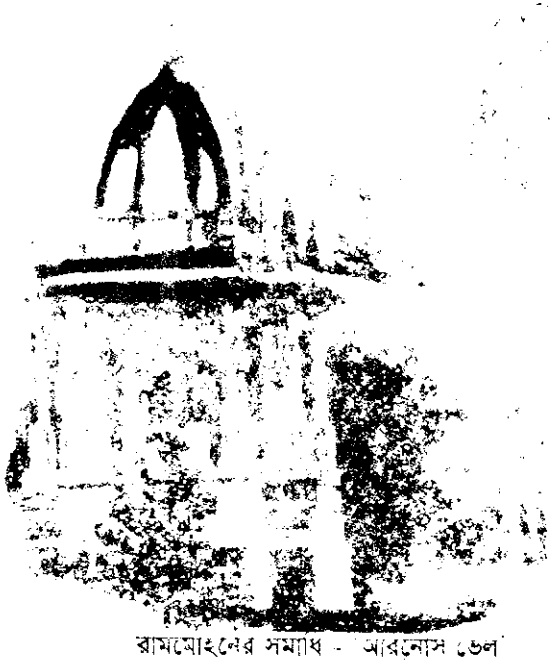

রামমোহনের সমাধি - আরনোস ভেল

ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ। ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি হলো "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুল্লাহ"। আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর প্রেরিত রাসুল। ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং আল্লাহর নামের সাথে মানুষের নাম মূলত মানুষেরই চরম জয় ঘোষণা করে। আশরাফুল মাখলুকাত। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ এবং আল্লাহই একমাত্র উপাস্য ও সর্বশক্তিমান।

হিন্দু ধর্মের জনপ্রিয় প্রতীক ওঁম। হিন্দু উপাসনা ও ক্রিয়াকলাপে ওঁম দ্বারা ভগবানের রহস্য প্রকাশ করে। ওঁম পুনরুচ্চাণের মাধ্যমে নীরবতা ও মানবীয় বাক্যের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ওঁম আকাশ বাসাত ও মাটির প্রতিনিধিত্ব করে। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমন্বয় সাধনাকরী প্রতীক ওঁম। ওঁম উচ্চারণ দ্বারা ধ্যানী ধ্যানের জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করে।

খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতীক ক্রশ। প্রথম দিকে এ প্রতীক ছিল কষ্ট যন্ত্রণার অর্থে। পরবর্তীতে তা খ্রীষ্টভক্তদের জন্য হয় মহিমার প্রতীক। যে ক্রশে খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন সেই ক্রশ খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সম্মান ও আরাধনার বস্তু। খ্রীষ্টের পঞ্চক্ষত স্মরণ করে ৫ আঙুল দ্বারা ক্রশচিহ্ন অঙ্কন করা হয়। যা মানব জাতির মুক্তির চিহ্ন এবং যীশুখ্রীষ্টের ভালবাসার চিহ্ন।

বুদ্ধ ধর্মের প্রতীক ধর্মচক্র। কতগুলো Spok এর সমন্বয়ে গঠিত এই ধর্মচক্রের একটা কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে। এ কেন্দ্রবিন্দু হল নির্বান কর। ষষ্ঠ বিন্দু তারা এ প্রতীক ইহুদী ধর্মের। এ তারায় রয়েছে মিলন স্থান ইহুদী ধর্মের প্রধান প্রতীক চিহ্ন। একে দায়ূদের তারাও বলা হয়ে থাকে।

খান্ড - হলুদ রংয়ের পতাকা, যাকে শিখরা বলে 'নিশান সাহিব'। যার দু'দিকে ধারালো তলোয়ারের ছবি আঁকা থাকে। তাকে বলা হয় খান্ডা। এই নিশান হলো শিখ জীবনের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার মিশ্রণের প্রতীক।

নীতিনীতি
প্রকাশনী
Nitirity Publication

by Shahana Ferdous

ISBN 984-8371-01-X

গুণগত শিক্ষা উন্নত জীবন
সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)
পাঠ্যাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত
বিক্রির জন্য নয়।